খালেদ মোশাররফ

মুক্তিযুদ্ধে
২ নম্বর সেক্টর
এবং কে ফোর্স



মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স খালেদ মোশাররফ প্রথমা প্রকাশন

নয় মাসের স্বাধীনতাযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর এবং 'কে' ফোর্স ছিল বেশ তৎপর। সেক্টর এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে চলত বিরামবিহীন অভিযান। এ গ্রন্থে এসব অভিযানের ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন সেক্টর এবং ফোর্স কমান্ডার মেজর (পরে লে. কর্নেল) খালেদ মোশাররফ। গ্রন্থটি ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস। কমান্ডারের বর্ণনার পাশাপাশি রয়েছে যুদ্ধসংশ্লিষ্ট দলিল, ছবি, মানচিত্র এবং আরও কিছু অতিরিক্তি তথ্য। সেক্টর ও ফোর্স কমান্ডারদের কেউ কেউ তাঁদের এলাকার আংশিক বা খণ্ডিত ইতিহাস লিখেছিলেন, কিন্তু মেজর খালেদ রেখে গেছেন ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের খতিয়ান

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী



খালেদ মোশাররফ

জন্ম ১৯৩৭ সালে, জামালপুর জেলায়। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, ১৯৫৭ সালে কমিশন লাভ করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। যুদ্ধকালে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধে আহত হন। মুক্তিযুদ্ধকালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে পদোন্নতি পান। মুক্তিযুদ্ধে বীরোচিত অবদানের জন্য 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত হন। পরবর্তী সময়ে ব্রিগেডিয়ার পদে পদোন্নতি লাভ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ পদে উন্নীত। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন।

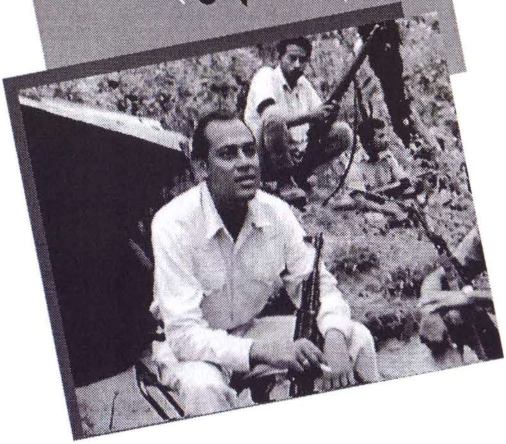
মুহাম্মদ লুৎফুল হক

জন্ম ১৯৫৫, দিনাজপুরে। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্টিলারি কোরে কমিশন পান। ২০০5 সালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বাঙালির সামরিক ইতিহাস এবং স্বাধীনতাযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করছেন। উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ: *স্বাধীনতাযুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব*, *বাঙালি পল্টন: ব্রিটিশ ভারতের বাঙালি রেজিমেন্ট*।

মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স

খালেদ মোশাররফ

মুক্তিযুদ্ধে ২নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স



সম্পাদনা মুহাম্মদ লুৎফুল হক

প্রথমা প্রকাশন

মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স

দ্বিতীয় মুদ্রণ : কার্তিক ১৪২০, নভেম্বর ২০১৩
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০১৩
ফাল্গুন ১৪১৯, ফেব্রুয়ারি ২০১৩
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৪০০ টাকা

Muktijudhe 2 Nomber Sector ebong K Force
by Khaled Mosharraf
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone 8180081
e-mail prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 400 only

ISBN 978 984 90253 2 0

মুখবন্ধ

মেজর খালেদ মোশাররফ ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সফল একজন সেনানায়ক। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্ন থেকেই তিনি হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং পুরো নয় মাস তিনি কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ঢাকা শহরে তাঁর মুক্তিফৌজ হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে তটস্থ করে রাখে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে মেজর খালেদ মোশাররফ একজন মেধাবী অফিসার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যেকোনো মানদণ্ডে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে আসীন হওয়ার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু দেশমাতৃকার ডাকে ১৯৭১ সালে সবকিছু পেছনে ফেলে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রচলিত যুদ্ধে প্রশিক্ষিত ও অভ্যস্ত সেনা হয়েও নেতৃত্ব দেন অপ্রচলিত বা গেরিলাযুদ্ধের।

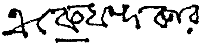
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমি মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে নিয়োজিত থাকার সুবাদে মেজর খালেদ মোশাররফ এবং তাঁর সেক্টর ও 'কে' ফোর্সকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাই। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সব সেক্টরই সার্বক্ষণিক অভিযানের মধ্যে তাদের সময় অতিবাহিত করলেও ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের অভিযানের সংখ্যা ও ব্যাপকতা অধিক ছিল। এই সেক্টরের এলাকা ও মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যাও অন্যদের চেয়ে বেশি ছিল। আমি মেজর খালেদ মোশাররফকে খুব তৎপর ও সক্রিয় কমান্ডার হিসেবে পেয়েছিলাম।

বর্তমান গ্রন্থে মেজর খালেদ মোশাররফ তাঁর অধীন ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবর্ণনা দিয়েছেন। এ গ্রন্থ থেকে

পাঠক তাঁর সেক্টর এবং ফোর্স এলাকায় ঘটে যাওয়া প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা জানতে পারবেন। আমার জানামতে, এত সুন্দরভাবে আর কোনো সেক্টর কমান্ডার যুদ্ধবর্ণনা লিপিবদ্ধ করেননি। যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল, মানচিত্র এবং ছবি ব্যবহারের ফলে গ্রন্থটির মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করি, গ্রন্থটি সাধারণ পাঠক ও গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

প্রয়োজনীয়-সংখ্যক দলিল, মানচিত্র ও ছবি সংযুক্ত করে সম্পাদনার জন্য মুহাম্মদ লুৎফুল হক এবং গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য প্রথমা প্রকাশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গ্রন্থটির আমি বহুল প্রচার কামনা করছি।



এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম

সূচিপত্র

নিবেদন

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফ ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পশ্চিম জার্মানি থেকে উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। এ সময় তিনি মেজর ছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে আসার আগেই তাঁকে কুমিল্লা সেনানিবাসে অবস্থিত চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক হিসেবে বদলি করা হয়। খালেদ মোশাররফ ২২ মার্চ রাতে কুমিল্লায় এসে ইউনিটে যোগ দেন। তিনি ধারণা করতে পারছিলেন যে বাঙালি জাতির সামনে ভয়াবহ দিন আসন্ন। কুমিল্লা সেনানিবাসের থমথমে পরিবেশ, বাঙালি সেনাদের নিরাপত্তাহীনতা আর অবাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের অস্বাভাবিক আচরণে তাঁর সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়।

মার্চ মাসের শুরু থেকেই সেনা কর্তৃপক্ষ চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলসহ সারা দেশের বাঙালি ইউনিট ও সেনাদের ওপর বিশেষ নজর রাখছিল। মার্চের মাঝামাঝি সেনা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অজুহাতে বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলোকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে সেনানিবাসের বাইরে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিতে থাকে, যাতে পাকিস্তানি বাহিনী জনগণের ওপর আক্রমণ করলে বাঙালি সেনারা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে।

খালেদ মোশাররফ চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেওয়ার আগেই পাকিস্তানিদের অশুভ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দুটি কোম্পানিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঠানো হয়েছিল। ২৪ মার্চ খালেদ মোশাররফসহ আরেকটি কোম্পানিকে মৌলভীবাজারের শমশেরনগরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ২৬ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানিরা দেশের বিভিন্ন স্থানে সামরিক তৎপরতা শুরু করলে খালেদ মোশাররফ তাঁর ইউনিট নিয়ে বিদ্রোহ করে প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করেন।

দেশের অন্যান্য স্থানে বাঙালি ইউনিট এবং সেনারাও সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে এসে নিজ নিজ এলাকায় প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শুরুর পর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাঙালি ইউনিট ও সেনাদের মধ্যে সমন্বয়

গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়ে। ৪ এপ্রিল সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে যুদ্ধে যোগ দেওয়া বিভিন্ন এলাকার বাঙালি ইউনিট ও সেনাদের সমন্বয়ের জন্য কর্নেল এম এ জি ওসমানীর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে সামরিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কুমিল্লা ও নোয়াখালী এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় খালেদ মোশাররফকে। জুলাই মাসে সব এলাকার জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কলকাতায় আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশকে নতুনভাবে ১১টি সামরিক অঞ্চলে বা সেক্টরে বিভক্ত করে অধিনায়ক নিয়োগ দেওয়া হয়। খালেদ মোশাররফকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে। এ সেক্টরের আওতায় ছিল বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার পূর্বাঞ্চল, ঢাকা শহরসহ ঢাকা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, কুমিল্লা জেলা এবং নোয়াখালী জেলাসহ বিস্তীর্ণ এলাকা। ভৌগোলিক এলাকার বিবেচনায় ২ নম্বর সেক্টর ছিল সবচেয়ে বড়। আরও পরে সেক্টরের পাশাপাশি তিনটি ফোর্স বা ব্রিগেড গঠিত হলে খালেদ মোশাররফকে একটি ফোর্সের অধিনায়ক করা হয়। তাঁর নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী একে 'কে' ফোর্স বলা হতো।

মেজর খালেদ মোশাররফ যুদ্ধের শুরু থেকেই যুদ্ধ পরিচালনার পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রশাসন, যা সামরিক পরিভাষায় 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন দ্য ফিল্ড' গড়ে তোলেন। যুদ্ধ প্রশাসনের অন্যতম অংশ হচ্ছে যুদ্ধসংক্রান্ত দলিলপত্র সংরক্ষণ করা। স্বাধীনতাযুদ্ধকালে খালেদ মোশাররফ তাঁর সেক্টর ও ফোর্স থেকে পাঠানো চিঠিপত্র এবং তাঁর সেক্টর ও ফোর্স যেসব চিঠিপত্র পেয়েছে সেগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি এসব দলিলপত্রের সাহায্যে ১৯৭৪-৭৫ সালে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস পরিষদে (বাংলা একাডেমীর একটি প্রকল্প) উপস্থাপন করেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল ঘটনাবলি উপস্থাপনে এ কাজে তাঁকে সহায়তা করেন বাংলা একাডেমীর তৎকালীন গবেষক সুকুমার বিশ্বাস। রচনাটি দুই ভাগে ছাপা হয়—*বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*-এর নবম ও দশম খণ্ডে। ১৯৯০ সালে এম আর আখতার মুকুল সম্পাদিত *আমিই খালেদ মোশাররফ* গ্রন্থে এর অংশবিশেষ এবং ২০০৮ সালে মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া সম্পাদিত *২ নং সেক্টর এবং কে ফোর্স কমান্ডার খালেদের কথা* গ্রন্থে রচনাটি প্রকাশিত হয়।

পূর্বে উল্লেখিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের যুদ্ধ-

পরিস্থিতি নিয়মিতভাবে মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে অবহিত করা হতো। চিঠিপত্রগুলো কখনো অভিযান সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সদর দপ্তরে পাঠানো হতো আবার কখনো পাঠানো হতো নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে। খালেদ মোশাররফের রচনাটিতে প্রতিটি অভিযানের নিখুঁত ও নির্ভুল বর্ণনা পাঠ করে ধারণা করা যায় যে এসব চিঠিপত্রের সাহায্য নিয়ে তিনি রচনাটি প্রস্তুত করেন।

খালেদ মোশাররফ একজন সফল সমরনায়ক ছিলেন। তাঁর অধীনে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে আরও বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরার জন্য এ বইয়ে মূল রচনার পাশাপাশি ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের চিঠিপত্র, ছবি ও মানচিত্র সংযোজিত হলো। দেওয়া হলো খালেদ মোশাররফ, ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের পরিচিতি। ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের যেসব মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বসূচক খেতাব পেয়েছেন, তাঁদের একটি তালিকাও মুদ্রিত হলো বইয়ের শেষে।

রচনাকে সহজবোধ্য করতে কোথাও কোথাও বাক্যবিন্যাসে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং বানান যুগোপযোগী করা হয়েছে। তবে কোথাও তথ্যের বিচ্যুতি ঘটানো হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনীতে হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ব্যবহৃত মানচিত্রগুলো মূলত বাংলাদেশ সরকারের *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস* গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

রচনাটির মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক উপাদান আছে, যা স্বাধীনতাযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস রচনায় সাহায্য করবে। এ ছাড়া স্বাধীনতাযুদ্ধ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু নতুন প্রজন্ম একজন সমরনায়কের বয়ানে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের বিভিন্ন অভিযান সম্পর্কে জানতে পারবেন। আমাদের জানামতে, খালেদ মোশাররফ ছাড়া আর কোনো সেক্টর কমান্ডার তাঁর ফোর্স বা সেক্টরের বিস্তারিত যুদ্ধবর্ণনা প্রকাশ করেননি। এই বিবেচনায় গ্রন্থটি অনন্য।

গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার বীর উত্তমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গ্রন্থের জন্য ছবি ও অন্যান্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং তথ্যের হালনাগাদে সাহায্য করার জন্য সালমা খালেদ, রাশেদুর রহমান, আনোয়ার হোসেনকেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মুহাম্মদ লুৎফুল হক
ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩



১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ আমাকে ঢাকা সেনানিবাস থেকে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদর দপ্তর কুমিল্লায় বদলি করা হয়। আমি ২২ মার্চ আমার পরিবারকে ঢাকার ধানমন্ডিতে রেখে কুমিল্লা যাই। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে গিয়ে যোগদান করি। ইউনিটে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম, সেনারা বেশ উদ্বিগ্ন। আরও জানতে পারলাম, পাঞ্জাবিদের কমান্ডো ও গোলন্দাজ (আর্টিলারি) বাহিনী চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের চারদিকে পরিখা খনন করে মেশিনগানসহ অবস্থান নিয়েছে। নির্দেশ পেলেই সবাইকে হত্যা করবে। পাঞ্জাবিরা সেনানিবাস রক্ষার অজুহাতে এসব পরিকল্পনা নিয়েছে। পাঞ্জাবিদের কার্যকলাপে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের মনে তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল। আমি পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তারা জানতে চায়, এখন তাদের কী কর্তব্য? আমি সবাইকে সতর্ক থাকার এবং আত্মরক্ষার্থে প্রহরী দ্বিগুণ করার নির্দেশ দিয়ে শান্ত করি।

পরের দিন ২৩ মার্চ ছুটির দিন ছিল। ২৪ মার্চ সকাল সাতটায় আমি যাই এবং প্রথমে অফিসে লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াত খানের কাছে রিপোর্ট করি। তিনি চতুর্থ বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার এবং পাঞ্জাবি ছিলেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াত খান আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে আমার পোস্টিংয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। তিনি আমার সঙ্গে ইউনিট সম্পর্কে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন।

ওই দিনই আমি যখন আমার অফিসে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড বা উপপ্রধানের দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছিলাম, সকাল প্রায় সাড়ে ১০টায়, তখন খিজির হায়াত খান আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর অফিস কক্ষে ঢুকে দেখি, তিনি উদ্বিগ্ন। খিজির হায়াত খান আমাকে বসার জন্য বললেন, এবং জানান যে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিয়ে ওই দিনই কুমিল্লা থেকে সিলেট রওনা হতে হবে। আমি উত্তর দিলাম, হুকুম যদি হয় নিশ্চয়ই যাব, তবে আমি এক দিন

হয় এসেছি এবং আমার দায়িত্ব কেবল বুঝে নিচ্ছি, এমতাবস্থায় আমাকে ইউনিট থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়তো আপনার পক্ষে ভুল হবে। তাঁকে আরও বোঝাতে চেষ্টা করলাম, ব্যাটালিয়নে আরও অফিসার আছেন, তাদেরও পাঠানো যেতে পারে। তা ছাড়া কোনো ইউনিট উপপ্রধানকে সাধারণত এভাবে পাঠানো হয় না। আমার বক্তব্য শুনে তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সে জন্য তোমাকেই যেতে হবে।' আমি জানতে চাইলাম, আমাকে কী ধরনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে। কর্নেল খিজির হায়াত খান বললেন যে খবর এসেছে, সিলেটের শমশেরনগরে নকশালপন্থীরা বিশেষ তৎপর রয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত তাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ব্যাপকভাবে সাহায্য করছে। আরও খবর আছে, ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে বেশ অনুপ্রবেশের ঘটনাও ঘটছে। এসব কারণে আমাকে চতুর্থ বেঙ্গলের একটি কোম্পানি নিয়ে সেখানে যেতে হবে এবং তাদের দমন করতে হবে। আমি জবাব দিলাম, একটি কোম্পানি যখন যাবে, তখন কোনো জুনিয়র মেজরকে সেখানে পাঠানো যেতে পারে। সাধারণত উপপ্রধান একটি কোম্পানি নিয়ে কখনো যান না। আমার বক্তব্যে খিজির হায়াত খান কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আমাকে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যান। আপনাকে আমি একটু পরে ডেকে পাঠাব।'

কিছুক্ষণ পরে খিজির হায়াত খান আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি এখনই আপনাকে ডেকেছেন।' আমাকে নিয়ে কর্নেল খিজির হায়াত ব্রিগেড কমান্ডারের কাছে গেলেন। ব্রিগেড কমান্ডার আমাকে দেখেই বললেন, 'আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, যা একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ সম্পন্ন করতে পারবে না এবং সে জন্য আমি তোমাকেই নির্বাচন করেছি। আশা করি, তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।' তিনি আরও বললেন, 'তোমার মতো একজন সিনিয়র অফিসারকে এ জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আর্মি ট্রুপস ছাড়া শমশেরনগরে ইপিআরের [ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস] দুটি কোম্পানি আছে। এই বড় ফোর্সের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন সিনিয়র বাঙালি অফিসারের দরকার। কুমিল্লাতে তুমিই একমাত্র বাঙালি অফিসার, যাকে আমি এ ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারি।'

আমি বুঝতে পারলাম, যেতে আমাকে হবেই। উপায় যখন আর নেই, তখন তাদের কাছ থেকে যতটুকু আদায় করে নেওয়া যায়, সেটুকুই আমার পক্ষে মঙ্গল। আমি ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফিকে বললাম, যে কাজের ভার

আমাকে দিচ্ছেন, শুধু একটি কোম্পানি দিয়ে তা হবে না। কোম্পানির চেয়ে বেশি সেনা আমাকে দেওয়া হোক। আর হেডকোয়ার্টারসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য একটি শক্তিশালী ওয়্যারলেস দেওয়া হোক। এ ছাড়া যেহেতু আমি অনেক দূরে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছি, সেহেতু আমার ট্রুপসের জন্য স্বয়ংক্রিয় ভারী ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র, মর্টার ইত্যাদি এবং যথেষ্ট পরিমাণ গোলাবারুদ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক।

ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি প্রথমে বললেন, 'তোমাকে যে কাজের জন্য পাঠানো হচ্ছে, তাতে এসব ভারী অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হবে না।' আমি উত্তরে বললাম, 'আপনি যে গুরুতর অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন, তাতে আমার সামরিক জ্ঞান অনুসারে, ভারী অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হবে। বিশেষ করে, তেমন এক জায়গায় যেখানে হেডকোয়ার্টারস থেকে তাড়াতাড়ি সাহায্য পাওয়ার আশা কম।'

আমার বক্তব্যে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি কনভিন্সড হলেন এবং কর্নেল খিজির হায়াতকে নির্দেশ দিলেন, আমার যা প্রয়োজন তা যেন আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়। আমরা ব্রিগেডিয়ার শফির কাছ থেকে ইউনিটে ফিরে এলাম। এসেই ব্যাটালিয়নের অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন গাফফারকে [আবদুল গাফফার হাওলাদার, বীর উত্তম, পরবর্তী সময়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং মন্ত্রী] ডেকে নির্দেশ দিলাম সব ব্যাটালিয়ন থেকে বেছে বেছে ২৫০ জনের মতো সেনাকে আলফা কোম্পানিতে একত্র করার জন্য।

গাফফারকে বলে দিলাম, ব্যাটালিয়নের ভারী অস্ত্রশস্ত্র যত আছে সব নিয়ে নাও। গোলাবারুদ এমনভাবে নেবে, যাতে এক মাস যুদ্ধ করা যায়। আমাদের ২৬টা গাড়ি ব্রিগেড থেকে দেওয়া হয়েছিল। সব বোঝাই করতে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাদের তৈরি করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এ সময় আমি একটি অস্বাভাবিক ঘটনা দেখতে পাই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এবং আমাদের লোকজন প্রস্তুত হচ্ছিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত খিজির হায়াত এবং ব্রিগেডের অন্যান্য পাকিস্তানি স্টাফ অফিসার বসে বসে আমাদের লক্ষ করতে থাকেন।

আমি ২৪ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় যাওয়ার জন্য তৈরি হই। ব্যাটালিয়নে যেসব বাঙালি অফিসার থেকে গেল, তাদের সবাই আমার যাওয়ার আগে মেসে এসে দেখা করে গেল। এদের মধ্যে সিনিয়র অফিসার ছিল ক্যাপ্টেন মতিন [মোহাম্মদ আবদুল মতিন, বীর প্রতীক পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল]। তাকে আমি এই উপদেশ দিলাম যে আমি চলে যাচ্ছি, এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এখন তুমিই সিনিয়র। যদি কোনো অঘটন ঘটে, তাহলে এই চতুর্থ

বেঙ্গলের বাকি ট্রুপসের নিরাপত্তার পূর্ণ বন্দোবস্ত করবে এবং যদি প্রয়োজন হয়, যুদ্ধ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসবে এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমি আমার গাড়ির বহর নিয়ে শমশেরনগরের পথে রওনা হলাম। রাত দুইটা-আড়াইটার সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলাম। সেখানে রাস্তায় অনেক ব্যারিকেড। এই প্রতিবন্ধকতার জন্য আমাদের এগোতে অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে ব্যারিকেড ভাঙতে ভাঙতেই আমরা শহরের দিকে এগোচ্ছিলাম। শহরের প্রান্তে যে পুল আছে (নিয়াজ পার্কের কাছে), সেখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছাত্র-জনতা আমাদের বাধা দেয়। হাজার হাজার লোক ও ছাত্র রাস্তায় শুয়ে পড়ে এবং বলে, যেতে দেওয়া হবে না। আমি সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম। ওখানেই আওয়ামী লীগের তদানীন্তন এমসিএ [এমএনএ বা মেম্বার ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি] সাচ্চু মিয়া এবং অন্য কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা ও ছাত্রনেতারা আমাকে জানান যে পূর্ব বাংলার অনেক জায়গায় পাকিস্তানি সেনারা আবার গুলি চালিয়েছে। তাই মিলিটারি চলাচল পার্টির কেন্দ্রীয় নির্দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁরা আরও বললেন, 'আপনাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের ইচ্ছাকৃতভাবে কুমিল্লা থেকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং আমরা আপনাদের যেতে দেব না।' এভাবে কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তা হয়। ইতিমধ্যে মেজর শাফায়াত জামিল [শাফায়াত জামিল। বীর বিক্রম পরে কর্নেল, ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত, যে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের আরেকটি কোম্পানিসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান করছিল, সে-ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। সে-ও তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করল, যাতে ব্যারিকেড এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু তাঁরা আমাদের অনুরোধ রাখতে রাজি হন না। তারপর তাঁদের নিয়ে মেজর শাফায়াত জামিলের ক্যাম্পে যাই। সেখানে আবার কথাবার্তা চলে এবং তাঁদের আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিই যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাংলাদেশেরই রেজিমেন্ট। যখন দরকার পড়বে, তখন বাঙালি জাতির পক্ষে পিছিয়ে থাকবে না। এমতাবস্থায় আমাদের বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। অবশেষে সকাল সাড়ে পাঁচটায় সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাদের আর বাধা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আমরা শমশেরনগরের পথে আবার ২৫ মার্চের সকালে রওনা দিলাম। যাওয়ার আগে আগে মেজর শাফায়াত জামিলকে আলাদা ডেকে সতর্ক করে দিলাম এবং আমার সঙ্গে

ওয়্যারলেস মারফত যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দিয়ে গেলাম। আমি সকাল ১০টা-১১টার সময় শ্রীমঙ্গলে পৌঁছাই। সেখান থেকে শমশেরনগর যাওয়ার রাস্তা আমার জানা ছিল না। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারস থেকে আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, শমশেরনগর যেতে হলে মৌলভীবাজার হয়ে যেতে হবে। শ্রীমঙ্গলে গাড়ির বহর দাঁড় করিয়ে স্থানীয় কিছু ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করি শমশেরনগরে যাওয়ার রাস্তা সম্পর্কে এবং জানতে পারি, মৌলভীবাজার হয়ে যাওয়া যায় অথবা আরেকটা রাস্তা আছে—সোজা শ্রীমঙ্গল হয়ে জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এবং এই রাস্তা অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বের। আমি এই সোজা জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে শমশেরনগরের পথে রওনা দিলাম। যে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সে রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের পথ দিয়ে রওনা হলাম। এই রাস্তা ছিল খুবই খারাপ। তাই অতি কষ্টে বেলা দুইটার সময় শমশেরনগরে গিয়ে পৌঁছাই। সেখানে গিয়ে ডাকবাংলোতে আমি আমার ছাউনি স্থাপন করি।

দুপুরে খেয়ে আমি ও লেফটেন্যান্ট মেহবুব [মেহবুবুর রহমান বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ১৯৮১ সালে জিয়া হত্যা ঘটনায় নিহত] শমশেরনগরের চারদিক ঘুরে দেখে আসি। দেখি, পরিস্থিতি স্বাভাবিক। আরও কিছু টহলদল চারদিকে পাঠিয়ে দিই। স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে জানতে পারি, কোনো অঘটন সেখানে ঘটেনি। ইপিআরের যে দুটি কোম্পানির কথা আমাকে বলা হয়েছিল, দেখি তাদের কোনো পাত্তা নেই। ইপিআরের একজন সুবেদার এবং আরও কয়েকজন সেপাই শমশেরনগর এয়ারপোর্টে অবস্থান করছিল, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সঠিক কোনো উত্তর পাইনি। শমশেরনগরের টি-গার্ডেনগুলো ঘুরে জানতে পারলাম, সব পশ্চিম পাকিস্তানি ম্যানেজার ও অফিসার ঢাকায় চলে গেছে। নকশালপন্থী বা অনুপ্রবেশকারীদের কোনো চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। ২৫ মার্চের রাতটা এভাবে খবরাখবর নিয়ে এবং টহল দিয়ে কেটে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে ঘোরালো মনে হলো। আমার মনে হলো, আমাকে এখানে কৌশল করে পাঠানো হয়েছে এবং যা-কিছু তারা বলেছিল, সবই মিথ্যা। আমি সারা সকাল ওয়্যারলেসের মাধ্যমে হেডকোয়ার্টারসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি কিন্তু কোনো ধরনের যোগাযোগ করাই সম্ভব হলো না। এভাবে দুপুর পর্যন্ত চলে। আমি ও লেফটেন্যান্ট মেহবুব ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে ছিলাম, হঠাৎ আমাদের এসে খবর দেয় একজন পাঞ্জাবি অফিসার ও কয়েকজন সেনা শমশেরনগর বাজারে এসেছে এবং সেখানে কারফিউ জারি করে স্থানীয় জনসাধারণের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। সেই দলটি আমাদের

ক্যাম্পের সামনে দিয়ে মৌলভীবাজার যাচ্ছিল। আমাদের সেন্ট্রিকে দিয়ে সেই দলের অফিসারকে ডাকতে পাঠাই। তারা যখন সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, সেন্ট্রি তখন তাদের আমাদের ক্যাম্পে আসার অনুরোধ জানায়। অফিসারটি ক্যাম্পের ভেতরে আসে এবং আমাকে সেখানে উপস্থিত দেখে অবাক হয়। এমন ভাব দেখায় যে আমরা এখানে আছি, এটা সে জানত না। কথা বলার পর আমি জানতে পারি যে ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের বেশকিছু সেনা সিলেট থেকে মৌলভীবাজারে এসে দুই দিন আগে ক্যাম্প করেছে। অফিসারের হাবভাব ও কথাবার্তা আমাকে সন্দিহান করে তোলে। যতক্ষণ সে ডাকবাংলোয় বসে ছিল, ততক্ষণ সে স্টেনগানটি কোথাও না রেখে নিজের হাতে রাখে। তাতে করে আমার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। এদের আগমন সম্পর্কেও আমাকে অবহিত করা হয়নি। এটাও ছিল অত্যন্ত অস্বাভাবিক। কিছুক্ষণ পর অফিসারটি তার দলবল নিয়ে চলে যায় এবং যাওয়ার আগে আমাদের পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আমি যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে অফিসারকে বিদায় করলাম।

সেই দিনই বিকেলে স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে আমি জানতে পারি, ঢাকায় ভয়ংকর একটা অঘটন ঘটেছে; কিন্তু কেউ সঠিক কিছু বলতে পারছে না। আস্তে আস্তে লোকমুখ থেকে আরও শুনতে পাই, ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হাজার হাজার লোককে গুলি করে মেরেছে এবং মারছে। বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী একই রকম নৃশংস অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার লোক ঢাকা ছেড়ে জান বাঁচানোর জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ট্যাংক, কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নির্দোষ, নিরীহ ও নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা শহর একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আমি অনেকক্ষণ বসে থেকে চিন্তা করতে লাগলাম, আমার এখন কর্তব্য কী? ওয়্যারলেস সেট খোলার হুকুম দিয়ে হেডকোয়ার্টারসের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। অনেক চেষ্টার পরও যোগাযোগ করা গেল না। তবু চেষ্টা চালিয়ে যেতে বললাম। অনেকক্ষণ পর আমাকে লেফটেন্যান্ট মেহবুব এসে খবর দিল যে হেডকোয়ার্টারসের সঙ্গে খুব কষ্টে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। আমি দৌড়ে গেলাম ওয়্যারলেসে কথা বলার জন্য। যখন আমি কথা বলতে চাই, তখনই অপর প্রান্ত থেকে কর্নেল খিজির হায়াত কিংবা ক্যাপ্টেন আমজাদ (পাঞ্জাবি) জবাব দেন। তাঁদের কাছে কোনো কথাই খুলে বলা সম্ভব ছিল না। শুধু এটুকু বুঝতে পারলাম, কর্নেল খিজির হায়াত এবং

চতুর্থ বেঙ্গলের বাকি অংশ কুমিল্লা থেকে ২৫ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসেছেন। কর্নেল খিজির হায়াত আমাকে জানালেন, সবকিছু স্বাভাবিক এবং তিনি আরও জানালেন যে অতিসত্বর তিনি একবার শমশেরনগর পরিদর্শনে আসবেন। আমি তাঁকে জানালাম যে এখানে সব শান্ত। আমার এখানে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই এবং আমাকে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হোক। তিনি জবাবে আমাকে শমশেরনগরেই থাকার আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণ পর আমি আবার ওয়্যারলেসে কথা বলার চেষ্টা করি। এবার ক্যাপ্টেন গাফফারের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম যে তার কাছাকাছি কোনো পাঞ্জাবি অফিসার আছে। সে জন্য সব খুলে বলতে পারছিল না। আমি শুধু তাকে বললাম, যখন সুযোগ পাবে তখন মেজর শাফায়াত জামিলকে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবে। আরও কিছুক্ষণ পর মেজর শাফায়াত জামিল আমার সঙ্গে ওয়্যারলেসে কথা বলে এবং জানায়, ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা চালিয়েছে। এখনো তারা ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। এ কথা চলছিল ২৬ মার্চের সন্ধ্যাবেলায়। শাফায়াত জামিল লোকমুখে শুনেছে, লোকজন দলে দলে ঢাকা থেকে পালিয়ে কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছে। মেজর শাফায়াত জামিল ও ক্যাপ্টেন গাফফার আরও জানায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে এবং চতুর্থ বেঙ্গলকে তা কার্যকর করতে বলা হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনসাধারণ সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে মিছিল বের করেছে। এমতাবস্থায় তাদের করণীয় কী, তা আমার কাছে জানতে চাইলেন।

আমার পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন ছিল। আমি প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থান করছি। সমগ্র বাংলাদেশে আর কোথায় কী হচ্ছে, সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। ঢাকা শহরে পাকিস্তানি বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে এবং আরও অনেক জায়গাতেও একই ঘটনা চলছে। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে এ মুহূর্তে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই যে তাদের কাছ থেকে কোনো পরামর্শ পাব। একদিকে সামরিক শৃঙ্খলা ও কর্তব্যবোধ, অন্যদিকে বিবেকের দংশন আমাকে পীড়িত করছিল। এই উভয় সংকটে পড়ে আমি আমার চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলি। মেজর শাফায়াত জামিলকে বললাম, আমাকে কিছুটা সময় দাও, আমি কিছুক্ষণ পরে বলব এবং সঙ্গে সঙ্গে বললাম, কোনোভাবেই যেন গুলি চালানো না হয়। লোকজনকে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করো। চিন্তায় আমি আমার কামরায় পায়চারি করতে শুরু করলাম এবং চিন্তায় মাথা ঘুরতে লাগল। আমি বসে পড়লাম এবং লেফটেন্যান্ট মেহবুবও সেখানে বসে ছিল। আমার সঙ্গে যেসব বাঙালি সেনা

ছিল, তারাও উদ্বিগ্ন হয়ে আমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিল। অবশেষে আমার বিবেক আমাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করল—এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। যদিও কোনো রাজনৈতিক নির্দেশ সেই মুহূর্তে ছিল না, তবু বঙ্গবন্ধুর সেই সাতই মার্চের ঘোষণার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, '...ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' আমি লেফটেন্যান্ট মেহবুবকে ডেকে বললাম, এ মুহূর্তে আমি স্বাধীন বাংলার প্রতি আমার আনুগত্য স্বীকার করলাম। এখনই সব সেনাদের বলে দাও, আজ থেকে আমরা আর কেউ পাকিস্তানের প্রতি অনুগত নই। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দাও। এখন থেকে আমরা পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করব। সব সেনাকে তৈরি হতে বলো। এখান থেকে আমরা ঢাকার দিকে রওনা দেব এবং চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে একত্র করতে হবে। লেফটেন্যান্ট মেহবুব যেন এই নির্দেশের অপেক্ষাতেই ছিল। সে দৌড়ে গিয়ে বাকি সবাইকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরই আমি শুনতে পেলাম বঙ্গশার্দুলদের স্লোগান 'জয় বাংলা'। আমি তাদের প্রথমে শান্ত করলাম এবং বুঝিয়ে দিলাম, আমাদের এখন থেকে যে সংগ্রাম শুরু হলো সেটা কঠিন এবং বিপদসংকুল। সবাইকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। দেশ ও জাতি এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষাবলম্বন করে আত্মীয়স্বজন, আর্থিক কষ্টকে বরণ করে নিতে হবে। অর্থাৎ যাবতীয় সুবিধা ত্যাগ করে আত্মবিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি দেখতে পেলাম, বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা সবাই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। প্রথমে ওয়্যারলেসে মেজর শাফায়াতের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তাকে নির্দেশ দিই, সে-ও যেন তৈরি থাকে। তাকে আরও বললাম কুমিল্লার রাস্তার দিকে খেয়াল রাখতে। তাকে এ-ও বললাম, আমি খুব শিগগির ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌঁছাব। ইতিমধ্যে আমার সব লোক ব্রাহ্মণবাড়িয়া রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। আমি লেফটেন্যান্ট মেহবুবের সঙ্গে কিছুসংখ্যক সেনা দিয়ে তাকে শ্রীমঙ্গলে পাঠিয়ে দিই এবং সেখানে ডিফেন্স দিতে নির্দেশ দিই, যাতে আমাদের যাওয়ার পথে মৌলভীবাজার থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এসে বাধা দিতে না পারে। শমশের নগর থেকে জঙ্গলের পথে রাত ১২টায় আমি আমার গাড়ির বহর নিয়ে রওনা হয়ে যাই। আমাদের যাওয়ার গতি ছিল বেশ মন্থর। কারণ রাস্তায় রাস্তায় ছিল ব্যারিকেড এবং কোনো কোনো জায়গায় রাস্তা কেটেও ফেলা হয়েছিল। জঙ্গলের অনেক

জায়গায় বিরাট বিরাট গাছ কেটে রাস্তার ওপর ফেলে রাখা হয়েছিল। এসব প্রতিবন্ধক মোকাবিলা করেই আমাদের অগ্রসর হতে হচ্ছিল। সব প্রতিবন্ধকের কাছেই অনেক লোক লুকিয়ে দেখছিল আমরা কী করি। যখনই তারা বুঝতে পারছিল, আমরা বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ঢাকার দিকে বা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলছিল এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে সাহায্য করছিল। তাদের সহায়তা এবং সক্রিয় ভূমিকার ফলেই আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল কম সময়ের মধ্যে এগিয়ে যাওয়া। এভাবে খুবই মন্থর গতিতে হলেও এগোতে থাকি এবং ভোর সাড়ে পাঁচটায় সাতছড়িতে এসে পৌঁছাই। এখানে আমার সেনারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। এখানে এসে আমি আবার ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করি। ওই অবস্থায় কর্নেল খিজির হায়াতের সঙ্গেও আলাপ হয়। তিনি আমাকে আশ্বাস দেন যে সেখানে সবকিছু ঠিকঠাক আছে। মেজর শাফায়াত জামিলও আমার সঙ্গে কথা বলে। সে তার উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং জানতে চায়, আমি কোথায় এবং আমার আসতে কেন দেরি হচ্ছে। আমি বললাম, ভয়ের কোনো কারণ নেই। কেননা, আমি অনেক কাছে এসে গেছি। তাকে আশ্বাস দিয়ে আমি আবার রওনা হই। সকাল ছয়টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ১০ মাইল দূরে মাধবপুরে পৌঁছাই, এবং মেজর শাফায়াত জামিলের সঙ্গে ওয়্যারলেসে কথা বলি। শাফায়াত আমাকে জানায়, সকাল ১০টার সময় কর্নেল খিজির হায়াত একটি কনফারেন্স ডেকেছেন (আমি পরে জানতে পারি যে কুমিল্লা থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি সেই সময়ে আসছিল)। আমি শাফায়াতের কাছে যখন কনফারেন্সের কথা শুনতে পেলাম, তখন আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি এবং তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠি। আমি শাফায়াতকে তখনই নির্দেশ দিই, আমার জন্য অপেক্ষা কোরো না। প্রয়োজন হলে কর্নেল খিজির হায়াতসহ সব পাঞ্জাবি অফিসারকে গ্রেপ্তার করে ফেলো এবং যত পাঞ্জাবি সেনা আছে, তাদের নিরস্ত্র করো। আমি আবার রওনা হয়ে গেলাম। পরে শুনতে পেলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কী হয়েছে। ১০টা বাজার ১০ মিনিট আগে কর্নেল খিজির হায়াত, মেজর নেওয়াজ [সাদেক নেওয়াজ] ও ক্যাপ্টেন আমজাদ কনফারেন্সে বসেছিল। এমতাবস্থায় মেজর শাফায়াত জামিল, লেফটেন্যান্ট কবীর [হুমায়ুন কবির চৌধুরী বীর প্রতীক, পরে ক্যাপ্টেন], লেফটেন্যান্ট হারুন [এম হারুন-অর-রশীদ, বীর প্রতীক, পরে লে. জেনারেল ও সেনাপ্রধান] হঠাৎ সেই কামরায় ঢোকে এবং

পাঞ্জাবি অফিসারদের তাদের অস্ত্র সমর্পণ করার নির্দেশ দেয়। মেজর নেওয়াজ, যে নিজে একজন কমান্ডো ছিল, কিছুটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু লেফটেন্যান্ট হারুনের ত্বরিত প্রচেষ্টায় তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং সব পাঞ্জাবি অফিসারকে তারা বাংলাদেশের নামে গ্রেপ্তার করে। ইতিমধ্যে বাকি বঙ্গশার্দুলরা বাইরে যেসব পাঞ্জাবি সেনা ছিল, তাদের নিরস্ত্র করে এবং যারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, তাদের চরম শাস্তি দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শত্রুমুক্ত করে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়। দিনটি ছিল ২৭ মার্চ। ইতিমধ্যে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খুব কাছে এসে পড়ি। এরপর আমার অধীন বাহিনী ও শাফায়াতের অধীন বাহিনী বেলা ১১টার দিকে মিলিত হয়। আমি বুঝলাম, আমার প্রথম কর্তব্য হলো, যেসব এলাকা মুক্ত হয়েছে, সেগুলোকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। আমি প্রথমেই অফিসারদের নিয়ে একটি বৈঠক করি এবং এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে কীভাবে কার্যকর করতে হবে, সে সম্পর্কে আমার পরিকল্পনা জানাই। আমার এ পরিকল্পনাগত সিদ্ধান্ত ছিল যে আমরা মেঘনা নদীকে উত্তরে রেখে পশ্চিমে প্রতিরক্ষা লাইন তৈরি করব এবং দক্ষিণে ময়নামতি সেনানিবাস পর্যন্ত মুক্ত করে প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত করব। উত্তর-পূর্বে মৌলভীবাজার থেকে সিলেট পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা মুক্ত করে সিলেটে আরেকটি ঘাঁটি স্থাপন করব।

এ জন্য ভৈরববাজারে প্রথম দুটো কোম্পানি পাঠিয়ে দিই। আর একটি দলকে কুমিল্লার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে অগ্রসর হতে বলি। মেঘনার পূর্ব পারে একটি প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরির ব্যবস্থা করি। এ ছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও তিতাস নদীর চতুর্দিকে একটি অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করি। লেফটেন্যান্ট মেহবুবের নেতৃত্বে একটি কোম্পানিকে সিলেটের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিই। শ্রীমঙ্গলে তাদের সঙ্গে স্থানীয় সংগ্রামী আনসার, মুজাহিদ এবং আরও কিছুসংখ্যক সেনা লেফটেন্যান্ট কর্নেল রবের নেতৃত্বে [মোহাম্মদ আবদুর রব বীর উত্তম, পরে সম্মানিত মেজর জেনারেল। মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য] যোগ দেন। এ দলের সঙ্গে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের যেসব সেনা মৌলভীবাজারে ছিল, তাদের লড়াই হয় এবং পাঞ্জাবিদের অনেকেই হতাহত হয় এবং প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির পর মৌলভীবাজার থেকে পালিয়ে যায়। সিলেট শহর পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমি বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তখন মহকুমা প্রশাসক ছিলেন জনাব রাকিব [কাজী রকিব উদ্দীন আহমেদ। পরে বাংলাদেশ

সরকারের সচিব। বর্তমানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার]। তিনি অত্যন্ত উৎসাহী, সাহসী ও সংগ্রামী ছিলেন। তিনি সব সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বেসামরিক সাহায্যের যতটুকু প্রয়োজন ছিল, যেমন—রসদ সরবরাহ, যানবাহন জোগাড়, সেনাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, চিকিৎসা, আর্থিক সাহায্য করা—এসব কিছুই তিনি অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে করেছেন। তিনি পুলিশের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের সব জেলা ও মহকুমা প্রশাসকের কাছে এই মর্মে খবর পাঠিয়েছিলেন যে মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট স্বাধীনতাযুদ্ধ করছে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত করেছে। ওই সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমার সঙ্গে তাহের উদ্দিন ঠাকুর, সাচ্চু মিয়া প্রমুখ রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আলোচনা হয় এবং তাঁদের কাছে আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমার আনুগত্যের কথা বলি। তাঁরা আমাকে সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা করেন। আমাকে তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে এ যুদ্ধ পরিচালনায় সহায়তা করা যায়। আমি তাঁদের অনুরোধ জানাই, যেকোনো উপায়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে যদি কোনো অস্ত্রশস্ত্র আনার বন্দোবস্ত করতে পারেন, তাহলে আমি আমার এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরও সুন্দর ও শক্তিশালী করতে পারি। আমি তখন জানতাম যে আমার কাছে যা গোলাবারুদ আছে, তা নিয়ে বেশি দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাঁরা এই বার্তা নিয়ে আগরতলাতে চলে যান।

এই সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসরমাণ পাঞ্জাবি সেনাদের সঙ্গে আমার অগ্রবর্তী সেনাদের কোম্পানীগঞ্জে লড়াই হয়। এতে অনেক পাকিস্তানি হতাহত হয়ে আবার কুমিল্লা সেনানিবাসের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। ২৯ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে শত্রুসেনা প্রথম বিমান হামলা চালায়। এতে আমার একজন সেনা শহীদ হয়। সেদিনই সন্ধ্যায় পাকিস্তানিদের একটি রেকি দল (তথ্য অনুসন্ধানী দল) একজন অফিসার এবং আটজন সেপাইসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আসে। দলটি আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটির অ্যামবুশে পড়ে যায় এবং অফিসারসহ সব শত্রুসেনা এবং একখানা গাড়ি ধ্বংস হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওপর বিমান হামলা চলতে থাকে এবং আমাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরও বেশি শক্তিশালী হতে থাকে। এ অবস্থায় আমি ভৈরব বাজার ও নরসিংদীর ভেতরের রেললাইন অনেক জায়গায় বিচ্ছিন্ন করে দিই এবং আর একটি দলকে নরসিংদী পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিই। আমার এই দলের সঙ্গে ঢাকা থেকে আগত ইপিআর [পরে বিডিআর, বর্তমানে বিজিবি] ও দ্বিতীয় বেঙ্গলের কিছু সেনার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই সম্মিলিত দলটি ঢাকা থেকে পাকিস্তানি সেনাদের

অগ্রসরমাণ এক বিরাট বাহিনীকে অ্যামবুশ করে পর্যুদস্ত করে এবং ঢাকার দিকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে।

আমাদের তখনো বাইরের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা বাঙালি সেনাবাহিনীর অন্য কোনো দলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। অন্যান্য জায়গা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম।

আমি জানতে পারি যে মেজর সফিউল্লাহ [কাজী মুহাম্মদ সফিউল্লাহ (কে এম সফিউল্লাহ) বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল, সেনাপ্রধান ও রাষ্ট্রদূত] ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জে এসে তাঁর দ্বিতীয় বেঙ্গলকে একত্র করেছেন। আমি আরও জানতে পারলাম, তিনি তাঁর মুষ্টিমেয় সেনা নিয়ে ঢাকা অভিমুখে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। এ সংবাদে আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত হয়ে পড়ি। কারণ, আমি জানতাম, ঢাকায় পাকিস্তানিদের অন্ততপক্ষে দুই ব্রিগেড সেনা আছে। তা ছাড়া সাঁজোয়া বাহিনীর ট্যাংক, গোলন্দাজ বাহিনীর কামান ও বিমানবাহিনী আছে। এসব অত্যন্ত শক্তিশালী ও আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত। বিরাট পাকিস্তানি সেনার বিরুদ্ধে অল্পসংখ্যক সেনা ও অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করার মানেই ছিল আমাদের শক্তিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা। আমার সঙ্গে মেজর সফিউল্লাহর যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত কোনো সরাসরি রাস্তা না থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা খুবই প্রয়োজন। তা না হলে এই সর্বনাশকে কিছুতেই রোধ করা যাবে না। অনেক চেষ্টার পর আমি একটি খালি রেল ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করলাম। ক্যাপ্টেন মাহবুবকে [শহীদ মাহবুবুর রহমান বীর উত্তম। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ফ্রন্টিয়ার ফোর্সে ছিলেন। এর অবস্থান ছিল কুমিল্লা সেনানিবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৯ মার্চ কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে পালিয়ে চতুর্থ বেঙ্গলের সঙ্গে যোগ দেন। মেজর খালেদ মোশাররফ তাঁকে ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি দেন। পরে তিনি জেড ফোর্সের অধীন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানির অধিনায়ক নিযুক্ত হন। কানাইঘাট যুদ্ধে তিনি শহীদ হন] সেই ইঞ্জিনে বসিয়ে সোজা কিশোরগঞ্জ পাঠিয়ে দিলাম। তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলাম। কোনো কিছু করার আগে সে যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং সম্ভব হলে আমার সঙ্গে তাকে দেখা করার অনুরোধ জানাই।

এরপর ক্যাপ্টেন মাহবুব ফিরে এসে জানায়, মেজর সফিউল্লাহ ও তাঁর সব সেনাদল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছে। মেজর সফিউল্লাহ তাঁর বাহিনীকে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছান এবং তিনি আমার হেডকোয়ার্টারস

তেলিয়াপাড়ায় আসেন। আমাদের দুটি দলের মধ্যে যোগাযোগ হওয়াতে আমাদের শক্তি ও মনোবল বেড়ে যায়। এরপর আমরা বসে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করি। আমরা জানতে পারি, পাকিস্তানিরা আমাদের আক্রমণ করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা পাকিস্তানিদের আক্রমণের কৌশল সম্পর্কে বিশ্লেষণ করি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের ওপর বিমান-হেলিকপ্টার ও নদীপথে ঢাকার দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। নদীপথে আক্রমণ করার জন্য তারা মেঘনার পথে গানবোটে আসতে পারে এবং মেঘনার দক্ষিণ পারে অবতরণ করতে পারে পাশাপাশি তারা হেলিকপ্টারযোগেও কমান্ডো ও শত্রুবাহিনী নামাতে পারে।

যে বিস্তীর্ণ মুক্ত এলাকা আমাদের আয়ত্তাধীন ছিল, সেসব এলাকাতে সেনা মোতায়েন করার মতো সেনা আমার কাছে ছিল না। সে জন্য আমি আমার ট্রুপসকে যেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর অবতরণের এবং আক্রমণের বেশি সম্ভাবনা, সে জায়গাগুলোতে ডিফেন্স নেওয়ার বন্দোবস্ত করি। এ সময় আমি জানতে পারি, চতুর্থ বেঙ্গলের জনা পঞ্চাশেক সেনা, যারা কুমিল্লার দক্ষিণে জাঙ্গালিয়া ইলেকট্রিক গ্রিড স্টেশনে পাহারায় ছিল, সেই সেনারাও ২৫ মার্চের পর নিকটবর্তী একটি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এবং আমার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। আমি এই অবস্থায় তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে দিই এবং তাদের আরও দক্ষিণে গিয়ে লাকসাম ও কুমিল্লার মাঝখানে লালমাই পাহাড়ের মধ্যপ্রান্তে টেম্পল পাহাড়ে এক জায়গায় প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলার নির্দেশ দিই। তাদের আরও নির্দেশ দিলাম যে, কুমিল্লা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী লাকসাম, নোয়াখালী কিংবা চাঁদপুরের দিকে অগ্রসর হলে তাদের যেন অ্যামবুশ করা হয় এবং বাধা দেওয়া হয়। এর মধ্যে আমি খবর পাই আখাউড়া, কসবা ও বুড়িচংয়ে ইপিআর পোস্টগুলোতে আগে থেকে নিয়োজিত পাকিস্তানি ইপিআর সেনারা বাঙালি ইপিআরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে আমি ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনকে [মুহাম্মদ আইন উদ্দিন বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল। ১৯৯৬ সালে অভ্যুত্থানের অভিযোগে চাকরিচ্যুত] কিছু লোকজন দিয়ে পাঠাই, যাতে বাঙালি ইপিআরদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে এসব পোস্ট পাঞ্জাবিদের কবল থেকে মুক্ত করা যায়। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং স্থানীয় জনসাধারণের সম্মিলিত হামলায় অনেক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের পর পাঞ্জাবিরা এসব অবস্থান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এসব খণ্ডযুদ্ধের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কুমিল্লার গোমতী পর্যন্ত

আমি পাকিস্তানি সেনা এলাকা মুক্ত করতে সমর্থ হই এবং কুমিল্লা বিবিরবাজারে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলি।

ইতিমধ্যে তাহের উদ্দিন ঠাকুর ও সাচ্চু মিয়ার প্রচেষ্টায় আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রের তরফ থেকে কিছু সাড়া পাওয়া যায়। সীমান্তে আমার সঙ্গে আগরতলার তখনকার জেলা প্রশাসক [জেলা ম্যাজিস্ট্রেট] মি. সাইগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বাংলাদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে তখনো তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না। আমার কাছে বিস্তারিত জানতে পেরে তিনি আমাকে জানালেন, এ সম্পর্কে তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। তাঁকে আমি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যান। কয়েক দিন পর আবার সীমান্ত এলাকায় ভারতের সেনাবাহিনীর ৫৭তম ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল গনজালভেজের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁকেও আমি ঘটনাবলির বিস্তারিত বিবরণ দিই। তখন পর্যন্ত আমরা কোনো সাহায্য পাইনি।

২/৪ এপ্রিল কুমিল্লার সীমান্তে মতিনগরের কাছে কর্নেল এম এ জি ওসমানী [মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর প্রধান বা প্রধান সেনাপতি। পরে সম্মানিত জেনারেল ও মন্ত্রী] যখন ভারত সীমান্তে পৌঁছান, তখন আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি প্রথমে আমার কাছে সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন এবং তার পরই তিনি আগরতলায় চলে যান। পরের দিন সন্ধ্যায় আমার হেডকোয়ার্টারস তেলিয়াপাড়ায় কর্নেল ওসমানী আমাকে, মেজর সফিউল্লাহ ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল রবকে নিয়ে একটি বৈঠক করেন। এ বৈঠকে আমরা তাঁকে যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত করি। আমি তাঁকে আরও জানাই, আমাদের যে শক্তি আছে তা দিয়ে বেশি দিন পাকিস্তানি বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অতিসত্বর বন্ধুরাষ্ট্রের কাছ থেকে বা অন্য কোনো জায়গা থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা তাঁকে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে শিগগিরই বাংলাদেশ সরকার গঠন করার অনুরোধ জানাই। যাতে আমরা বহির্জগতের স্বীকৃতি পাই এবং যুদ্ধের সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাই। তিনি আমাদের বক্তব্য বুঝতে পারলেন এবং আগরতলা থেকে কলকাতা চলে যান। কিছুদিন পর ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে স্বীকার করে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়।

এই সময় বন্ধুরাষ্ট্র থেকে বিএসএফের [ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী] ব্রিগেডিয়ার পান্ডে [ব্রিগেডিয়ার বি সি পান্ডে মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে বিএসএফের পক্ষ থেকে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন] আমাদের হেডকোয়ার্টারসে আসেন এবং আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন আমাদের সহায়তা করার, কিন্তু সে সাহায্য ছিল নগণ্য। আমরা চাইছিলাম হালকা ও ভারী স্বয়ংক্রিয় হাতিয়ার, মর্টার ইত্যাদি। কিন্তু সে সময় আমাদের খুবই অল্পসংখ্যক ৩০৩ রাইফেল ও গুলি দেওয়া হয়। তা ছিল আমাদের দরকারের চেয়ে খুবই নগণ্য। এ সময় ব্রিগেডিয়ার পান্ডে আমাদের মেজর জিয়াউর রহমান [জিয়াউর রহমান বীর উত্তম। পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল, সেনাপ্রধান, সামরিক আইন প্রশাসক, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৮১ সালে নিহত] সম্পর্কে বিস্তারিত জানান এবং একদিন মেজর জিয়াউর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। পান্ডে বলেন, পাকিস্তানি বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং যুদ্ধ করার জন্য তার [জিয়াউর রহমান] কাছে অতি অল্পসংখ্যক সেনা আছে এবং তিনি [পান্ডে] আমাকে ও মেজর সফিউল্লাহকে মেজর জিয়াউর রহমানকে কিছু সেনা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। আমি ও মেজর সফিউল্লাহ নিজ নিজ বাহিনী থেকে সেনা নিয়ে দুটি শক্তিশালী কোম্পানি গঠন করে মেজর জিয়াউর রহমানের কাছে পাঠাই।

এই সময় পাকিস্তানি বাহিনী আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোয় আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর ওপর প্রবল বিমান আক্রমণ চালাতে থাকে। এই আক্রমণ এতই ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যে মাঝে মাঝে সাত থেকে নয় ঘণ্টা অনবরত স্ট্রাপিং, রকেটিং ও বোম্বিং চলতে থাকে। এপ্রিল মাসের শেষে পাকিস্তানি বাহিনী বিমানবাহিনীর সহায়তায় হেলিকপ্টার ও গানবোটের সাহায্যে আমাদের আশুগঞ্জ পজিশনে সেনা অবতরণ করায়। আমাদের সেনারা পাকিস্তানি বিমানবাহিনী এবং ছত্রীদের সম্মিলিত সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে অসহায় হয়ে আশুগঞ্জ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পিছু হটে আসে। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত আমরা পাকিস্তানি বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখি এবং শেষ পর্যন্ত শত্রুদের সাঁজোয়া বাহিনী, বিমানবাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে আর টিকতে না পেরে আমরা দুই দিকে পিছু হটে যাই। আমার সেনারা ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনের নেতৃত্বে আখাউড়ায় এসে তিতাস নদীর ওপর পুনরায় প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে। মেজর সফিউল্লাহ তাঁর

বাহিনী নিয়ে মাধবপুরের দিকে চলে যান। পাকিস্তানি বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এক ব্যাটালিয়ন শক্তি নিয়ে আসে এবং আখাউড়া আক্রমণ করে কিন্তু অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। এখানে তাদের অনেকেই হতাহতও হয়।



ছবি : খালেদ'স ওয়ার তথ্যচিত্র থেকে

মানচিত্রের সাহায্যে যুদ্ধের নির্দেশদানরত মেজর খালেদ

আমি এ সময় কুমিল্লার দক্ষিণে যে দলটি ছিল, অর্থাৎ চতুর্থ বেঙ্গলের 'ব্রাভো' কোম্পানিকে—তাদের লেফটেন্যান্ট মেহবুব ও লেফটেন্যান্ট দিদারুলের [মো. দিদারুল আলম বীর প্রতীক। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল] নেতৃত্বে আরও কিছু সেনা পাঠিয়ে জোরদার করি।

কুমিল্লা থেকে এপ্রিল মাসের ১৫/১৬ তারিখে পাকিস্তানি বাহিনীর বিশাল এক গাড়ির বহরে, প্রায় ৩০টি গাড়িতে, সেনা ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লাকসামের দিকে যাচ্ছিল। মেহবুবের নেতৃত্বে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'বি' কোম্পানির সেনারা শত্রুসেনার দলটিকে দুপুর ১২টায় জাঙ্গালিয়ার কাছে অ্যামবুশ করে। এই অ্যামবুশে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সংঘর্ষ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। পাকিস্তানি সেনারা গাড়ি থেকে নেমে অ্যামবুশ দলকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের সেনাদের সাহসিকতা ও কৌশলের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এ সংঘর্ষে লেফটেন্যান্ট মেহবুব ও লেফটেন্যান্ট দিদার যথেষ্ট কৌশল ও যুদ্ধনিপুণতার পরিচয় দিয়েছিল। লেফটেন্যান্ট মেহবুব তার সেনাদের নিয়ে রাস্তার পূর্ব পাশে অ্যামবুশ করে ওত পেতে বসে ছিল। যখন পাকিস্তানিদের গাড়ির বহর তার অ্যামবুশের মাঝে পড়ে যায়, তখন সে তাদের ওপর তার সেনাদের নিয়ে গুলি ছুড়তে থাকে। এতে একটি গাড়ি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে যায়। বাকি গাড়িগুলো থেকে পাকিস্তানি সেনারা লাফিয়ে নিচে নামার চেষ্টা করে। এতেও তারা যথেষ্ট হতাহত হয়। যেসব পাকিস্তানি সেনা গাড়ি থেকে ভালোভাবে নামতে পারে তারা রাস্তার ওপারে (পশ্চিম দিক) গিয়ে একত্র হয় এবং লেফটেন্যান্ট মেহবুবের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। এদিকে লেফটেন্যান্ট দিদারুল আলম রাস্তার পশ্চিম পাশে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা নিয়ে তৈরি ছিল। সে পাকিস্তানিদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এভাবে দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে এবং নিজেদের এত হতাহতের ঘটনা দেখে পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল একেবারেই ভেঙে যায়। সহযোদ্ধাদের মৃতদেহ ফেলে রেখেই তারা কুমিল্লার দিকে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধের ফলে লেফটেন্যান্ট মেহবুব ও লেফটেন্যান্ট দিদারুল আলমের সম্মিলিত দলটি দুটি মেশিনগান, ছয়টি হালকা মেশিনগান এবং অজস্র রাইফেল হতাহত শত্রুসেনাদের কাছে থেকে সংগ্রহ করে। যে বিধ্বস্ত গাড়িগুলো পাকিস্তানিরা ফেলে গিয়েছিল তা থেকে কয়েক হাজার অ্যামিউনিশন উদ্ধার করা হয়। এর তিন দিন পর স্থানীয় জনসাধারণ আরও দুটি হালকা মেশিনগান, কয়েকটি রাইফেল এবং বেশ কিছু গোলাবারুদ, যা পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যাওয়ার সময় ধানখেতে ফেলে

গিয়েছিল, আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়। এই অ্যাকশনের ফলে আমাদের অ্যামিউনিশনের প্রয়োজনীয়তা সাময়িকভাবে মিটেছিল এবং পাকিস্তানি বাহিনী বেশ কিছুদিন কুমিল্লার দক্ষিণে অগ্রসর হওয়ার সাহস দেখায়নি।

এই সময় আখাউড়ায় পাকিস্তানি বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিক থেকে আবার আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে তাদের ২৫ জনের মতো হতাহত হয় এবং পাকিস্তানি বাহিনী আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পশ্চাদপসরণ করে। এপ্রিল মাসের শেষে পাকিস্তানি বাহিনী কুমিল্লা থেকে উত্তর দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাস্তা ধরে অগ্রসর হয় এবং ১২ নম্বর ফ্রন্টিয়ার ফোর্স নিয়ে সায়েদাবাদ দখল করে নেয়। পরে পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে তারা দখল করে নেয় নিয়ামতবাদ ও গঙ্গাসাগর। আমি তখন কুমিল্লার বিবিরবাজার এলাকায় ছিলাম। আমি যেখান থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলাম, সেখানে পাকিস্তানি বাহিনী প্রতিদিন আক্রমণ চালাচ্ছিল। গঙ্গাসাগর, নিয়ামতবাদ শত্রুকবলিত শুনতে পেয়ে ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনকে চতুর্থ বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানি নিয়ে কসবার উত্তরে চণ্ডীমুড়া পাহাড়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ শক্তিশালী করার নির্দেশ দিই। সে রাতেই কুমিল্লার দক্ষিণ থেকে চতুর্থ বেঙ্গলের আলফা কোম্পানিকে উঠিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসি এবং গঙ্গাসাগরের কাছে দুটি কোম্পানিকেই একত্র করি। সন্ধ্যায় যখন চণ্ডীমুড়ার কাছে পৌঁছাই তখনই শত্রুদের অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি একটি বিবরণ ইপিআরের কাছ থেকে অবগত হই এবং সেই রাতেই গঙ্গাসাগর ও নিয়ামতবাদে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিই। ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন, ক্যাপ্টেন গাফফার ও একজন সুবেদারের নেতৃত্বে আলফা, চার্লি ও ডেলটা কোম্পানি নিয়ে ভোর পাঁচটায় পাকিস্তানিদের ওপর আক্রমণ করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিই। এই আক্রমণের পরিকল্পনার ছকটা ছিল এ রকম: ক্যাপ্টেন গাফফার ও ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন পূর্ব দিক থেকে অর্থাৎ পাকিস্তানি সেনাদের গঙ্গাসাগর পজিশনের পেছন দিক দিয়ে ইনফিলট্রেট করে ভেতরে ঢুকে গঙ্গাসাগরের ওপর আক্রমণ চালাবে এবং সেই সময় সুবেদার তার আলফা কোম্পানি নিয়ে নিয়ামতবাদের ওপর, অর্থাৎ, যে জায়গাটাকে আমরা শত্রুদের হেডকোয়ার্টারস ভেবেছিলাম সেখানে আক্রমণ চালাবে। এ দুই আক্রমণ একসঙ্গে রাত চারটায় শুরু হবে। আক্রমণের ঠিক ১০ মিনিট আগে সুবেদার শামসুল হকের [বীর প্রতীক, পরে অনারারি ক্যাপ্টেন] নেতৃত্বে চতুর্থ বেঙ্গলের মর্টার এই দুই পজিশনের ওপর গোলা ছুড়বে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত ১২টায় আমি কোম্পানি তিনটিকে নিয়ে পাকিস্তানি ঘাঁটিতে ঢুকে পড়ি। সেদিন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

চারদিক পানিতে সয়লাব। হাঁটুপানি ভেঙে ভয়ংকর এক গন্তব্যে আমাদের অগ্রসর হতে হচ্ছিল। একসময় আমার মনে হচ্ছিল, আমরা বোধ হয় ঠিক পথে যাচ্ছি না। এ সময় নিকটবর্তী এক বাড়ির একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ব্যক্তি। তিনি পাকিস্তানিদের অবস্থান সম্পর্কে দিনে দূর থেকে যা দেখেছেন, সে সম্পর্কে আমাদের আরও বিস্তারিত জানান। এই ব্যক্তির সাহায্যে আমি এবং আমার প্রতিটি দল ভোর পাঁচটায় আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাই। আক্রমণ করার নির্দিষ্ট সময় ছিল রাত চারটা। যেহেতু আমরা দেরিতে পৌঁছাই, সেহেতু ভোর পাঁচটায় আক্রমণ শুরু করি। পাকিস্তানি সেনারা তাদের অবস্থানে ও পেছন দিকে হঠাৎ ভয়ংকর গোলাগুলির শব্দ শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তারা গঙ্গাসাগর ও নিয়ামতবাদ ছেড়ে সায়েদাবাদে পশ্চাদপসরণ করে। আমরা পরের দিন সকালে গঙ্গাসাগরে আবার প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলি। পাকিস্তানি সেনারা গঙ্গাসাগরে পর্যুদস্ত হয়ে কসবার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। তাদের প্রথম আক্রমণ আমরা ব্যর্থ করে দিই কিন্তু পরে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানি সেনারা টি আলীর [মুসলিম লীগের নেতা] বাড়ি পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সেখানে ঘাঁটি গড়ে তোলে। আমরা আমাদের কসবা পুরান বাজারের পজিশন শক্তিশালী করে তুলি এবং পাকিস্তানি সেনাদের কসবার দিকে অগ্রসর হতে বাধা দিই। টি আলীর বাড়িতে পাকিস্তানি সেনাদের যে ঘাঁটি ছিল, সেই ঘাঁটির ওপর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানি মর্টারের সহায়তায় ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। আক্রমণে পাকিস্তানিদের চার-পাঁচটি গাড়িতে আগুন ধরে যায় এবং ২০-৩০ জন হতাহত হয়। তারা টি আলীর বাড়ি ছেড়ে আরও পেছনে হটে যায়।

এই সময় আমাদের কুমিল্লার বিবিরবাজার পজিশনের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও তারা কুমিল্লা শহরের দেড় মাইল পূর্ব দিকে তারণ্যপুর দখল করতে ব্যর্থ হয়। আমি ইপিআরের একটি কোম্পানি এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছুসংখ্যক সেনা দিয়ে বিবিরবাজার প্রতিরক্ষাব্যূহ আরও শক্তিশালী করে তুলি। আমাদের এই প্রতিরক্ষা-অবস্থানে পাকিস্তানি সেনারা বারবার আক্রমণ চালাতে থাকে। এই অবস্থানের ওপর পাকিস্তানি সেনাদের লক্ষ্য এ জন্য ছিল যে, প্রতিরাতে এখান থেকে আমার ছোট ছোট কমান্ডো দল গোমতী নদী পার হয়ে কুমিল্লা শহরে পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর অতর্কিত হামলা চালাত এবং তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। এখান থেকে আমরা অনেক সময় তাদের অবস্থানের ওপর

মর্টার হামলাও চালাতাম। এতে প্রায়ই পাকিস্তানি অনেক সেনা হতাহত হতো। অবশেষে পাকিস্তানি বাহিনী একদিন সন্ধ্যার সময় এই পজিশনের ওপর ৩৯তম বালুচ রেজিমেন্টের সাহায্যে এবং গোলন্দাজ বাহিনী ও ট্যাংকের সহায়তায় অতর্কিতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। প্রথমে শত্রুসেনারা পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ আমার সৈনিকেরা নস্যাৎ করে দেয় এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অনেক সেনা নিহত ও আহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে আমাদের পজিশনের পেছনে বাঁ পাশে ট্যাংক ও ৩৯ বালুচ রেজিমেন্টের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ অন্ততপক্ষে চার-পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। আমাদের গুলিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের অন্তত ১০০ থেকে ১৫০ জন সেনা নিহত বা আহত হয়। কিন্তু ট্যাংক ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চলতে থাকায় এবং পেছন দিক থেকে ঘিরে ফেলার আশঙ্কা থাকায় আমাকে বাধ্য হয়ে এই অবস্থান ছাড়তে হয়।

এই যুদ্ধে ইপিআরের বাঙালি সেনারা যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ করে, মনে পড়ে এক নায়েকের কথা। সে শত্রুদের গুলি করতে করতে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে তাদের নিহতের বিপুল সংখ্যা দেখে একপর্যায়ে 'জয় বাংলা' হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং সেই সময় হঠাৎ দুর্ভাগ্যবশত তার মাথায় গুলি লাগে এবং সে শহীদ হয়। এই যুদ্ধে আমাদের ছয়জন সেনা মারা যায় এবং ৮-১০ জন আহত হয়। আহতদের আমরা পেছনে নিয়ে আসি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে পারিনি। এ রকম একজন আহত তরুণ ছাত্রের কথা মনে পড়ে, যার পেটে গুলি লেগেছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচার করার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় সে মারা যায়।

এদিকে গঙ্গাসাগর ও আখাউড়ায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আবার তৎপর হয়ে ওঠে এবং বারবার আখাউড়া ও গঙ্গাসাগরের ওপর আক্রমণ চালায়। জুন মাসের প্রথমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ট্যাংক, কামান ও বিমানবাহিনীর সহায়তায় আখাউড়া রেলস্টেশন ও গঙ্গাসাগরের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে চতুর্থ বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানি কিছুটা পিছু হটে আজমপুর ও আখাউড়া রেলস্টেশন থেকে আধা মাইল পূর্বে আবার প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। এই প্রতিরক্ষাব্যূহ সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকাগামী রেলপথকেও পাকিস্তানি সেনাদের ব্যবহারে বাধা দিতে সমর্থ হয়। এই অবস্থানগুলোর ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বারবার আক্রমণ চালায়

এবং প্রতিবারই ৩০-৪০ জন করে সেনা হতাহত হওয়ায় তারা আক্রমণ থেকে দূরে থাকে।

মে মাসে কর্নেল ওসমানী আমাদের হেডকোয়ার্টারসে আসেন। সে সময় ভবিষ্যৎ যুদ্ধ পরিচালনা কীভাবে হবে, সে সম্পর্কে তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ওসমানী আমাকে নির্দেশ দেন যুদ্ধ-পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি বেসিক পেপার তৈরি করতে। আমি মেজর সফিউল্লাহ্‌র সঙ্গে পরামর্শ করে একটি বেসিক পেপার তৈরি করে ফেলি। এ পরিকল্পনায় আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে দুই বাহিনীর সহায়তায় পরিচালনা করার পন্থা নিই। আমরা পরিকল্পনা করি যে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হলে আমাদের শক্তিকে আরও বাড়াতে হবে। দুই রকমের বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। নিয়মিত বাহিনী, যা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং অন্যান্য আর্মস সার্ভিসের [মুজাহিদ, পুলিশ, আনসার] নিয়মিত সেনাদের নিয়ে গঠিত হবে। এসব নিয়মিত বাহিনী নিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ডিভিশন গড়ে উঠবে এবং কিছুসংখ্যক নিয়মিত সেনা নিয়ে প্রতি সেক্টরেই কোম্পানি গঠন করা হবে। এসব কোম্পানি শত্রুদের যোগাযোগব্যবস্থায় কমান্ডো অ্যাকশন চালিয়ে যাবে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পুরোনো ও নতুন ব্যাটালিয়নগুলো নিয়ে গড়ে তোলা ব্রিগেড শত্রুদের ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালাবে এবং প্রয়োজন হলে দখল করা অবস্থানগুলোয় প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলবে। যেসব যুবক পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে, তাদেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি অনিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই অনিয়মিত বাহিনী ছোট ছোট গ্রুপ ও কোম্পানিতে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে নিজ নিজ এলাকা শত্রুমুক্ত করবে। এসব নিয়মিত বাহিনীর কোম্পানি ও গ্রুপগুলো যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারে এবং তাদের পরিচালনার জন্য নিয়মিত বাহিনী থেকে যাতে জেসিও বা এনসিওদের পাঠানো হয়, পরিকল্পনায় সে কথা বলা হয়। এ পরিকল্পনায় আমরা আরও উল্লেখ করি, নিয়মিত বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানি নিয়মিত বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের মতোই হবে। কিন্তু অনিয়মিত বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র হালকা ধরনের হবে এবং এলএমজির চেয়ে ভারী অস্ত্র তাদেরকে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

কর্নেল ওসমানী আমাদের সঙ্গে একমত হন এবং এ পরিকল্পনা যাতে তাড়াতাড়ি কার্যকর হয়, তিনি সে চেষ্টা করবেন বলে আমাদের আশ্বাস দেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের হাজার হাজার লোক ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অনেক যুবক আমাদের কাছে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমি আমার

হেডকোয়ার্টারসে একটি প্রশিক্ষণশিবির চালু করে দিই। এই প্রশিক্ষণশিবিরে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের প্রবর্তন করি। বিশেষ করে, পাকিস্তানি বাহিনীর যোগাযোগব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করে দেওয়ার জন্য ডেমোলিশন প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এ প্রশিক্ষণের ভার ক্যাপ্টেন হায়দার [এ টি এম হায়দার বীর উত্তম। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল। ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থানের ঘটনায় ৭ নভেম্বর নিহত।] ও হাবিলদার মুনিরের ওপর ন্যস্ত করি। অতিসত্বরই আমাদের বেশ কিছু ডেমোলিশন টিম ট্রেইন্ড হয়ে যায়। প্রথমেই আমি এসব দলকে ঢাকা, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রেললাইন ও পাকা সড়কে পাঠিয়ে দিই। তাদের যতটুকু সম্ভব পুল ও রেললাইন ধ্বংস করে দেওয়ার কাজ দিই। ডেমোলিশনের সরঞ্জামাদির অভাবে এসব কাজে আমাদের খুবই অসুবিধা হয়। আমরা হয়তো বারুদ পাই কিন্তু বারুদ ফোটানোর ডেটোনেটর কিংবা অন্য কোনো সরঞ্জামাদি পাই না। এসব অসুবিধার মধ্যেও আমরা প্রতিটি রেললাইন ও রাস্তায় বেশ কিছুসংখ্যক পুল ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হই। যার ফলে পাকিস্তানিদের ঢাকার সঙ্গে এসব প্রধান স্থানের যোগাযোগব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং পাকিস্তানকে বিমান ও জলপথের সাহায্য নিতে হয়। ওই অবস্থা শেষ পর্যন্ত চলে।

আমি আমার হেডকোয়ার্টারস তেলিয়াপাড়া থেকে সরিয়ে কুমিল্লার কাছে ভারতের মতিনগর নামক স্থানে স্থাপন করি। এখান থেকে কুমিল্লা ও ঢাকা কাছে হওয়ায় আমাদের পক্ষে এসব জায়গাতে গেরিলা-তৎপরতা চালানো অনেক সুবিধাজনক হয়। আমাদের প্রশিক্ষণশিবির এ সময় অনেক বড় হয়ে যায় এবং হাজার হাজার ছেলেকে আমরা প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করি। এসব ছেলের মধ্যে অনেককেই আমি নিয়মিত বাহিনীতে ভর্তি করি এবং অনেককে অনিয়মিত বাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রদান করি। প্রথম অবস্থায় সেনাদের এবং অনিয়মিত বাহিনীর লোকদের থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসার খুব অসুবিধা হয়। আমাদের কাছে না ছিল রসদ, না ছিল টাকাপয়সা; না ছিল বাসস্থান। অনেক সময় এই হাজার হাজার লোককে খাওয়ানোর জন্য আমাকে বাংলাদেশের ভেতরে বিভিন্ন রেশন ডিপো (এলএসডি) থেকে রসদ জোর করে আনতে হয়েছিল। কোনো কোনো সময় রসদের ব্যবস্থা হলেও হাজারো লোকের খাবার রান্না করার জন্য হাঁড়ি-পাতিল-বাসনপত্র ছিল না। তেলের ড্রাম কেটে আমরা পাত্র তৈরি করে নিই। এমনও হয়েছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একবার ক্যাম্পের লোকজন খেতে পেয়েছে শুধু আধা সেদ্ধ ভাত, কোনো সময় ডাল ছাড়াই। থাকার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশ লোককে বৃষ্টিতে ভিজতে



ছবি : রবীন সেনগুপ্ত

প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের শপথ পাঠ করাচ্ছেন মেজর খালেদ

হতো। কোনো বিশুদ্ধ পানি ছিল না, নালার পানি ব্যবহার করতে হতো। তবু, এত কষ্টের মধ্যে আমি ক্যাম্পে লোকজনের মুখে সব সময় হাসি ও উৎফুল্ল ভাব দেখতাম। এরা সবাই নিয়মিত ও গণবাহিনীর যোদ্ধা ছিল। তাঁরা মিলেমিশে সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। আস্তে আস্তে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। ভারত সরকার ইয়ুথ ক্যাম্প তৈরিতে সাহায্য করে। আমি আগরতলার রিলিফ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি ইয়ুথ ক্যাম্পের অনুমোদন করিয়ে নিই। ভারতের কাছ থেকে কিছুটা আর্থিক সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করি। এই সাহায্য পাওয়ার পর আমাদের লোকদের প্রচেষ্টায় আমরা মেলাঘর নামক স্থানে একটি ক্যাম্প গড়ে তুলি। ক্যাম্পটি পাহাড়ের ওপর এবং জঙ্গলের ভেতর বেশ একটি সুন্দর জায়গায় অবস্থিত ছিল। পাকিস্তানি হামলার আশঙ্কা থেকেও বিপদমুক্ত ছিল। এখানেই আমি আমার স্থায়ী হেডকোয়ার্টারস স্থাপন করি। এ ক্যাম্পটিতে বেশি জায়গা ছিল বলে আমি ৩-৪ হাজার লোককে একত্রে থাকা-খাওয়া ও প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হই। এ ক্যাম্পে আমি নিয়মিত ও গণবাহিনী—দুই ধরনের মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ শুরু করি। এ সময় কুমিল্লার দক্ষিণে আমার

যেসব সেনাদল ছিল, তাদের নিয়ে একটি সাবসেক্টর গঠন করি। এই সাবসেক্টর হেডকোয়ার্টারস আমি নির্ভয়পুরে স্থাপন করি। ক্যাপ্টেন আকবর [আকবর হোসেন বীর প্রতীক। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল, মন্ত্রী ও রাজনীতিক], লেফটেন্যান্ট মেহবুব ও লেফটেন্যান্ট কবির এই সাবসেক্টর থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এখান থেকে একটি কোম্পানি সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর অধীনে লাকসামের পশ্চিম দিকের এলাকায় তাদের গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে এবং এখান থেকে নোয়াখালী, লাকসাম, কুমিল্লা ও চাঁদপুরের রাস্তায় পাকিস্তানি সেনাদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালাতে থাকে।

জুলাই মাসে পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল এই এলাকাকে মুক্তিসেনাদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য লঞ্চযোগে চাঁদপুর থেকে ডাকাতিয়া নদীপথে অগ্রসর হয়। সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারী আগে থেকে এ সম্পর্কে খবর পেয়েছিল। সে ছাতুরার কাছে একটি সুপারির বাগানে পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। নদীর দুই পাশে হালকা মেশিনগান লাগিয়ে শত্রুদলের অপেক্ষায় ছিল তার দল। বেলা ১১টায় পাকিস্তানিরা লঞ্চযোগে অ্যামবুশ-অবস্থানের মধ্যে পৌঁছায়। নদীর দুই তীর থেকে আমাদের কোম্পানির লোকেরা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর অতর্কিতে গোলাগুলি চালায়। এতে লঞ্চের মধ্যে থাকা অনেক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। এ সংঘর্ষে পাকিস্তানি সেনারা পর্যুদস্ত হয়। উপায়ান্তর না দেখে পাকিস্তানি সেনারা লক্ষ থেকে পিছু হটে যায়। পরে আবার লঞ্চ থেকে নেমে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এবারও তারা পরাস্ত হয়ে চাঁদপুরে ফিরে যায়। 'আলফা' কোম্পানি পরে চাঁদপুর থেকে কুমিল্লার বেশ কয়েকটি সেতু ও রেলসেতু ধ্বংস করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরবর্তী পর্যায়ে অনেকবার আমাদের এই মুক্ত এলাকাকে দখল করার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। নির্ভয়পুর থেকে আমাদের সেনারা এবং গেরিলাবাহিনী লাকসাম-চট্টগ্রাম রেললাইনের লাকসাম ও চৌদ্দগ্রামের দক্ষিণে রেলসেতু ও রাস্তার সেতু ধ্বংস করে দেয়। এতে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার মধ্যে যোগাযোগব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

কুমিল্লার উত্তরে কসবা, মন্দভাগ, আখাউড়া, শালদা নদী প্রভৃতি অঞ্চলে যখন আমার সেনাদলের সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর সংঘর্ষ প্রতিদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল, ঠিক সে সময় কুমিল্লার দক্ষিণাঞ্চলে মিয়াবাজার ও চৌদ্দগ্রাম অঞ্চলেও আস্তে আস্তে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। আমার চতুর্থ বেঙ্গলের 'ব্রাভো' কোম্পানির একটি প্লাটুন এবং ইপিআর ও মুজাহিদদের

নিয়ে গঠিত সম্মিলিত দলটি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মিয়াবাজারে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ওপর প্রতিরক্ষা অবস্থান গঠন করে ব্যূহকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। এর ফলে চট্টগ্রাম-ঢাকার মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে এ অবস্থার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মিয়াবাজারের কাছে রাস্তায় যে সেতুটি ছিল, সেটা ভেঙে ফেলা হয়। এ ছাড়া কুমিল্লার ছয় মাইল দক্ষিণে বাগমারাতে যে রেলসেতুটি ছিল, সেটাও উড়িয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক আবার চালু করার জন্য ৩০ মে সকাল ছয়টায় দুই কোম্পানি সেনা নিয়ে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হয়। বেলা ১১টার সময় আমাদের একটি অ্যামবুশ দল মিয়াবাজারের উত্তরে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। পাকিস্তানি সেনাদল মিয়াবাজারের এত সামনে এ ধরনের হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে তারা সম্পূর্ণ হকচকিত হয়ে যায়। তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে কুমিল্লার দিকে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে পাকিস্তানিদের প্রায় ৫০ জন হতাহত হয়। আমাদের সেনাদল দুটি তিন টনের গাড়ি গোলাবারুদসহ ধ্বংস করে দেয় এবং একটি গাড়ি দখল করে নেয়। আমাদের পক্ষে দুজন সেনা নিহত এবং একজন আহত হয়। এরপর পাকিস্তানিরা কুমিল্লা বিমানবন্দরের অবস্থান থেকে আমাদের মিয়াবাজারের প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর ভারী কামানের সাহায্যে টানা গোলা বর্ষণ করতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থানের ওপরও পুনরায় আক্রমণের চেষ্টা চালায়। পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী টহলদল চিওড়া হয়ে মিয়াবাজারের পূর্ব দিক দিয়ে আমাদের অবস্থানের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্তু লেফটেন্যান্ট কবিরের নেতৃত্বে আমাদের একটি ছোট দল পাকিস্তানি বাহিনীর টহলদলকে অ্যামবুশ করে। এই অ্যামবুশে পাকিস্তানি বাহিনীর ১০ জন নিহত হয়। লেফটেন্যান্ট কবির পাকিস্তানি বাহিনীর পিছু ধাওয়া করে তাদের তাড়িয়ে দেয়।

মিয়াবাজারের অবস্থানটির ওপর পাকিস্তানি সেনাদের চাপ বাড়তে থাকে। কামানের গোলা দিনে দিনে আমাদের অবস্থানের ওপর তীব্র হতে থাকে। অবস্থানটি বেশি দিন আর টেকানো যাবে না ভেবে আমি লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামানকে [ইমাম-উজ-জামান বীর বিক্রম। পরে মেজর জেনারেল] একটু পিছু হটে চৌদ্দগ্রাম থানার বাজারের কাছে নতুন করে অবস্থান তৈরির নির্দেশ দিই। লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান তার দল নিয়ে চৌদ্দগ্রামে আবারও একটি নতুন প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। এ প্রতিরক্ষাব্যূহ তিন দিকে মুখ করে গড়ে তোলা হয়। চতুর্থ বেঙ্গলের প্লাটুনটি মিয়াবাজারে কুমিল্লার দিকে মুখ করে

পজিশন নেয়। কুমিল্লা-চৌদ্দগ্রাম রাস্তায় মিয়াবাজারে যে সেতুটি ছিল, তার দক্ষিণে অবস্থানটি গড়ে তোলা হয়। তাদের ওপর দায়িত্ব ছিল কুমিল্লা থেকে পাকিস্তানি বাহিনীকে দক্ষিণ দিকে এগোতে বাধা দেওয়া। আরেকটি প্লাটুনকে পশ্চিম দিকে মুখ করে বাগমারা থেকে যে কাঁচা রাস্তা মিয়াবাজারের দিকে গেছে, সেই রাস্তায় প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করার নির্দেশ দিই। মুজাহিদ কোম্পানির দায়িত্ব ছিল দক্ষিণ দিকে মুখ করে মিয়াবাজার থেকে আধা মাইল দক্ষিণে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা মহাসড়কের ওপর অবস্থান গড়ে তোলা এবং দক্ষিণ থেকে অগ্রসরমাণ পাকিস্তানি সেনাদের বাধা দেওয়া। কিছু কিছু মাইন এবং সরু বাঁশ কেটে আমরা এই অবস্থানটির চারদিকে পুঁতে দিই। এতে আমাদের অবস্থানটি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ অবস্থানটির হেডকোয়ার্টারস চৌদ্দগ্রাম থানায় স্থাপন করি। দুই সপ্তাহ পরে পাকিস্তানি সেনারা কুমিল্লার দিক থেকে এ অবস্থানটির ওপর দুটি কোম্পানি নিয়ে আক্রমণ চালায়। আমাদের পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানিদের বেশ কিছু সেনা হতাহত হওয়ার পর তারা আক্রমণ বন্ধ করে দিয়ে পশ্চাদপসরণ করে। তবে পাকিস্তানি সেনারা আমাদের অবস্থানের ওপর তাদের কামানের গোলা বর্ষণ অব্যাহত রাখে।

১৪ জুন সকাল ছয়টার সময় পাকিস্তানি সেনারা নয়াবাজার হয়ে চৌদ্দগ্রামের দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু তারা নয়াবাজারের কাছে আমাদের একটি অ্যামবুশের মধ্যে পড়ে যায়। শত্রুদের প্রায় ৩০ জন হতাহত হয়। তাদের অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় এবং তারা পিছু হটে যায়। ১৯ জুন সকাল ছয়টায় পাকিস্তানি সেনারা অন্ততপক্ষে দুই ব্যাটালিয়ন সেনা নিয়ে দুই দিক থেকে (লাকসাম ও ফেনীর দিক থেকে) প্রবল আক্রমণ শুরু করে। প্রচণ্ড কামানের গোলার মুখে আমাদের সম্মুখবর্তী সেনারা পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে আমাদের চৌদ্দগ্রামের অবস্থানটি পাকিস্তানি সেনা পরিবেষ্টিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। যদিও পাকিস্তানি সেনাদের সারা দিনের যুদ্ধে অন্তত ২০০ জন হতাহত হয়েছিল। অন্যদিকে আমাদের পক্ষের দুজন নিহত হয় এবং আহত হয় চারজন। চৌদ্দগ্রাম অবস্থানটি শত্রুদের প্রবল আক্রমণের কারণে আর রক্ষা করা যাবে না বলে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমাদের সেনাদল অবস্থানটি ত্যাগ করে।

এর আগে মে মাসে যখন পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে আমাদের সম্মুখযুদ্ধ চলছিল, সে সময় আমার মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুবাহিনীর পেছনে তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। ২১ মে দুজন মুক্তিযোদ্ধা জামাল [জামাল কবির বীর প্রতীক।

বর্তমানে ফ্রান্স-প্রবাসী] ও খোকন একটি অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন পুঁতে শত্রুবাহী একটি ট্রাককে কুমিল্লার কাছে উড়িয়ে দেয়। গেরিলাদের আরেকটি দল দেবীদ্বার থানা আক্রমণ করে। এতে ছয়জন দালাল পুলিশ নিহত হয়। তাদের হাতে হাজীগঞ্জ থানার একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও দুজন দালাল পুলিশ নিহত হয়। এ সংবাদ পেয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি ছোট দল (১০ জনের মতো) হাজীগঞ্জ থানা পাহারায় নিযুক্ত হয়। গেরিলারা একদিন আক্রমণ চালিয়ে তাদের চারজনকে হত্যা করে।

এ সময় ঢাকায় আমাদের কমান্ডো ছেলেরা নয়টি সরকারি অফিসে আক্রমণ চালিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেগুলো ছিল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, হাবিব ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সদরঘাট টার্মিনাল, *পাকিস্তান অবজারভার* অফিস প্রভৃতি। এসব আক্রমণে চারজন পাকিস্তানি সেনা অফিসার ও দুজন সেনা নিহত হয়।

কুমিল্লার দক্ষিণে গৌরীপুর নামক স্থানে আমাদের কমান্ডোরা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণেও পাকিস্তানি সেনাদের নয়জন নিহত হয়।

পাকিস্তানি সেনারা ইতিমধ্যে শালদা নদী এলাকায় বিশেষভাবে তাদের সেনাসংখ্যা বাড়াতে থাকে। তাদের একটি রেলের ট্রলি পাকিস্তানি সেনাদের জন্য রেশন ও অ্যামিউনিশন নিয়ে যাচ্ছিল। সেটি ২১ মে আমাদের একটি ছোট অ্যামবুশ দলের হাতে ধরা পড়ে। এর ফলে আমাদের হস্তগত হয় এমজি, আইএমএম ৩, ৭৫ এমএম এবং ১০৬ আরআর [রিকোয়েললেস রাইফেল] শেল।

২২ মে মুজাহিদ ক্যাপ্টেন আবদুল হকের [আবদুল হক ভূঁইয়া বীর বিক্রম] নেতৃত্বে একটি গেরিলাদল শালদা নদী এলাকায় অবস্থানরত পাকিস্তানিদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির ওপর হঠাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণ পাকিস্তানিদের পশ্চাদ্ভাগ থেকে চালানো হয়। পাকিস্তানিরা এ রকম আক্রমণের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। মুজাহিদ ক্যাপ্টেন আবদুল হকের প্লাটুন পাকিস্তানিদের অবস্থানটি ভেদ করে ভেতরে ঢোকে। পাকিস্তানিরা তাদের অবস্থানের ভেতরে এ ধরনের অতর্কিত আক্রমণে সম্পূর্ণ হকচকিয়ে যায়। এই আক্রমণের পর আমরা জানতে পারি, পাকিস্তানি সেনাদের প্রায় ১৫ জন আহত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে চারজন মারা গেছে।

২৫ মে রাত আড়াইটার সময় আমাদের অ্যামবুশ দল ভাটপাড়া জোড়কাননের কাছে পাকিস্তানিদের একটি ট্রাক ও একটি আরআর

রাইফেলবাহী জিপ অ্যামবুশ করে। এই অ্যামবুশে শত্রুপক্ষের প্রায় ২০ জন সেনাসহ একটি ট্রাক ও একটি জিপ ধ্বংস হয়ে যায়। ২৯ মে সকাল সাড়ে ছয়টায় একটি অ্যামবুশ দল সুবেদার আবদুর রহমানের নেতৃত্বে ১৫ জন সদস্য নিয়ে কুমিল্লার উত্তরে রঘুরামপুরে অ্যামবুশ করে বসে থাকে। পাকিস্তানি সেনাদের একটি টহলদল একজন অফিসার ও ২৫ জন সেনা নিয়ে আমাদের অ্যামবুশের ফাঁদে পড়ে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ২৭ মে মন্দভাগ থেকে একটি প্লাটুন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কুট্টি-শালদা নদীর সিঅ্যান্ডবি রাস্তার ওপর পাকিস্তানিদের অ্যামবুশ করে। এই অ্যামবুশের ফলে পাকিস্তানি সেনাদের নয়জন নিহত হয় এবং একটি জিপ ও একটি ডজ গাড়ি [মালবাহী ট্রাক] ধ্বংস হয়ে যায়। পাকিস্তানিরা তাদের সেনাদের মৃতদেহগুলো রেখেই পালিয়ে যায়। আমাদের টহলদল দুজন পাকিস্তানি সেনাকে জীবিত অবস্থায় ধরতে সক্ষম হয়। মে মাসের মাঝামাঝি ফেনী ও লাকসামের মাঝে রেলসেতু উড়িয়ে দেওয়া হয়। রেলসেতুর ওপর পাকিস্তানি ১০ সেনা পাহারারত ছিল। তারাও এ সময় নিহত হয়।

২৬ মে ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী দল কসবার উত্তরে ইমামবাড়ীর কাছে ১৫০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে একটি রেলসেতু ধ্বংস করে। এরপর এই দলটি পাকিস্তানিদের জন্য অ্যামবুশ করে বসে থাকে। পাকিস্তানিরা সেতুর দিকে অগ্রসর হয়। শব্দ শুনে আমাদের দল তৈরি হয়। সেতু পর্যন্ত পৌছার আগেই পাকিস্তানি সেনারা অ্যামবুশের ভয়ে সেখান থেকে ফেরত চলে যায়। ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন পরে তার দলকে নিয়ে কর্নেল বাজারে শত্রু-অবস্থানের ওপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের সময় ৭৫এমএম আরআর-এর সাহায্যে পাকিস্তানি সেনাদের কয়েকটি বাংকার ধ্বংস করে দেওয়া হয়, পাশাপাশি ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যেও গোলা ছোড়া হয়। এতে পাকিস্তানিদের আট সেনা নিহত হয় এবং কয়েকটি বাংকার ধ্বংস হয়ে যায়।

আমরা আমাদের আখাউড়া অবস্থান ত্যাগ করার পর আমি আমার দলকে আখাউড়ার উত্তরে আজমপুর গ্রামে সিঙ্গারবিলে পজিশন নেওয়ার নির্দেশ দিই। লেফটেন্যান্ট হারুনের নেতৃত্বে একটি ইপিআর কোম্পানি এবং চতুর্থ বেঙ্গলের একটি প্লাটুন আজমপুর রেলওয়ে কলোনির পেছনে মাধবপুর সড়ক ও রেললাইনের ওপর প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করে। এ জায়গাটা ছিল একটু উঁচু এবং এর ডান দিকে তিতাস নদী থাকায় অবস্থানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাকিস্তানি সেনারা প্রথমে বুঝতে পারেনি যে আমরা এ জায়গাতে প্রতিরক্ষাগত অবস্থান নিয়েছি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আখাউড়া দখল করার

পর ভেবেছিল, এবার তারা সিলেট-আখাউড়া লাইনে ট্রেন যোগাযোগ আবার চালু করবে। এ জন্য সিলেটের দিক থেকে একটি লাইট ইঞ্জিন এবং কয়েকটি বগিসহ একটি ট্রেন মাধবপুর থেকে দক্ষিণে পাঠায়। সিঙ্গারবিল স্টেশনের কিছু উত্তরে পুলের কাছে লেফটেন্যান্ট হারুন কয়েকটি অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন রেললাইনের নিচে আগেই পুঁতে রেখেছিল। ট্রেনটি লাইনের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় মাইনের বিস্ফোরণে লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কিছু সেনা ও রেলের লোকজন ক্রেন নিয়ে আসে ট্রেনটি তোলার জন্য। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের এই দল লেফটেন্যান্ট হারুনের পূর্বপরিকল্পিত অ্যামবুশে পড়ে যায়। এতে প্রায় ২০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় এবং বেঁচে থাকা সেনারা রেলের লোকজনসহ সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এর কিছুদিন পর লেফটেন্যান্ট হারুন সিঙ্গারবিল রেলসেতু ১৪০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেতুটি মেরামত করার জন্য রেলের লোকজন ও সরঞ্জামাদি সিঙ্গারবিল রেলস্টেশনে জমা করে। এরপর সেসব সরঞ্জাম তারা রেলসেতুটির কাছে নিজেদের তত্ত্বাবধানে ও পাহারায় আনে। লেফটেন্যান্ট হারুনের অধীন মর্টার প্লাটুনের সুবেদার শামসুল হক এ সময়েরই অপেক্ষায় ছিল। পাকিস্তানি বাহিনী কয়েক দিন পর সকালে যখন তাদের সেতু মেরামতের কাজ আরম্ভ করেছে, ঠিক সে সময় সুবেদার শামসুল হকের মর্টার দল তাদের লক্ষ্য করে গোলা ছুড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে লেফটেন্যান্ট হারুনও তার সেনাদের দিয়ে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি বাহিনী এ আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে তাদের সব সরঞ্জাম ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে সিলেট-চট্টগ্রাম রেললাইন তাদের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এই সংঘর্ষে পাকিস্তানি বাহিনীর ১০ জন নিহত হয়।

কিছুদিন পর পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের আজমপুর পজিশনের ওপর আবার কামান দিয়ে গোলা বর্ষণ শুরু করে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে আমাদের আজমপুরের অবস্থানটি দখল করতে না পারলে সিলেট-ঢাকা রেললাইন তারা কখনো সচল করতে পারবে না।

২৯ মে পাকিস্তানিরা কিছু ফাইটিং টহল আজমপুর পজিশনের পশ্চিমে তিতাস নদী বরাবর পাঠায় আমাদের পজিশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এসব পাকিস্তানি দল আমাদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। আমরাও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আখাউড়া অবস্থানে ছোট ছোট দল পাঠিয়ে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখি। আমরা জানতে পারি যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া

থেকে ট্রলি বা লাইট ইঞ্জিনের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের রসদ ও সরঞ্জাম আখাউড়ায় পাঠায়। এ খবর জানতে পেরে আমাদের একটি দল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুই মাইল দক্ষিণে রেললাইনের নিচে মাইন পুঁতে দেয়, কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় দালালদের সহায়তায় এসব মাইন সম্পর্কে জানতে পারে এবং সেগুলো উড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানি বাহিনী এ সময় রেললাইনের নিকটবর্তী গ্রামের লোকদের এ কথা বলে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয় যে কোনো গ্রামের কাছে মুক্তিবাহিনী যদি তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করে, তাহলে সেই গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হবে। এ ঘোষণার পর প্রতিদিন রাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকে লোকজন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে রেললাইন ও সড়ক পাহারা দিত। এর ফলে আমাদের পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধির ওপর বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

আরও অনেক জায়গাতে আমরা এ ধরনের বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হই। আমাদের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য যেসব জায়গা আমাদের লক্ষ্যস্থল ছিল, সেখানে আমার সেনাদলগুলোকে সান্ধ্য আইন (কারফিউ) জারি করার নির্দেশ দিই এবং এই নির্দেশ বহুলাংশে সফল হয়। পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করার কোনো ইচ্ছা গ্রামবাসীর না থাকলেও তারা পাকিস্তানি সেনাদের ভয়ে এসব বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করত। আমাদের তরফ থেকে সান্ধ্য আইন ঘোষণায় অনেক ফল হয়। গ্রামবাসী আর বাধার সৃষ্টি করেনি। এরপর আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউড়ার মাঝ বরাবর দুটি রেলসেতু উড়িয়ে দিই। এর ফলে আখাউড়ায় পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এরপর তারা আখাউড়ায় হেলিকপ্টারের সাহায্যে রসদ সরবরাহ করতে বাধ্য হয়।

পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের আজমপুর পজিশনের ওপর তাদের চাপ বাড়াতে থাকে। তাদের দুটি কোম্পানি একদিন সকালে আজমপুরের আধা মাইল দক্ষিণে দরগার কাছে আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ সকাল ছয়টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চলে। আমাদের সেনারাও আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রায় ৩০ জন শত্রুসেনা হতাহতের পর তারা আক্রমণ বন্ধ করে দিয়ে আবার পশ্চাদপসরণ করে।

এর বেশ কিছুদিন পর জুন মাসে পাকিস্তানি সেনারা আবার মাধবপুরের রাস্তা ও রেললাইনের ওপর আমাদের পজিশনের দিকে অগ্রসর হয়। এবার তাদের ১২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স [এফএফ] আমাদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। আমাদের অগ্রবর্তী দরগা পজিশন থেকে এই আক্রমণকে প্রতিহত

করা হয়। ১২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স কয়েকবার আক্রমণ করে। কিন্তু প্রতিবারই তারা বিফল হয়। জুন মাসের শেষের দিকে তাদের আক্রমণ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি বাহিনী আখাউড়ায় ১২০ এমএম ভারী মর্টার এবং ১০৫ এমএম নিয়ে আসে। এসব কামানের গোলার আঘাত এবং ১২ কামান ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের প্রবল চাপে আমাদের অগ্রবর্তী পজিশন সংকটময় হয়ে ওঠে। এর পর আমরা আমাদের পজিশন ত্যাগ করতে বাধ্য হই। তবে কয়েক দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানিদের অন্তত ৫০ জন হতাহত হয়।

এর কিছু দিন পর জুলাই মাসে পাকিস্তানি বাহিনী আবার আজমপুরের দিকে মূল অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। এবারও তারা মাধবপুরের সড়ক ও রেললাইনের ওপর ১২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং মিলিশিয়াসহ আক্রমণ চালায়। আক্রমণের আগে তারা প্রচণ্ড গোলাগুলি করতে থাকে। আমরা এই আক্রমণের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে যখন পাকিস্তানি সেনারা সারিবদ্ধভাবে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আমাদের মর্টার ও মেশিনগান তাদের ১০০/১২০ জনের মতো সেনাকে হতাহত করে। তারা আমাদের অবস্থানের কোনো কোনো জায়গায় ঢুকে পড়ে কিন্তু পাল্টা আক্রমণ করে আমরা পাকিস্তানি সেনাদের হটিয়ে দিই। এই সংঘর্ষ প্রায় দুই দিন ধরে চলে। আমরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, যেকোনোভাবেই হোক আমরা আমাদের ঘাঁটি ছাড়ব না। প্রতিদিনই যথেষ্ট সংখ্যক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হলেও আমাদের এই অবস্থান দখল করার লক্ষ্যে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এই অবস্থায় আমাদের সেনারাও তাদের আত্মবিশ্বাস হারায়নি। অবস্থানটি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের আগরতলা বিমানবন্দরের বেশ কাছেই ছিল। ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর কামানের গোলার স্প্লিন্টার মাঝে মাঝে বিমানবন্দরে গিয়ে পড়ত। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র আমাদের এ অবস্থান থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আপত্তি করে। তাদের বিমানবন্দরের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় এ আপত্তি করা হয়। আমরা নিরুপায় হয়ে দেড় মাস যুদ্ধ চালানোর পর আজমপুর অবস্থান ত্যাগ করে সিঙ্গারবিলে নতুন অবস্থান গড়ে তুলি।

পাকিস্তানি বাহিনী এরপর মাধবপুর থেকে অগ্রসর হয়ে কমলছড়ি চা-বাগান দখল করে নেয়। এ চা-বাগানে তারা মিলিশিয়ার এক কোম্পানি এবং নিয়মিত বাহিনীর প্লাটুনসহ একটি শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে। লেফটেন্যান্ট হারুন বুঝতে পারে যে পাকিস্তানি সেনারা আখাউড়া (দক্ষিণ থেকে) এবং মাধবপুর থেকে (উত্তর থেকে) কমলছড়ি হয়ে তার সিঙ্গারবিল পজিশনকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা করেছে। লেফটেন্যান্ট হারুন পাকিস্তানি

বাহিনীকে পৃথকভাবে উত্তর এবং দক্ষিণে আঘাত হানার পরিকল্পনা নেয়। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী কমলছড়ি চা-বাগানে প্রথম আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। জুলাই মাসে কমলছড়িসহ অন্যান্য চা-বাগানে পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটি সম্পর্কে সে বিস্তারিত খবরাখবর জোগাড় করে। একদিন রাত তিনটার সময় চতুর্থ বেঙ্গলের একটি প্লাটুন এবং ইপিআরের একটি কোম্পানি নিয়ে গোপন পথে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কমলছড়ি পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থানের ভেতর সাহসের সঙ্গে ঢুকে পড়ে। হঠাৎ এই গোপন আক্রমণ পাকিস্তানি সেনাদলকে হতভম্ব করে দেয়। তাদের কিছু বুঝে ওঠা বা বাধা দেওয়ার আগেই লেফটেন্যান্ট হারুনের দল পাকিস্তানি বাহিনীর অন্তত ছয়টি বাংকার গ্রেনেডের সাহায্যে ধ্বংস করে দেয়। এরপর সারা রাত পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই চলতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা হঠাৎ এ আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে হকচকিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। সে জন্য পরবর্তী পর্যায়ে যখন লেফটেন্যান্ট হারুনের ছোট ছোট দল চা-বাগানের সরু ও গোপন রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়ে একটির পর একটি বাংকার ধ্বংস করে যাচ্ছিল, তখন উপায়ান্তর না দেখে পাকিস্তানি সেনারা মনোবল হারিয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করে এবং এতে তাদের বেশ কিছু সদস্য গুলিতে নিহত হয়। সকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সম্পূর্ণ কমলছড়ি চা-বাগানটি লেফটেন্যান্ট হারুনের দখলে এসে যায়। এ যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানিদের ৫০ জন নিহত হয় এবং চারটি মেশিনগান, ছয়টি হালকা মেশিনগান, বেশ কিছু রাইফেল, অজস্র গোলাগুলি এবং প্রচুর রসদ ও কাপড়চোপড় আমাদের হস্তগত হয়।

ক্যাপ্টেন গাফফার ও ক্যাপ্টেন সালেকের [আবদুস সালেক চৌধুরী বীর উত্তম। পরে মেজর। ১৯৭২ সালে এক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন] নেতৃত্বে মুক্তিসেনারা মন্দভাগ ও শালদা নদীতে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর অনবরত আঘাত হেনে চলেছিল। ২৬ মে রাত নয়টায় সুবেদার ভূঁইয়ার নেতৃত্বে দুটি সেকশন রকেট লঞ্চার নিয়ে শত্রুর শালদা নদীর পজিশনের ভেতর ঢুকে যায়। এরপর শত্রুদের দুটি বাংকার তারা রকেট লঞ্চারের সাহায্যে ধ্বংস করে দেয়। শত্রুরা তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালালে টহলদল হালকা মেশিনগানের সাহায্যে শত্রুসেনাদের বেশ কিছু লোককে হত্যা করে এবং তারা পিছু হটে আসে। পরে জানা যায় যে এই আকস্মিক হামলায় শত্রুদের একজন জেসিও এবং নয়জন সেনা মারা যায়। ২৮ মে রাতে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডোরা কুমিল্লার কাছে কালিকাপুর রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। এ দিনই সকালে পাকিস্তানি সেনারা

কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের কাছে রঘুরামপুরে একটি কোম্পানি নিয়ে আসে। এই কোম্পানিকে আমাদের সেনাদল সকাল সাড়ে ছটার সময় অতর্কিতে অ্যামবুশ করে। অ্যামবুশে পাকিস্তানি সেনাদের অন্তত একজন অফিসারসহ ৩৫ জন হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা এতে মরিয়া হয়ে ভবনগর, শালুকমুড়া, খাড়েরা, ফকিরাবাজার প্রভৃতি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। এ ছাড়াও শত্রুসেনারা ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং ভারী আর্টিলারির সাহায্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর ওপর প্রচণ্ড গোলা ছুড়তে থাকে।

২৮ মে নায়েক গিয়াসুদ্দিন আহমদের [গিয়াস উদ্দিন আহাম্মদ বীর প্রতীক, মুক্তিযুদ্ধের সময় হাবিলদার। স্বাধীনতার পর অফিসার্স শর্ট কোর্সে যোগ দেন। পরে মেজর] নেতৃত্বে আরেকটি টহলদল মনোহরপুর গ্রামে শত্রুদের জন্য একটি অ্যামবুশ পেতে থাকে। পাকিস্তানি সেনাদের একটি কোম্পানি জঙ্গলবাড়ীর দিকে যাচ্ছিল কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাস্তা দিয়ে। সকাল সাড়ে আটটায় পাকিস্তানি সেনাদের কোম্পানিটি নায়েক গিয়াস উদ্দিনের অ্যামবুশের ফাঁদে পড়ে এবং তাদের ২৫ জনের মতো হতাহত হয়। শত্রুসেনারা পিছু হটে এসে আবার কামানের গোলার সাহায্যে আক্রমণের চেষ্টা চালায়। তখন আমাদের অ্যামবুশ দল তাদের অবস্থান ত্যাগ করে। শত্রুরা পার্শ্ববর্তী মাগুরা, মনোহরপুর প্রভৃতি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কামানের সাহায্যে গোলা ছুড়তে থাকে।

শালদা নদীর পাকিস্তানি অবস্থানটির ওপর আমাদের চাপ আরও বাড়াতে থাকি। ২৫ মে আমাদের আরেকটি ছোট দল অতর্কিতে হামলা চালায়। এতে পাকিস্তানি সেনাদের একজন জেসিও ও পাঁচজন সেনা নিহত হয়। তাদের দুটি মর্টারও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ২৭ মে পাকিস্তানি সেনারা কুটি থেকে সিঅ্যান্ডবি রাস্তায় শালদা নদীতে আরও সেনা আনার চেষ্টা করে। সকাল সাতটায় মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের দলটিকে অ্যামবুশ করে। অ্যামবুশের ফলে একটি জিপ, একটি ডজ ধ্বংস এবং শত্রুদের নয়জন নিহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা সামনে অগ্রসর হতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়।

২৮ মে সকাল ছয়টায় পাকিস্তানিদের কুমিল্লার দক্ষিণে রাজারমার দীঘির একটি বাংকারে আমাদের দুজন সেনা গোপনে গিয়ে গ্রেনেড ছোড়ে। এতে চার পাকিস্তানি নিহত হয়। আমাদের সেনারা তাদের রাইফেলগুলো দখল করে নিয়ে আসে। ওই দিনই সকাল নয়টায় লাকসাম-কুমিল্লা রেললাইনের ওপর আলীশ্বরের কাছে মাইন পুঁতে একটি রেল ইঞ্জিন ও দুটি বগি লাইনচ্যুত করে। ২৬ মে জগন্নাথদীঘিতে পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-

জামানের প্লাটুন রাত ১১টার সময় অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে একটি প্লাটুন, দুটি ৩ ইঞ্চি মর্টার ও দুটি মিডিয়াম মেশিনগান ব্যবহার করা হয়। আক্রমণে শত্রুদের ১৯ জন হতাহত হয়। আমাদের একটি টহলদল ২৬ মে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা সড়কের ওপর উজানিসারে পাঠানো হয়। আমাদের দলের সঙ্গে কমান্ডো শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু সেনাও ছিল। কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া—এ দুই জায়গাতেই পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাস্তা তাদের গতিবিধির জন্য বিশেষ জরুরি ছিল। উজানিসার সেতু ধ্বংস করে পাকিস্তানি সেনাদের গতিবিধিকে ব্যাহত করা ছিল আমাদের লক্ষ্য। আমার দল রাত ১১টায় উজানিসার সেতুতে অতর্কিতে হামলা চালায় এবং সফলতার সঙ্গে বিস্ফোরক লাগিয়ে একটি স্প্যান ধ্বংস করে দেয়। এ হামলায় পাকিস্তানিদের ১৩ জন নিহত এবং ছয়জন আহত হয়।

ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে চতুর্থ বেঙ্গলের 'চার্লি' কোম্পানি ২৯ মে শালদা নদীর পেছনে পশ্চিমে শিবপুর, বাজরা ও সাগরতলায় শত্রুদের অবস্থানের পেছনে ভোর চারটায় মেশিনগান ও ৭৫ এমএম আরআরসহ ঢুকে পড়ে। পাকিস্তানিরা তাদের পেছনে মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত অনুপ্রবেশে বেশ হকচকিয়ে যায়। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আমাদের দল পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর তীব্র আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে শত্রুদের বেশ কয়েকটি বাংকার ধ্বংস হয় এবং তাদের প্রায় ২৭ জন লোক হতাহত হয়। পরে আমরা জানতে পারি, এ আক্রমণে ৩১ বালুচের মেজর দুররানিও নিহত হয়।

৩১ মে আমাদের একটি টহলদল কুটির কাছে শত্রুসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে যায়। কুট্টির কাছে তারা দেখতে পায় যে পাকিস্তানিদের একটি জিপ ছয়জন সেনাসহ কুট্টি গ্রামে ঢুকছে। জিপটি গ্রামের পাশে এসে দাঁড়ায়। ছয়জন পাকিস্তানি সেনা জিপ থেকে বের হয়ে গ্রামের ভেতরে যায়। আমাদের দলটি বোমা ছুড়ে ড্রাইভারসহ জিপটি ধ্বংস করে দেয়।

৩১ মে-তেই আমাদের ছয়জন সেনার একটি দল সুবেদার আবদুল হক ভূঁইয়ার নেতৃত্বে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনের কাছে অনুপ্রবেশ করে। তারা যখন তথ্যানুসন্ধান করছিল, সে সময় পাকিস্তানি সেনাদের দুজন ওপি, যারা গাছের ওপর বসে দুরবিন লাগিয়ে আমাদের অবস্থান খুঁজছিল, তাদের দেখে ফেলে এবং গুলি করে তাদের হত্যা করে।

চতুর্থ বেঙ্গলের আলফা কোম্পানি ক্যাপ্টেন সালেকের নেতৃত্বে এবং চার্লি কোম্পানি ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে শালদা নদী ও মন্দভাগে পাকিস্তানি

সেনাদের ওপর বারবার আঘাত হেনে যাচ্ছিল। শত্রুদের কেউ-না-কেউ প্রতিদিনই হতাহত হচ্ছিল। আমাদের এ দুই কোম্পানির সেনাদল ৩ ইঞ্চি মর্টার নিয়ে শিবপুর, বাগরা, গৌরঙ্গলা প্রভৃতি জায়গার শত্রু-অবস্থানটি প্রায় তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল এবং প্রতিদিনই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। অবস্থা এমনই সঙিন হয়ে গিয়েছিল যে পাকিস্তানি সেনাদের পক্ষে তাদের বাংকার থেকে মাথা তোলারও সুযোগ ছিল না। গুলি ও মর্টারের গোলার সাহায্যে আমাদের সেনারা তাদের সেই অবস্থানে থাকাটাকে সম্পূর্ণ বিপজ্জনক করে তুলেছিল। এ ছাড়া কুট্টি ও শালদা নদীর রাস্তায় আমাদের অ্যামবুশ দল ২৪ ঘণ্টা অ্যামবুশ পেতে থাকত। ফলে রসদ ও অস্ত্র সরবরাহ করা তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা রেললাইন ব্যবহারের জন্য বারবার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে। এরপর শালদা নদী দিয়ে রসদ সরবরাহ করার চেষ্টা করে তারা। সেখানেও তারা আমাদের আক্রমণের শিকার হয় এবং যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় তাদের মনোবল সত্যিই ভেঙে পড়েছিল।

১ জুন আমাদের চাপের মুখে টিকতে না পেরে পাকিস্তানিরা মন্দভাগ ও শালদা নদীর অবস্থানগুলো ত্যাগ করে নয়নপুর রেলস্টেশনের কাছে তাদের নতুন ঘাঁটি স্থাপন করে। সম্মুখসমরে শালদা নদী থেকে পাকিস্তানি সেনাদের জুন মাসের প্রথম দিকে পর্যুদস্ত করে পিছু হটিয়ে দেওয়া আমাদের সেনাদের জন্য ছিল একটি বিরাট সাফল্য ও কৃতিত্ব। এতে আমাদের সেক্টরের সেনাদের মনোবল ফিরে আসে। মার্চ ও মে মাসের প্রথম দিকে যখন পাকিস্তানি বাহিনী বিপুল সেনা, কামান এবং বিমানবাহিনীর সহায়তায় আমাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়, তখন আমাদের সেনারা সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি করে। কিন্তু ব্যাপকভাবে অস্ত্রসজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের মুখে আমাদের বাহিনী শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে হয় বাধ্য হয়। সব ক্ষেত্রেই আমরা প্রতিরক্ষা-অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করেছি এবং পাকিস্তানি বাহিনী বারবার আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। শালদা নদী ও মন্দভাগে এক মাস পর আমরা পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে তাদের শক্তিশালী অবস্থান থেকে তাদের বিতাড়িত করি। পাকিস্তানি সেনারা চলে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন গাফফারকে মন্দভাগে প্রধান অবস্থান গড়ে তোলার এবং শালদা নদীতে তার অগ্রবর্তী ঘাঁটি করার নির্দেশ দিই।

আমি যখন যুদ্ধ চালাচ্ছিলাম এবং যুদ্ধ যখন আস্তে আস্তে তীব্রতর হচ্ছিল, তখন আমার সেনাদলে আহত ও নিহতের সংখ্যাও বেড়ে চলছিল। সে সময়

আমার সেনা ও গণবাহিনীর জন্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল না; শুধু আমার সঙ্গে ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন চিকিৎসক ক্যাপ্টেন আখতার [আখতার আহমেদ বীর প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধকালে লেফটেন্যান্ট, পরে মেজর]। অফিসারের স্বল্পতায় তাঁকেও আমি একটি কোম্পানির কমান্ডার বানিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করেছিলাম এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন আখতার চিকিৎসক হয়েও একজন যোদ্ধা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। আমার দলে আহতের সংখ্যা যখন বেশ বেড়ে যায় এবং দ্রুত চিকিৎসার অভাবে অনেক সেনা বা গণবাহিনীর ছেলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে প্রায়শ মারা যেতে থাকে, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার সেক্টরেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য ক্যাপ্টেন আখতারকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ডেকে পাঠাই এবং অতিসত্বর আমার হেডকোয়ার্টারসের কাছে একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করার নির্দেশ দিই। ঢাকা থেকে কিছুসংখ্যক ছেলেমেয়ে আমার সেক্টরে এসে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে দু-একজন চিকিৎসা-শিক্ষানবিশও ছিল। তারাও আমাকে একটি হাসপাতাল গড়ার জন্য অনুরোধ জানায়। এসব ছেলেমেয়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন আখতার কয়েকটি তাঁবুতে মতিনগরে আমার হেডকোয়ার্টারসের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রথম বাংলাদেশ হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন। এ হাসপাতালটির অবস্থান ছিল সুন্দর একটি বাগানের ভেতরে উঁচু ও শান্ত পরিবেশে। প্রথমে হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য আমাদের



২ নম্বর সেক্টরের বাংলাদেশ হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবাকর্মীদের সঙ্গে কর্নেল ওসমানী ও মেজর খালেদ ছবি: *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস* থেকে

কাছে ওষুধপত্র বা অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম কিছুই ছিল না। তবু আমাদের এই নবীন দলটি ক্যাপ্টেন আখতারের নেতৃত্বে সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ধীরে ধীরে হাসপাতালটি গড়ে তুলতে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেগম সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে টুলু [সুলতানা কামাল] ও লুলু [সাইদা কামাল], মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ডালিয়া, আসমা [আসমা আলম], রেশমা [রেসমা আলম], ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম [ডা. সিতারা বেগম বীর প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধকালে লেফটেন্যান্ট], সবিতা, শামসুদ্দিন প্রমুখ। এ দলের সদস্যরা নিজেদের সুখ ও আরাম বিসর্জন দিয়ে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সেনাদের এবং গণবাহিনীর ছেলেদের সেবাশুশ্রূষা করে যাচ্ছিল। এরা রেডক্রস ও বন্ধুরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনেক কষ্টে ওষুধপত্র জোগাড় করত। মাঝে মাঝে আমি যৎসামান্য টাকাপয়সা সেক্টর ফান্ড থেকে দিতে পারতাম, তা দিয়ে ওষুধপত্র জোগাড় করা হতো।

জুন মাসের দিকে লন্ডন থেকে ডা. এম এ মবিন আমাদের এই হাসপাতালের কথা শুনে এখানে এসে যোগ দেন। এর কিছুদিন পর ডা. মবিনের আরেক বন্ধু ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী সংবাদ পেয়ে লন্ডন থেকে এসে যোগ দেন। তাঁরা দুজনেই লন্ডনে এফআরসিএস পড়ছিলেন। দেশে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ শুনে তাঁরাও এতে অংশ নেওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা লন্ডনের আয়েশি জীবন ত্যাগ করে আমাদের এই হাসপাতালে ছুটে এসেছিলেন মাতৃভূমিকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য। তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিস্তারিত আলাপ হয় এবং আমরা হাসপাতালটি গড়ে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা নিই। ডা. মবিন ও ডা. জাফরউল্লাহ আমাকে আশ্বাস দেন, লন্ডনে অবস্থিত প্রবাসী বাঙালিরা তাদের মাতৃভূমির জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত এবং আমরা যদি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আবেদন জানাই, তাহলে এ হাসপাতালে সরঞ্জামের ব্যবস্থা তারা করতে পারবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি ডা. মবিন ও ডা. জাফরউল্লাহকে বিস্তারিত সরঞ্জামের তালিকা বানানোর নির্দেশ দিই। সেই সঙ্গে ক্যাপ্টেন আখতারকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আরেকটু পেছনে বিশ্রামগঞ্জে সুন্দর জায়গায় পাহাড়ের ওপর অস্থায়ী হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা করার নির্দেশ দিই। আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাদের প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাঁকে আমি আমার সেনাদল ও ছেলেদের চিকিৎসার শোচনীয় অবস্থার কথা জানাই। তিনি আমাকে আমার হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনায় উৎসাহ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। এক

মাসের মধ্যে বাঁশ, কাঠ ও শণ দিয়ে আমরা বিশ্রামগঞ্জে ২০০ শয্যার হাসপাতাল তৈরি করে ফেলি। ডা. জাফরউল্লাহ লন্ডনে চলে যান হাসপাতালের জন্য ওষুধপত্র ও অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করতে। আমাদের হাসপাতাল যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন আহতের সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলেছিল। চিকিৎসকের যথেষ্ট অভাব ছিল। এ ছাড়া ওষুধের অভাবও ছিল আমাদের প্রকট। তবু, এসব অসুবিধার মধ্যেও আমাদের ছোট হাসপাতালটি আস্তে আস্তে বেশ পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে লাগল। এগুলো বাঁশ ও শণের ঘর হলেও উৎসর্গিত ছেলেমেয়েদের প্রচেষ্টায় এলাকাটা স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠেছিল। সকালে উঠেই হাসপাতালের বিভিন্ন কাঁচা ওয়ার্ড তারা নিজেদের হাতে লেপত এবং পরিষ্কার করত। হাসপাতালের রোগীদের কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে তাদের রান্নাবান্না, সেবা-শুশ্রূষা সবকিছু এরাই করত। এদের সঙ্গে আরও ২০ জনের মতো ছেলেমেয়ে এসে যোগ দেয়। কিছুদিন পর ডা. জাফরউল্লাহ ও ডা. মবিনের প্রচেষ্টায় এবং লন্ডন-প্রবাসী বাঙালি চিকিৎসকদের সহায়তায় আমরা এই হাসপাতালের জন্য অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামসহ ওষুধপত্র প্রভৃতি পেয়ে যাই। নয় মাসের যুদ্ধে এ হাসপাতাল কয়েক হাজার আহত যোদ্ধাকে চিকিৎসা দিতে ও অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম হয়। এ হাসপাতালের আরেকটি অবদান ছিল, এটি স্থাপনের পর আমার সেনাবাহিনীর ছেলেদের ও গণবাহিনীর মনোবল আরও বেড়ে যায়। তারা বুঝতে পারে, যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তারা আহত হয়, তাহলে চিকিৎসার অভাবে তারা অন্তত মারা যাবে না। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন এবং এটাকে আরও উন্নত করার জন্য উৎসাহ দেন। সেপ্টেম্বর মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন এবং এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

২৯ মে রাতে আমাদের একটি টহলদল কুমিল্লার ভাটপাড়ায় অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। শত্রুদের দুটি গাড়ি রাত দুইটার সময় অ্যামবুশে পড়ে। অ্যামবুশ দল সাফল্যের সঙ্গে গাড়ি দুটি ধ্বংস করে। এতে চারজন শত্রুসেনা নিহত হয়। শত্রুদের পেছনের গাড়িটি ফাঁদে পড়ার আগেই পালিয়ে যায়। ২৯ মে রাত নয়টায় ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনের নেতৃত্বে দুটি সেকশন কসবার পশ্চিমে টি আলীর বাড়িতে থাকা শত্রুদের অবস্থানের বৃত্তে হঠাৎ ঢুকে পড়ে এবং আক্রমণ চালায়। এই সঙ্গে মর্টারের সাহায্যে আড়াইবাড়ী শত্রু-অবস্থানের ভেতরে গোলা চালায়। এ আক্রমণে শত্রুদের একটি বাংকার ধ্বংস

হয়ে যায় এবং তিনজন নিহত ও দুজন শত্রুসেনা আহত হয়। আমাদের সেনারা আক্রমণ শেষ করে নিজ অবস্থানে চলে আসে।

৩১ মে রাত তিনটায় একটি প্লাটুন লেফটেন্যান্ট মেহবুবের নেতৃত্বে কুমিল্লার দক্ষিণে জগমোহনপুরে শত্রুঘাঁটির ওপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায় এবং শত্রুসেনাদের ১২ জন হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা যখন কসবার দিকে তাদের চাপ বাড়াতে থাকে, আমি ক্যাডেট [লেফটেন্যান্ট] হুমায়ুন কবিরকে একটি কোম্পানিসহ কসবার উত্তরে লাতুমুড়ায় অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিই।

৩০ মে সন্ধ্যা সাতটায় আমাদের একটি ছোট গেরিলাদল ইকবালের (বাচ্চু) নেতৃত্বে বিবিরবাজারে শত্রুসেনাদের অবস্থানে আঘাত হানার জন্য পাঠানো হয়। পাকিস্তানি সেনারা তখন তাদের অবস্থানে সান্ধ্য ভোজনে ব্যস্ত ছিল এবং সময়টি সম্পর্কে আমাদের স্থানীয় লোকের মাধ্যমে খবর আগে থেকেই সংগ্রহ করা হয়ে ছিল। পাকিস্তানি সেনারা যখন খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল, সে সময় আমাদের গেরিলাদল তাদের ওপর হঠাৎ গোমতী বাঁধের ওপর থেকে গোলা বর্ষণ করে। এতে শত্রুদের ১০ জন হতাহত হয়। ওই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় আমাদের মর্টার প্লাটুন সিঙ্গারবিল শত্রু-অবস্থানের ওপর গোলা বর্ষণ করে। ফলে শত্রুদের ছয়জন নিহত এবং সাতজন আহত হয়। ২৯ মে চৌদ্দগ্রাম বাবুর্চি রোডে হরিসর্দার বাজারের নিকটবর্তী রাস্তার সেতু সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

২৯ মে বিকেল চারটায় চতুর্থ বেঙ্গলের পাইওনিয়ার দলকে লাকসাম-চাঁদপুর রেললাইনে মাইন পুঁতে রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করার জন্য পাঠানো হয়। দলটি মাইন পুঁতে লাকসাম ও নোয়াখালীর মাঝে ইঞ্জিনসহ তিনটি রেল বগি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়। ফেরার পথে পাইওনিয়ার দলের ছোট দলটি চৌদ্দগ্রাম-চট্টগ্রাম সড়কের ওপর একটি সদ্য মেরামত করা সেতুর ওপর মাইন পুঁতে রাখে। রাত আটটায় একটি জিপ পাঁচজন পাকিস্তানি সেনাসহ ফেনীর দিক থেকে আসে। জিপটি যখন সেতুর ওপর পৌঁছায়, তখন মাইন বিস্ফোরিত হলে সেতুটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ফলে একজন অফিসারসহ তিনজন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং অন্য দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়। ওই দিনই সন্ধ্যায় তিনজন গেরিলাকে হ্যান্ড গ্রেনেডসহ চৌদ্দগ্রাম থানায় পাঠানো হয়। থানার সন্নিকটে দিঘির কাছে শত্রুদের একটি বাংকার ছিল। গেরিলাদলটি গ্রেনেড ছুড়ে বাংকারটি ধ্বংস করে দেয়। ফলে তিনজন শত্রুসেনা নিহত হয় এবং স্থানীয় কিছু লোকও আহত হয়। ৩০ মে

চৌদ্দগ্রামের আধা মাইল উত্তরে চৌদ্দগ্রাম-মিয়াবাজার রোডের ওপর চতুর্থ বেঙ্গলের 'ব্রাভো' কোম্পানির একটি প্লাটুন হঠাৎ শত্রুদের ২৭ জনের একটি দলকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি অ্যামবুশ পাতে। শত্রুরা এই অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে গেলেও তারা ত্বরিত গতিতে রাস্তার পশ্চিম পাশে সরে পড়ে। অ্যামবুশের ফলে শুধু তিনজন শত্রুসেনা নিহত হয়। আমাদের গেরিলারা লাকসাম-বাঙ্গড়া কাঁচা রাস্তার ওপর ফেলনা গ্রামের কাছে মাইন পুঁতে রাখে। শত্রুদের একটি তিন-টনি ট্রাক গাড়ি মাইনের বিস্ফোরণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। ২৯ মে চতুর্থ বেঙ্গলের ব্রাভো কোম্পানির একটি প্লাটুন দুটি ৩ ইঞ্চি মর্টারসহ সন্ধ্যায় চৌদ্দগ্রাম থানার ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। মর্টারের গোলা ও হালকা মেশিনগানের আঘাতে তাদের বেশকিছু সেনা হতাহত হয়।

জুনের ৪ তারিখে রাত দুইটায় চতুর্থ বেঙ্গলের 'আলফা' কোম্পানির দুটি প্লাটুন মর্টার নিয়ে শত্রুদের অবস্থানে গোপন পথে ঢুকে শালদা নদীর দক্ষিণে বাগড়াবাজারে কিছু সেনা অবস্থান নেয়। ভোরবেলায় পাকিস্তানি সেনারা যখন তাদের বাংকারের ওপর অসতর্কভাবে ঘোরাফেরা করছিল, ঠিক সে সময় আমাদের সেনারা তাদের ওপর মর্টার এবং মেশিনগানের সাহায্যে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা এতে সম্পূর্ণ হকচকিয়ে যায়। আধ ঘণ্টা পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোনো পাল্টা জবাব আসে না। এ আক্রমণের ফলে শত্রুদের প্রায় ১৭ জন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়। বুকে গুলি লেগে আমাদের একজন সেনা গুরুতর আহত হয়। এ আক্রমণের পর শত্রুরা ভেবেছিল আমাদের সেনারা অবস্থান ত্যাগ করেছে এবং যখন তারা আহতদের পেছনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছিল, ঠিক সে সময় আমাদের সেনারা আবার তাদের ওপর দ্বিতীয় দফা আক্রমণ চালায়। এতে শত্রুদের আরও পাঁচজন নিহত হয়। এ ঘটনা ঘটে আগের আক্রমণের তিন ঘণ্টা পর। এরপর আমাদের দল অবস্থান ত্যাগ করে চলে আসে। ওই দিনই সকাল সাতটার সময় আমার আরেকটি দল শত্রুদের রাজাপুর অবস্থানের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালালে ছয়জন শত্রুসেনা নিহত এবং তিনজন আহত হয়। আমাদের আরেকটি দল রাত একটার সময় কুমিল্লার দক্ষিণে সুয়াগাজীতে চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কের একটি সেতু এবং বাগমারার রেলসেতু উড়িয়ে দেয়।

৬ জুন একটি ডেমোলিশন দলকে লাকসামের দক্ষিণে পাঠানো হয়। এই দল 'খিলাতে' লাকসাম-নোয়াখালী মহাসড়কের ওপর ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন পুঁতে রাখে। ভোর পাঁচটায় কুমিল্লা থেকে শত্রুর দুটি জিপ ও একটি ট্রাক

নোয়াখালীতে যাওয়ার পথে মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয় এবং সেই সঙ্গে চারজন পাকিস্তানি অফিসার ও সাতজন সেনা নিহত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের দুটি কোম্পানি কুমিল্লা থেকে শালদা নদীর উত্তরে আসে এবং রেললাইন ধরে নয়নপুর রেলস্টেশনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। চতুর্থ বেঙ্গলের 'আলফা' কোম্পানি সকাল ছয়টার সময় শালদা নদীর পূর্ব দিক থেকে শত্রুদের এই অগ্রগতিকে বাধা দেয়। শত্রুরা বাধা পেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। আমাদের গুলির মুখে পাকিস্তানি সেনাদের ২৫ জন হতাহত হয়। সকাল ছয়টায় পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি দল কুমিল্লা থেকে একটি ট্রেনে করে নয়নপুর ও শালদা নদীর দিকে আসছিল। ট্রেনটি নয়নপুর ও শিবপুরের দক্ষিণে আমাদের অবস্থানরত সেনাদের বাধার মুখে পড়ে। আমাদের গোলাগুলির সামনে শত্রুরা টিকতে না পেরে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পর রাজাপুরে পশ্চাদপসরণ করে। এর চার-পাঁচ ঘণ্টা পর শত্রুরা কামানের গোলার সহায়তায় আবার নয়নপুর পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। কিন্তু নয়নপুর স্টেশনে যখন তারা বাংকার তৈরিতে ব্যস্ত, সে সময় আমাদের মর্টার থেকে তাদের ওপর তীব্র গোলাগুলি বর্ষণ করা হয়। এতে শত্রুপক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। শত্রুরা কিছুটা পিছু হটে নয়নপুর গ্রামের ভেতর অবস্থান নিয়ে তাদের বাংকার তৈরি করতে শুরু করে। ওই দিনই শত্রুদের একটি টহলদল কসবার দিকে অগ্রসর হয়, আমাদের চতুর্থ বেঙ্গলের 'ডেলটা' কোম্পানির একটি প্লাটুন অতর্কিতে তাদের অ্যামবুশ করে। পাকিস্তানি সেনারা এই অ্যামবুশের ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের অন্ততপক্ষে ২০ জন হতাহত হয়। শত্রুদের দলটি আমাদের অ্যামবুশ দলের তাড়া খেয়ে তাদের অবস্থান আড়াইবাড়ীর দিকে পালিয়ে যায়। আমাদের একটি দল কুমিল্লার দক্ষিণে ধানপুর বিওপির কাছে পাকিস্তানি সেনাদের জন্য অ্যামবুশ পেতে থাকে। সকাল নয়টায় পাকিস্তানি সেনারা দালাল মারফত এ খবর পায়। কুমিল্লা থেকে পাকিস্তানি সেনাদের একজন অফিসারসহ একটি প্লাটুন গ্রামের ভেতর দিয়ে এসে আমাদের অ্যামবুশ দলকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। অ্যামবুশ দল তৎক্ষণাৎ কিছুটা পিছু হটে গিয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধ ঘণ্টা খানেক স্থায়ী হয়। ইতিমধ্যে আমাদের ধানপুরের কোম্পানি খবর পেয়ে লেফটেন্যান্ট মেহবুব ও লেফটেন্যান্ট কবিরের নেতৃত্বে তৎক্ষণাৎ অ্যামবুশ দলটিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে এবং তারা পাকিস্তানি সেনাদের দলকে ঘিরে ফেলে। পাকিস্তানি সেনারা দুই দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে গ্রামের ভেতরে লুকিয়ে পড়ে

এবং দালালদের সাহায্যে এ ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়। এ সংঘর্ষে পাকিস্তানি সেনাদের পাঁচজন নিহত হয়।

ওই দিনই বেলা তিনটায় পচুয়াতে আমাদের আরেকটি অ্যামবুশ দলের ফাঁদে পড়ে শত্রুদের একটি দলের ১০ জন হতাহত হয়। ৪ ও ৫ জুন রাতে লাকসাম-চাঁদপুর রেললাইনের মাঝে মধু রোডস স্টেশনের নিকটবর্তী জমজমা রেলসেতুটি সুবেদার পাটোয়ারীর একটি দল উড়িয়ে দেয়। ওই দিনই রাতে আরেকটি দল চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়কের মহামায়া বাজারের কাছে নেতৃত্বাধীন একটি পুল ধ্বংস করে দেয়। এর দুই দিন পর চাঁদপুরের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এর ফলে সারা চাঁদপুরের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। কলকারখানাগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। পরে শত্রুরা এসে পাশের গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয় ও লুটতরাজ করে এবং মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়।

আমাদের চতুর্থ বেঙ্গলের 'ডেলটা' কোম্পানির একটি প্লাটুন ১১ জুন সকাল ছয়টায় কসবার উত্তরে চারনল নামক জায়গায় অ্যামবুশ পেতে রাখে। শত্রুদের একটি কোম্পানি দুপুর ১২টার সময় আমাদের অ্যামবুশের মধ্যে পড়ে যায়। আমাদের গুলিতে তাদের ১২ জন সেনা নিহত হয়। এতে আমাদের একজন আহত হয়ে পরে মারা যায়। পাকিস্তানি সেনারা পর্যুদস্ত হয়ে ওই জায়গা থেকে ইয়াকুবপুরের দিকে পালিয়ে যায়। পালানোর পর আমাদের আরেকটি অ্যামবুশ দল শত্রুদের দেখে ফেলে এবং তারাও ইয়াকুবপুরের কাছে তাড়াতাড়ি শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য অ্যামবুশ পাতে। শত্রুরা এই অ্যামবুশে পড়ে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। এই আক্রমণাভিযানে শত্রুদের আটজন নিহত এবং ১৩ জন আহত হয়। এ দুটি অ্যামবুশের পর অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আমাদের হস্তগত হয় এবং শত্রুরা এ এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

এ সময় শালদা নদীর দক্ষিণে রেলসেতু, কুট্টির রাস্তায় 'বাসারা' গ্রামের সেতু, মন্দভাগ গ্রামের সেতু সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাদের হেডকোয়ার্টারসে এ খবর আসে যে পাকিস্তানি সেনারা তাদের যাতায়াতের জন্য সাধারণত ব্যবহার করে থাকে তলুয়াপাড়া ফেরিঘাট। এ সংবাদ পেয়ে আমাদের একটি প্লাটুনকে ৯ জুন রাতে তলুয়াপাড়াতে পাঠানো হয়। এ প্লাটুন তলুয়াপাড়া ফেরিঘাটের কাছে শত্রুদের জন্য অ্যামবুশ পাতে। ১০ জুন রাত ১১টার সময় শত্রুদের একটি দল সেই ফেরিঘাটে আসে এবং নৌকাযোগে পার হতে থাকে। শত্রুরা যখন নদীর মাঝপথে, অ্যামবুশ দলটি সে সময়

তাদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করে। ফলে নৌকাটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। এতে পাকিস্তানি সেনাদের ২০ জন হতাহত হয়।

আমাদের একটি প্লাটুন লেফটেন্যান্ট মেহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে ১০ জুন রাতে মিয়াবাজারের দক্ষিণে রাজারমার দীঘি ও জগমোহনপুর কাচারির শত্রু-অবস্থানের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা এই সাহসী আক্রমণে সম্পূর্ণরূপে হকচকিয়ে যায়। আমাদের সেনারা পাকিস্তানি সেনাদের বাংকারে গ্রেনেড ছুড়ে মারলে আটজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা বাধ্য হয়ে তাদের অবস্থান ত্যাগ করে। এরপর আমাদের সেনারা অবস্থানটি দখল করে বাংকারগুলো ধ্বংস করে দেয় এবং শত্রুদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে।

আমাদের তিনটি গেরিলাদল কুমিল্লা ও লাকসামে পাঠানো হয়। ১১ জুন কুমিল্লায় গেরিলাদলটি শত্রুদের বিভিন্ন অবস্থানের ওপর ১০টি গ্রেনেড ছোড়ে। এতে পাকিস্তানি সেনাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং সেনারা কুমিল্লা শহরে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ওই দিনই চারজন গেরিলার ডেমোলিশন দল জাঙ্গালিয়ার কাছে মাইন পুঁতে একটি ডিজেল রেল ইঞ্জিন লাইনচ্যুত করে।

লাকসামে যে গেরিলাদলটি পাঠানো হয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিল আবদুল মান্নান। গেরিলারা পাকিস্তানি সেনাদের একটি গাড়ির ওপর গ্রেনেড ছোড়ে এবং এতে পাঁচজন নিহত হয়। দলটি লালমাইয়ে পাকিস্তানি সেনারা যে ঘরে থাকত, তার ভেতর দুটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতেও যথেষ্ট সংখ্যক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা লাকসামে ৭২ ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারি করে এবং অনেক নির্দোষ লোকের ওপর অত্যাচার চালায়। আমাদের আরেকটি দল লাকসামে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর গ্রেনেড ছোড়ে। ফলে কিছু লোক আহত হয়। আমাদের দুটি দল ফুলতলী ও মিয়াবাজারের কাছে ওই দিনই অ্যামবুশ পেতে রাখে। পাকিস্তানি সেনাদের দুটি গাড়ি রাত সাড়ে চারটার সময় ফুলতলীতে অ্যামবুশের মধ্যে পড়ে যায়। অ্যামবুশ দল একটি গাড়িকে ধ্বংস করে এবং একটি গাড়ির ক্ষতিসাধন করে। শেষের গাড়িটি লক্ষ্য করে অ্যামবুশ দল দুটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে শত্রুদের ছয়জন নিহত হয়। মিয়াবাজারের অ্যামবুশেও পাকিস্তানি সেনাদের পাঁচজন নিহত হয় এবং আমাদের সেনারা একটি মর্টার দখল করে নেয়।

আমাদের কাছে সংবাদ আসে যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম জুন মাসে ঢাকায় আসছে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সরেজমিনে অবগত হওয়ার

জন্য। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রচারযন্ত্র আন্তর্জাতিক অঙ্গনকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এ খবর পাওয়ামাত্র আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিমের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যদি পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য দেয়, তাহলে সেই আর্থিক সাহায্যে পাকিস্তানের সমরাস্ত্র কেনার ও যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হবে। যে করেই হোক, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিমকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক নয়। বরং বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই পাকিস্তানি বাহিনীর আয়ত্তাধীন নেই।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি গেরিলাদের একটি দলকে ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানো এবং পাকিস্তানিদের নিহত করার জন্য পাঠিয়ে দিই। দলটি ৪ জুন গোপন পথে ঢাকা রওনা হয় এবং পরদিন জিন্নাহ অ্যাভিনিউর কলেজ শু স্টোরের সামনে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। আর একটি গ্রেনেড ছোড়ে পুরানা পল্টনে রাত আটটায়। ওই দিনই বেলা দুইটায় আরেকটি ছোট দল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট চত্বরে এক পাকিস্তানি অফিসারের বাড়ির ভেতরে গ্রেনেড ছোড়ে। এতে অফিসারের গাড়িটির ক্ষতি সাধিত হয় এবং একজন লোক আহত হয়। পরের দিন সন্ধ্যায় *মর্নিং নিউজ* অফিসের ভেতরে গ্রেনেড ছোড়া হয়। এতে কয়েকজন পাকিস্তানি দালাল নিহত হয়। ইতিমধ্যে দলটি খবরাখবর নিয়ে জানতে পারে বিশ্বব্যাংক টিম হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান করছে। এ খবর পাওয়ার পর চারজন [মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী বীর বিক্রম, কামরুল হক বীর বিক্রম, আলী আহমেদ জিয়াউদ্দিন বীর প্রতীক ও হাবিবুল আলম বীর প্রতীক] গেরিলা ৯ জুন রাত আটটা ১৫ মিনিটে ইন্টারকন্টিনেন্টালে [পরে শেরাটন, বর্তমানে রূপসী বাংলা] প্রবেশ করে এবং বিশ্বব্যাংক টিমের হোটেলে ফেরার প্রতীক্ষায় থাকে। টিমের সদস্যরা যখন তাঁদের গাড়িতে করে আসেন এবং গাড়ি নিচে রেখে হোটেলের ভেতর প্রবেশ করেন, সে সময় গেরিলাদলটি গাড়ি লক্ষ্য করে তিনটি গ্রেনেড ছোড়ে। ফলে গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং নিকটবর্তী একজন পাঞ্জাবি সেনাও নিহত হয়।

এই ঘটনা দর্শনে বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তারা অতি সহজেই বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে বাংলাদেশের চলমান ঘটনার সঠিক চিত্র তুলে ধরেন। তাঁরা তাঁদের রিপোর্টে পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য না দেওয়ার সুপারিশ করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা ছিল পাকিস্তানের জন্য বিরাট এক পরাজয়।



অভিযানের আগে ঢাকার সন্নিকটে গেরিলারা ছবি : সংগৃহীত

রাজাপুর রেলস্টেশনের কাছে পাঁচড়া গ্রামে শত্রুদের একটি অবস্থান ছিল। অবস্থানটি ব্যবহৃত হতো শত্রুদের নয়নপুর ও রাজাপুর রেলস্টেশনের পেছন দিক থেকে নানা কিছু সরবরাহ করার কাজে। মতিনগর থেকে একটি রেইডিং দলকে পাঁচড়া গ্রামে শত্রু-অবস্থানের ওপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৩ জুন রাত নয়টার সময় দলটি গ্রামের গোপন পথে শত্রু-অবস্থানে অনুপ্রবেশ করে এবং অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে শত্রুদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এতে বেশ কিছু পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয় এবং তারা অবস্থান থেকে সরে পড়ে। কিন্তু এর পরও শত্রুপক্ষের সঙ্গে আমাদের সেনাদের রাতের অন্ধকারে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে গোলাগুলি চলে। পাকিস্তানি সেনাদের ওয়্যারলেস মেসেজ আমাদের ওয়্যারলেসে ধরা পড়ে। এতে জানা যায়, পাকিস্তানি সেনারা তাদের ঊর্ধ্বতন হেডকোয়ার্টারসকে জানাচ্ছে, 'মুক্তিবাহিনী আমাদের ওপর ভয়ংকর আক্রমণ চালাচ্ছে। আমাদের নির্দেশ দিন আমরা এখন কী করব।' এ ছাড়াও শত্রু-অবস্থান থেকে বারবার স্লোগান শোনা যেতে থাকে : 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ, আজিজ ভাট্টি জিন্দাবাদ, ১৭ পাঞ্জাব জিন্দাবাদ' ইত্যাদি। গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ তখনো শোনা যেতে থাকে। আমরা বুঝতে পারি, আমাদের দল সরে আসার পরও পাকিস্তানি বাহিনী নিজেদের মধ্যে ঘণ্টা কয়েক ধরে গোলাগুলি করে বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে। এ সংঘর্ষে পাকিস্তানি সেনাদের ১১ জন নিহত ও ১২ জন

আহত হয়। বেশ কিছু সেনা তাদের নিজেদের গুলিতেই হতাহত হয়।

পাকিস্তানিরা সীমান্তের নিকটবর্তী থানাগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ ও মিলিশিয়া নিয়োগ করতে শুরু করে। এসব থানায় তারা বাংকার তৈরি করে অবস্থানকে শক্তিশালী করতে থাকে। কুমিল্লার উত্তরে প্রতিটি থানাকেই তারা এভাবে শক্তিশালী করে। আমি এসব থানার ওপর আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানিদের শাসনযন্ত্রকে অচল করে দেওয়ার একটি পরিকল্পনা করি।

আমার অবস্থানের নিকটবর্তী বুড়িচং থানা আমার জন্য একটি বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা, বুড়িচংয়ের ভেতর দিয়েই আমার গেরিলারা গোপন পথে ঢাকা, কুমিল্লা ও ফরিদপুরে যাতায়াত করত। থানাটির অবস্থানের গোপন পথগুলো মোটেই নিরাপদ ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ সদস্যরা পাকিস্তানি সেনাদের কাছে আমাদের সম্পর্কে খবরাখবর পাঠাত। আমি বুড়িচং থানা আক্রমণ করার জন্য ১৬ জনের একটি দলকে পাঠাই। ১৪ জুন রাত একটায় দলটি বুড়িচং থানার ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। থানায় পাহারারত ইপকাফ [ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স। সংক্ষেপে কেউ ইপকাপ, ইপিকাপ বা ইপিসিএএফ বলত। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইপিআর বাহিনীর বেশির ভাগ বাঙালি সদস্য যুদ্ধে যোগ দেয়। ফলে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধকালে এই নতুন বাহিনী গঠন করে] ও পুলিশ যথেষ্ট বাধা দিলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের রেইডিং দলের কাছে তারা পরাস্ত হয়। এ সংঘর্ষে শত্রুদের আটজন নিহত হয়। আমাদের একজন সেনা গুরুতর আহত এবং আরেকজন নিখোঁজ হয়। এর ফলে বুড়িচং থানা শত্রুমুক্ত হয় এবং ঢাকা ও কুমিল্লা যাওয়ার গোপন পথ নিরাপদ হয়।

ঢাকায় ৪ জুন যে দলটি পাঠানো হয়েছিল, সেই দলটি এমনভাবে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে, যাতে পাকিস্তানিরা স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে না পারে। ঢাকার প্রশাসনব্যবস্থা যাতে পাকিস্তানিদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে না আসে, সে লক্ষ্যেই তৎপর ছিল এই গেরিলাদলটি। ১০ জুন দুপুর দুইটার সময় তারা নিউ মার্কেটের প্রধান চত্বরে তিনটি গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে লোকজন নিউ মার্কেট থেকে পালিয়ে যায় এবং দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। এর পরদিন বিকেল চারটায় যখন অফিস শেষ হচ্ছিল, ঠিক সে সময় ওয়াপদা বিল্ডিংয়ের সামনে একটি গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ফলে ওয়াপদা ভবনের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে নয়নপুর রেলস্টেশনের কাছে একটি গোডাউনের ভেতরে কিছুসংখ্যক শত্রুসেনা তাদের ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। এ খবর চতুর্থ বেঙ্গলের

'আলফা' কোম্পানি জানতে পারে। ক্যাপ্টেন সালেক একটি প্লাটুনের সঙ্গে আরআর ও মর্টার দিয়ে ঘাঁটিটি আক্রমণের জন্য পাঠায়। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় দলটি শত্রুদের অবস্থানের দক্ষিণ দিক দিয়ে পেছনে অনুপ্রবেশ করে এবং অতর্কিতে ওই গোডাউনটির ওপর আক্রমণ চালায়। আরআর-এর গোলা গোডাউনের ভেতরে পড়ে বিস্ফোরিত হয়। ওই দিন রাতেই হাবিলদার সালামের নেতৃত্বে নয়নপুর রেলস্টেশনের দক্ষিণে আশাবাড়ী থেকে রাত দেড়টার সময় শত্রু-অবস্থানের ওপর আরআর রাইফেল ও মর্টারের সাহায্যে আবার আক্রমণ চালানো হয়। শত্রুরা এ আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তারা দ্বিতীয়বার আক্রমণ আশা করেনি। এই আক্রমণে শত্রুদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এ সময় শত্রুদের অবস্থান যেখানে যেখানে ছিল, সেসব অবস্থানের কাছাকাছি এবং পাকিস্তানি সেনাদের চলাচলের রাস্তার ওপর মাইন পুঁতে রাখা হয়। ১৪ জুন রাতে ফকিরাহাট [ফকিরাবাজার] রেলস্টেশন থেকে ৭০০-৮০০ গজ উত্তরে শত্রুর একটি দল দুপুরে বাকশিমুল গ্রামে টহলের জন্য গিয়েছিল। আর একটি দল গাজীপুরের কাছে আমরা যে কাঠের পুল জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম, সেটি মেরামত করছিল। বাকশিমুল গ্রাম থেকে সন্ধ্যার সময় পাকিস্তানি সেনাদের দলটি ফকিরাহাটে [ফকিরাবাজার] নিজেদের অবস্থানে ফেরার পথে আমাদের পুঁতে রাখা মাইনের মধ্যে পড়ে এবং মাইনগুলো তাদের পায়ের চাপে ফাটতে থাকে। এতে তাদের অনেকে হতাহত হয় এবং তাদের মধ্যে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এসব মাইন ফাটার শব্দ নিকটবর্তী অবস্থান থেকে পাকিস্তানি সেনারা শুনতে পায়। রাতের অন্ধকারে তারা ঠিক বুঝতে পারছিল না, এ বিস্ফোরণের সঠিক কারণ কী? মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করেছে ভেবে পাকিস্তানি সেনারা প্রচণ্ডভাবে গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। এই গোলাগুলি চলে রাত আটটা থেকে তিনটা পর্যন্ত। তারা খোদ নিজেদের লোকের ওপরই শত শত মর্টার ও কামানের গোলা ছুড়ে চলে। আমাদের দূরে অবস্থিত টহলদল 'ইয়া আলী, ইয়া আলী, বাঁচাও বাঁচাও' ইত্যাদি ধ্বনি শুনতে পায়। পরে আমরা পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকমুখে শুনতে পাই যে আমাদের মাইনে এবং পাকিস্তানি সেনাদের নিজেদের গোলাগুলিতে অন্ততপক্ষে ৪০ থেকে ৫০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে। পরদিন সকালে পাকিস্তানি সেনাদের একজন ব্রিগেডিয়ার কুমিল্লা থেকে আসে ওই অবস্থানটি দখল করার জন্য।

পাকিস্তানি সেনারা এ দুর্ঘটনার পর রাজাপুর রেলস্টেশনের চারদিকে এবং ফকিরাহাট [ফকিরাবাজার] পর্যন্ত তাদের টহল আরও জোরদার করে।

মতিনগরে অবস্থিত আমাদের কোম্পানি শত্রুদের এই কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। ১৬ জুন সকালে আমাদের একটি প্লাটুন পাকিস্তানি সেনাদের টহল-পথের ওপর অ্যামবুশ পাতে। সকাল নয়টায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল রাজাপুর রেলস্টেশন থেকে রওনা হয়। দলটি আমাদের অ্যামবুশের মধ্যে পড়ে যায়। আমাদের লোকজন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর হালকা মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে অতর্কিতে গোলাগুলি চালায়। এ গোলাগুলিতে শত্রুদের আটজন নিহত ও একজন আহত হয়। এ ছাড়া আমাদের যোদ্ধারা বিপুল অস্ত্রশস্ত্র, টেলিফোন সেট, ড্রাইসেল ব্যাটারিসহ অন্যান্য জিনিস হস্তগত করে।

জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমার কাছে খবর আসে, শত্রুদের গোলন্দাজ বাহিনীর একটি ব্যাটারি (দল) কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিঅ্যান্ডবি রোড তাদের কামানের অবস্থান হিসেবে ব্যবহার করছে। পাকিস্তানি বাহিনীর নয়নপুর, শালদা নদী, টি আলীর বাড়ির (কসবায়) মতো শত্রু-অবস্থানগুলো রক্ষা করার লক্ষ্য থেকেই এসব কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করা হতো। এসব কামানের জন্যই পাকিস্তানি বাহিনীর উল্লিখিত অবস্থানগুলোর ওপর আমাদের আক্রমণ অনেক সময় কার্যকর করা যেত না। আমার কাছে আরও খবর আসে, প্রায়



ছবি : খালেদ'স ওয়ার তথ্যচিত্র থেকে

যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সহযোদ্ধার সঙ্গে মেজর খালেদ

১৫০ জন পাকিস্তানি সেনা এসব কামান ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এ সংবাদ পাওয়ামাত্র আমি লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবিরকে কথিত কামানগুলোর অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংস করার নির্দেশ দিই। ৪০ জনের একটি দল (চতুর্থ বেঙ্গলের 'ডেলটা' কোম্পানি) লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে ১৬ জুন রাত সাড়ে ১০টায় উল্লিখিত অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। সারা রাত পথ চলার পর দলটি ভোরে কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাস্তার পশ্চিমে সায়েদাবাদের চার মাইল উত্তরে পৌঁছায় এবং একটি গোপন অবস্থান তৈরি করে। ১৭ জুন সারা দিন ও রাতব্যাপী লেফটেন্যান্ট কবির তার সঙ্গে শুধু কয়েকজনকে নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের সায়েদাবাদ-অবস্থানটি সম্পর্কে অনুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালাতে থাকে। এই অবস্থানের পাহারায় কী কী ব্যবস্থা আছে, কারা পাহারাদার এবং কোন কোন অস্ত্রের সাহায্যে পাহারা দেওয়া হয়, অবস্থানে পৌঁছার গোপন পথ কোনটি, কামানগুলো রাতে কোন জায়গায় রাখা হয়, কোন সময় পাকিস্তানি সেনারা সজাগ থাকে এবং তাদের বাংকারগুলোর অবস্থান কোথায় ইত্যাদি খবরাখবর তারা সংগ্রহ করে। এরপর লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবির সকাল হওয়ার আগেই তার গোপন ঘাঁটিতে আসে। ১৮ জুন সারা দিন সে তার দলকে পাকিস্তানি সেনাদের সম্পর্কে বিস্তারিত খবর জানায় এবং পাকিস্তানি ঘাঁটিতে আক্রমণের পরিকল্পনা ও দায়িত্ব প্রত্যেককে বুঝিয়ে দেয়। সারা দিন দলটি আক্রমণের লক্ষ্যে প্রস্তুতি নেয়।

১৮ জুন ভোর চারটায় লেফটেন্যান্ট কবিরের নেতৃত্বে আমাদের দল পেছন দিক থেকে অনুপ্রবেশ করে পাকিস্তানি সেনাদের কামান ঘাঁটির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে ছিল। তারা এই আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সেদিনই কুমিল্লা থেকে পাকিস্তানি সেনাদের দুটি কোম্পানি, যেগুলো সামনে শত্রুদের ঘাঁটিকে শক্তিশালী করার জন্য যাচ্ছিল, তারাও রাতের বিশ্রামের জন্য অসতর্কভাবে এ অবস্থানে শুয়ে ছিল। আমাদের দলের অতর্কিত আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটিতে ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং অনেক শত্রুসেনা আমাদের গুলিতে প্রাণ হারাতে থাকে। আমাদের লোকজন কয়েকটি জিপ ও তিন টনের ট্রাকে গ্রেনেড ছুড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। পাকিস্তানি সেনারা এই আক্রমণের মুখে এত বেশি ভীত হয়ে পড়ে যে তারা তাদের হেডকোয়ার্টারসে জঙ্গি বিমানের সাহায্যের প্রার্থনা জানায়। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই এই যুদ্ধ চলে ভয়ংকরভাবে এবং আমাদের সেনারা পাকিস্তানিদের কামান, গাড়ি ইত্যাদি ধ্বংস করে। কিন্তু ইতিমধ্যে সকাল হয়ে যায়। ফলে রাতের ধ্বংসযজ্ঞের ঘোর কাটিয়ে উঠে

শত্রুপক্ষ তাদের প্রতিরোধশক্তি বাড়াতে থাকে। তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনটি জঙ্গি বিমান ওই এলাকায় এসে আমাদের রেইডিং দলের ওপর আক্রমণ চালায়। লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবিরের দলটি তখন আটকা পড়ে যাওয়ার ভয়ে দ্রুত আক্রমণ শেষ করে গ্রামের গোপন পথে মেঘনার দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এ সময় তারা বারবার পাকিস্তানি জঙ্গি বিমানের আক্রমণের শিকার হয়। তবু সব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে তারা সাফল্যের সঙ্গে শত্রুদের আওতার বাইরে চলে আসে। এক দিন পর তারা অন্য পথে আবার কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রধান সড়কের ওপর আসে এবং মথুরা সড়কের সেতুটি উড়িয়ে দিয়ে নিজ ঘাঁটিতে নিরাপদে ফিরে আসে।

লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবির দল এই আক্রমণের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাদের কামান দখল করতে না পারলেও এই আক্রমণের ফলাফল পাকিস্তানি সেনাদের জন্য ছিল ভয়াবহ। অন্ততপক্ষে ৫০ থেকে ৬০ জন পাকিস্তানি সেনা এ আক্রমণে হতাহত হয়। মৃতদেহগুলো পাকিস্তানি সেনারা দুটি বেসামরিক বাসে লাল ঝান্ডা করে কুমিল্লার দিকে নিয়ে যায়। এ খবর জানায় স্থানীয় লোকজন। তা ছাড়া গাড়ি, যুদ্ধসরঞ্জাম এবং এই অবস্থানে রাখা কামানের গোলা, যেগুলো ধ্বংস করা হয়েছিল, তা ছিল তাদের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। আসার পথে দলটি যে সেতু উড়িয়ে দিয়ে আসে, সেটাও তাদের গতিবিধিকে দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত করে। এ হামলার পর শত্রুসেনারা দু-তিন সপ্তাহ সব সেক্টরে তাদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তানি সেনারা এরপর নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর অত্যাচার চালায় এবং তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

১৬ জুন আমাদের কসবা অবস্থান থেকে একটি ছোট দল বগাবাড়ী নামক জায়গায় অ্যামবুশ পাতে। সকাল ছয়টায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি টহলদল কসবার দিকে তাদের টহলে আসে। পাকিস্তানি সেনাদের দলটি অসতর্কভাবে হঠাৎ আমাদের অ্যামবুশ দলের বাংকারের কাছে চলে আসে। আমাদের অ্যামবুশ দল এ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। অ্যামবুশ দল খুব কাছ থেকে তাদের ওপর গুলি চালাতে থাকে। অতর্কিত গুলির আঘাতে প্রায় ১০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও পাঁচজন আহত হয়। শুধু দুজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পাকিস্তানি সেনারা ১৮ জুন আমাদের অবস্থান 'কৈখোলার' ওপর গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমাদের অবস্থানকারী প্লাটুনটি কৈখোলা ত্যাগ করে এবং

সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল কৈখোলা দখল করে নেয়। ওই দিন রাতে ক্যাপ্টেন সালেক চৌধুরীর নেতৃত্বে আমাদের 'আলফা' কোম্পানি ভোর-রাতে কৈখোলায় অবস্থানরত শত্রুদের ওপর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালায়। হাবিলদার সালামের প্লাটুন শিবপুরের দিক থেকে এবং সুবেদার আবদুল হক ভূঁইয়ার প্লাটুন দক্ষিণ দিক থেকে শত্রুসেনাদের অবস্থানের ভেতর অনুপ্রবেশ করে। হাবিলদার সালামের প্লাটুনের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং পাকিস্তানি সেনারা হাবিলদার সালামের সামনের অবস্থান ছেড়ে পেছনে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের ভেতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং তারা কৈখোলা এলাকা থেকে পালাতে শুরু করে। দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি সেনারা অবস্থানটি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে। এ যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানি সেনাদের একজন জেসিওসহ ৩১ জন সেপাই হতাহত হয় এবং এ অবস্থান থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম দখল করা হয়।

১৯ জুন লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবিরের হেডকোয়ার্টারসে খবর আসে যে পাকিস্তানি সেনাদের একটি প্লাটুনকে সাগরতলায় টহল দেওয়ার জন্য যেতে দেখা গেছে। লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবির তৎক্ষণাৎ একটি প্লাটুন নিয়ে মন্দভাগের কাছে দ্রুত অ্যামবুশ পাতে। সন্ধ্যা সাতটায় পাকিস্তানি সেনাদের ফেরার পথে তাদের দলের শেষ অংশটিকে লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবির অ্যামবুশ করে। অ্যামবুশে তাদের নয়জন নিহত হয় এবং বাকি সেনারা মন্দভাগ গ্রামের দিকে পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচায়।

জুন মাসের মাঝামাঝি লেফটেন্যান্ট মেহবুব চতুর্থ বেঙ্গলের 'ব্রাভো' কোম্পানির একটি প্লাটুনকে পাকিস্তানি সেনাদের যাতায়াতের রাস্তা ধ্বংস করার জন্য কুমিল্লার দক্ষিণে পাঠায়। দলটি ১৮ জুন সন্ধ্যা ছয়টায় কুমিল্লা-লাকসামের বিজয়পুর রেলসেতু, কুমিল্লা-বাগমারা রোডের সেতু উড়িয়ে দেয়। এ সেতুগুলোর ধ্বংসের ফলে কুমিল্লার দক্ষিণে সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ওই দিনই দলটি বিজয়পুর এবং মিয়াবাজারের কাছে কয়েকটি ইলেকট্রিক পাইলন উড়িয়ে কাপ্তাই থেকে ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তানি সেনাদের একটি প্লাটুন সন্ধ্যার সময় 'চৌরার' কাছে টহল দিতে আসে। পাকিস্তানি সেনাদের এ দলকে অ্যামবুশ করলে দুজন নিহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা পরে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয় এবং অত্যাচার চালায়। আমাদের টহলদল খবর আনে, পাকিস্তানিদের প্রায় এক কোম্পানি সেনা মিয়াবাজারের উত্তরে একটি

গোডাউনের মধ্যে অবস্থান করছে। টহলদলটি গোডাউনে পৌঁছানোর গোপন রাস্তা, পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত খবর নিয়ে আসে। এ সংবাদ পেয়ে লেফটেন্যান্ট মেহবুব ৩৩ জনের একটি কমান্ডো প্লাটুনকে ব্লান্ডিসাইট, মর্টারসহ রাত নয়টায় উল্লিখিত গুদামে আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। কমান্ডো দলটি রাত ১২টার সময় শত্রু-অবস্থানের কাছে পৌঁছে যায়। তারা একটি ছোট দল পাঠিয়ে অবস্থানটির সর্বশেষ খবর নেয় এবং জানতে পারে, পাকিস্তানি সেনারা এ অবস্থানে তেমন কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়নি। রাত একটায় আমাদের কমান্ডো প্লাটুন পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের ভেতর অতর্কিতে অনুপ্রবেশ করে এবং পাকিস্তানি সেনাদের ওপর হালকা অস্ত্রের সাহায্যে গুলি চালাতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা অনেকেই গুলিতে হতাহত হয়। তারা আমাদের কমান্ডো প্লাটুনের ওপর পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়।

১৮ জুন রাত নয়টায় মিয়াবাজারের দক্ষিণে আমাদের আরেকটি প্লাটুন পাকিস্তানি সেনাদের দুটি বাংকারের ওপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে সাতজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা এরপর সারা রাত অবিরত মর্টারের গোলা ছুড়তে থাকে। আমাদের দলটি 'খিলা' রেলস্টেশনের কাছে কয়েকটি ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন রাস্তায় পুঁতে রাখে। পাকিস্তানি সেনাদের একটি জিপ রাতে ওই রাস্তায় যাওয়ার পথে মাইনের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় এবং পাঁচজন পাকিস্তানি সেনাও নিহত হয়।

জুন মাসেই পাকিস্তানি সেনারা কুমিল্লা শহরে শাসনকাজ আবার স্বাভাবিক করার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারি অফিস ভালোভাবে চালানোর জন্য তারা সরকারি কর্মচারীদের বাধ্য করে। শহরের দোকানপাট ও যানবাহন চালু করার বন্দোবস্ত করে। পাকিস্তানিদের এ চেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য চারজন গেরিলার একটি দলকে ৬ জুন কুমিল্লার উত্তর দিয়ে গোমতী নদী পার করিয়ে কুমিল্লা শহরে পাঠানো হয়। দলটি গ্রেনেড ও স্টেনগান সঙ্গে নিয়ে যায়। তিন দিন পর্যন্ত শহরের ভেতর একটি গুপ্ত অবস্থানে এ দল নিজেদের ঘাঁটি গড়ে তোলে। কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি সেনাদের টহলদলগুলো সম্পর্কে তারা বিস্তারিত খবরাখবর জোগাড় করে। ১০ জুন সন্ধ্যায় কমার্স ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, জজকোর্ট প্রভৃতি স্থানে পর পর পাকিস্তানি সেনাদের ওপর গ্রেনেড ছোড়া হয়। এর ফলে একজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও পাঁচজন আহত হয়। ওই দিনই সাতজন পাকিস্তানি রেঞ্জারের

একটি দলকে তারা আক্রমণ করে। এতে দুজন মিলিশিয়া নিহত হয় এবং তাদের একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর কয়েক দিন পর ২১ জুন সকালে আমাদের সেনারা একটি আরআর কুমিল্লা শহরের কাছে বয়ে নিয়ে যায় এবং কুমিল্লা বিমানবন্দর ও শহরের উপকণ্ঠে গোলাগুলি করে এবং পাকিস্তানিরা পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে থাকে। এসব কার্যকলাপের ফলে কুমিল্লা শহর ও এর নিকটবর্তী এলাকার লোকজন আবার তাদের সাহস ফিরে পায়। অনেকেই শহর থেকে বাইরে চলে যায়। পাকিস্তানিদের শাসনব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়।

শালদা নদীতে পাকিস্তানি সেনারা জুন মাসে তাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করছিল। তাদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করা এবং তাদের ব্যস্ত রাখার জন্য ক্যাপ্টেন সালেক চতুর্থ বেঙ্গলের 'আলফা' কোম্পানির একটি প্লাটুনকে মর্টারসহ শালদা নদীর পশ্চিম দিকে পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি রাত তিনটায় পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানটি ঘুরে পেছনে যেতে সক্ষম হয়। সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় পূর্বনির্ধারিত স্থানে তারা নিজেদের ঘাঁটি স্থাপন করে। এরপর ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে মেশিনগান ও অন্যান্য হালকা অস্ত্রশস্ত্র এবং মর্টারের সাহায্যে শত্রু-অবস্থানের ওপর খুব কাছ থেকে হামলা চালায়। পাকিস্তানি সেনারা দিনের বেলায় তাদের অবস্থানের পেছনে এত কাছ থেকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এর ফলে এখানে তাদের অন্ততপক্ষে একজন জেসিওসহ ৩২ জন হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল রাতে শালদা নদী-অবস্থান থেকে কসবাতে টহলের জন্য গিয়েছিল। এ খবর আমাদের লোকজনের জানা ছিল না। পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে আমাদের প্লাটুনের যখন ভয়ংকর সংঘর্ষ চলছিল, সে সময় তাদের টহলদলটি কসবা থেকে ফেরার পথে আমাদের প্লাটুনের পেছনে অবস্থান নিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। আমাদের প্লাটুন খুব কষ্ট করে তখনই পাকিস্তানি সেনাদের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এ সময় আমাদের একজন লোক আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা এরপর শালদা নদী-অবস্থান আরও শক্তিশালী করে তোলে।

আমরা খবর পাই, পাকিস্তানি বাহিনী প্রায়ই হোমনা থানার কাছে কাঁঠালিয়া ও গোমতী নদীতে লঞ্চে করে টহল দেয়। এ খবর শুনে আমি হেডকোয়ার্টারস থেকে হাবিলদার গিয়াস উদ্দিন আহাম্মদের নেতৃত্বে একটি প্লাটুনকে হোমনা থানায় পাঠাই। দলটি অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে দাউদকান্দির আট মাইল উত্তরে ও গৌরীপুর থেকে সাত মাইল উত্তর-

পশ্চিমে চড়কমারী গ্রামের কাছে তাদের গুপ্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে। হাবিলদার গিয়াস উদ্দিন আহাম্মদ চড়কমারী গ্রামের কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহী লঞ্চকে অ্যামবুশ করার জন্য তার দল নিয়ে নদীর পাড়ে একটি অবস্থান গড়ে তোলে। পাকিস্তানি সেনারা তাদের নিয়মিত টহলে সকালে পশ্চিম থেকে কাঁঠালিয়া নদী পথে লঞ্চযোগে অগ্রসর হয়। লঞ্চটি যখন ৫০ গজের ভেতর চলে আসে, তখন হাবিলদার গিয়াস উদ্দিনের দল মেশিনগান, হালকা মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্র থেকে অতর্কিতে গোলাগুলি চালাতে থাকে। পাকিস্তানি সেনাদের অনেকেই এতে হতাহত হয়। লঞ্চটির সারেং লঞ্চটিকে একটি চরের দিকে নিয়ে ভেড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। এরপর অনেক পাকিস্তানি সেনারা লঞ্চ থেকে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে করেও তারা রক্ষা পায় না। পানিতে গুলিবিদ্ধ হয়েই তারা মারা যায়। লঞ্চটিও আমাদের মেশিনগানের গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ডুবে যায় এবং বেশির ভাগ পাকিস্তানি সেনা এভাবে পানিতে ডুবে মারা যায়। শুধু কয়েকজন সাঁতরে অন্য পাড়ে উঠে পালাতে সক্ষম হয়। এই লঞ্চে পাকিস্তানিদের অন্তত ৭০-৮০ জন সেনা ছিল এবং সঙ্গে তিনজন বেসামরিক লোকও ছিল। হাবিলদার গিয়াস উদ্দিনের দল ওই লঞ্চ থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করে। সেদিনই বিকেল পাঁচটার দিকে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার তাদের ওই লঞ্চ ও লোকজনের খবরাখবর নেওয়ার জন্য ওই এলাকায় টহল দিতে শুরু করে। কিন্তু কোনো খোঁজখবর না পেয়ে সেটি ফেরত চলে যায়। এই অ্যাকশন সকালে এক থেকে দেড় ঘণ্টা ধরে চলে এবং পার্শ্ববর্তী সব এলাকার স্থানীয় লোকজন দূর থেকে তা প্রত্যক্ষ করে। পাকিস্তানি বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হতে দেখে স্থানীয় লোকজনের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। তারা মুক্তিবাহিনীর ওপর আরও আস্থাশীল হয়ে ওঠে। হাবিলদার গিয়াস উদ্দিন এখনো ওই এলাকার লোকজনের মুখে মুখে কিংবদন্তির নায়ক হয়ে আছে।

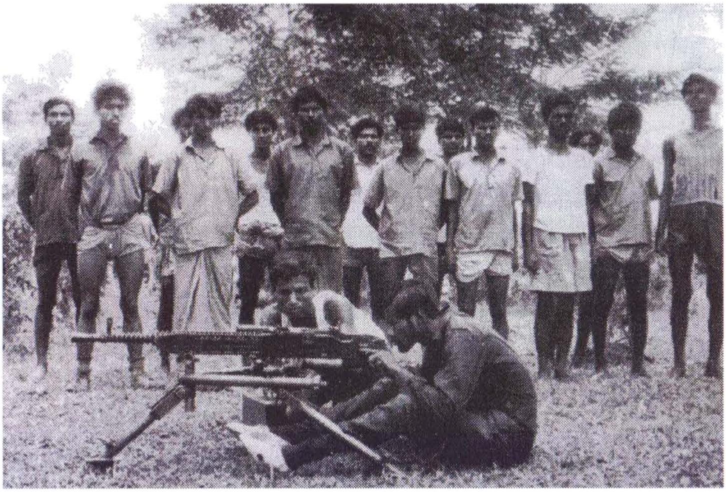
সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর অধীনে যে কোম্পানিটিকে লাকসামের দক্ষিণে এবং নোয়াখালীর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল, সেটিও পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। চাঁদপুর থেকে পাকিস্তানি বাহিনী নোয়াখালীতে যাওয়ার জন্য যে রাস্তাটি ব্যবহার করত, সে রাস্তায় লক্ষ্মীপুরের কাছে ৯০ ফুটের একটি সড়কসেতু বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পর পাকিস্তানি বাহিনী পশ্চাদপসরণ করলে সুবেদার আলী আকবরের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী রায়পুর থানা আক্রমণ

করে। এই আক্রমণের ফলে দালাল পুলিশ সদস্যরা থানা থেকে পালিয়ে যায়। পাকিস্তানিরা মাঝে মাঝে এ থানায় এসে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করত এবং দালাল পুলিশের সাহায্যে স্থানীয় লোকজনদের ওপর খুব অত্যাচার করত। এ থানা দখল করে নেওয়ার ফলে গোটা এলাকা মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

১৬ জুন আমাদের হেডকোয়ার্টারস থেকে দুটি গেরিলাদল পাঠানো হয়। ছয়জনের একটি দলকে কুমিল্লার দক্ষিণে ইলেকট্রিক পাইলন ওড়ানোর জন্য এবং আরও ছয়জনের একটি দলকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরে তিতাস গ্যাসলাইন কাটার জন্য পাঠানো হয়। ২১ জুন প্রথম দলটি দুটি ইলেকট্রিক পাইলন ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে নোয়াখালীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। ২৭ জুন সন্ধ্যায় দ্বিতীয় দলটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরে তালশহরে তিতাস গ্যাসের চার ফুট পাইপ উড়িয়ে দেয়। এতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জ ও সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনগুলোতে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে এসব পাওয়ার স্টেশন থেকে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় বিদ্যুৎ সরবরাহ। এতে শিল্প এলাকাগুলোর যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

মতিনগর থেকে একটি প্লাটুনকে রাজাপুরের পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর হামলা চালানোর জন্য পাঠানো হয়। প্লাটুনটি ২২ জুন আমাদের ঘাঁটি থেকে রাজাপুরের দিকে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যায় রাজাপুর শত্রু-অবস্থানটি তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রেকি করে। তারা জানতে পারে যে পাকিস্তানি সেনারা বেশ অসতর্কভাবেই তাদের অবস্থানে আছে। ২২ জুন ভোররাত চারটায় আমাদের দল গোপন পথে শত্রু-অবস্থানের ভেতর প্রবেশ করে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা সম্পূর্ণ হকচকিত হয়ে যায়। আমাদের লোকদের হাতে তাদের প্রায় ১৫ জন হতাহত হয়। আমাদের একজন আহত হয়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আক্রমণ চলার পর আমাদের লোকেরা পিছু হটে আসে।

আমাদের রেকি দল খবর আনে যে পাকিস্তানি সেনারা কসবার উত্তরে চন্দ্রপুর ও লাতুমুড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদ পাওয়ার পর লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবির পাকিস্তানি সেনাদের চারদিক থেকে অ্যামবুশ করার জন্য চতুর্থ বেঙ্গলের ‘ডেলটা’ কোম্পানির তিনটি প্লাটুনকে ইয়াকুবপুর, কুয়াপাইনা ও খৈনলে পাঠিয়ে দেয়। এই তিন প্লাটুন নিজ নিজ জায়গায় ২৩ জুন সকাল ছয়টার মধ্যে অবস্থান নেয়। পাকিস্তানি সেনারা সারা রাত অগ্রসর হওয়ার পর সকালে আমাদের অবস্থানের সামনে উপস্থিত হয়।



প্রশিক্ষণরত ২ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ছবি : রবীন সেনগুপ্ত

পাকিস্তানি সেনারা ওপরে উল্লেখিত আমাদের অবস্থানের ৫০ থেকে ১০০ গজের মধ্যে এসে পড়লে তিন দিক থেকে আমাদের সেনারা পাকিস্তানিদের ওপর আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের আটজন নিহত এবং তিনজন আহত হয়। তারা একটু পিছু হটে আবার আক্রমণের চেষ্টা চালায়; কিন্তু তাদের সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর সারা দিন উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকে এবং সন্ধ্যার সময় পাকিস্তানিরা পিছু হটে যায়। পাকিস্তানি সেনাদের পশ্চাদপসরণের সময়ও আমাদের ইয়ারপুরের প্লাটুন তাদের দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করে বেশ ক্ষতিসাধন করে। তারপর পিছু হটে গিয়ে লাতুমুড়া উত্তরে অবস্থান নেয় এবং প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করতে থাকে। ২৪ জুন পাকিস্তানি সেনারা যখন লাতুমুড়ায় তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলায় ব্যস্ত ছিল, ঠিক তখন, অর্থাৎ ভোর পাঁচটায় কুয়াপাইনা ও খৈনল এলাকা থেকে শত্রুদের বাঁয়ে এবং দক্ষিণে আমাদের তিনটি প্লাটুন আবার অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি সেনাদের নয়জন নিহত এবং আমাদের একজন আহত হয়।

নোয়াখালীর উত্তরে পাকিস্তানি বাহিনী ফেনী থেকে নোয়াখালী পর্যন্ত ট্রাকে টহল দিয়ে বেড়াত। এ খবর আমাদের নোয়াখালীর গেরিলারা হেডকোয়ার্টারসে পৌঁছে দেয়। সেখান থেকে আমাদের দুটি অ্যামবুশ দলকে

বোগাদিয়া ও বজরাতে পাঠানো হয়। ২১ জুন এ দুটি দল সন্ধ্যায় ওই দুই জায়গায় অ্যামবুশ পাতে। তারা রাস্তায় একটি অ্যান্টি-ট্যাংক ও অ্যান্টি-পার্সোনেল মাইন পুঁতে রাখে। সন্ধ্যায় পাকিস্তানি সেনাদের দুটি ট্রাক ফেনীর দিকে যাচ্ছিল। ট্রাক দুটি অ্যামবুশের আওতায় পৌঁছালে প্রথম ট্রাকটি অ্যান্টি-ট্যাংক মাইনে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেটি ধ্বংস হয়ে যায়। পরের ট্রাকটি পিছু হটে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু অ্যামবুশ দল তাদের ওপর গুলি চালাতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা উপায়ান্তর না দেখে ট্রাক থেকে বেরিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পলায়নরত শত্রুদের কিছুসংখ্যক গুলিতে মারা যায়, আর কিছু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ অ্যামবুশে পাকিস্তানি সেনাদের দুটি ট্রাক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় এবং ১২ জন নিহত হয়। ২৩ জুন আমাদের দল পাকিস্তানি সেনাদের যোগাযোগব্যবস্থা নষ্ট করে দেওয়ার জন্য নোয়াখালীর শাহেবজাদা সেতু, চন্দ্রগঞ্জ ও রামগঞ্জ জেলা কাউন্সিল সেতু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।

পাকিস্তানি সেনারা লাতুমুড়ায় তাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা অব্যাহত রাখে; কিন্তু চতুর্থ বেঙ্গলের 'ডেলটা' কোম্পানি লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে তাদের সব সময় ব্যতিব্যস্ত রাখে।

পাকিস্তানি সেনারা তাদের শালদা নদী-অবস্থান থেকে সব সময় মন্দভাগ দখল করে নেওয়ার চেষ্টা চালাত। চতুর্থ বেঙ্গলের 'চার্লি' কোম্পানি মন্দভাগ রেলস্টেশন এবং জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা পর্যন্ত নিজেদের দখলে রেখে শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলেছিল। এ অবস্থানটির জন্য পাকিস্তানি বাহিনী চট্টগ্রাম-ঢাকা রেললাইন চালু করতে পারছিল না। সে জন্য সব সময় তাদের চেষ্টা ছিল মন্দভাগ থেকে আমাদের বিতাড়িত করা। এ ছাড়া এ অবস্থানের জন্য তারা শালদা নদী ছিটমহল, যেখানে আমাদের মূল ঘাঁটি ছিল, তা দখলে আনতে পারছিল না। অনেকবার চেষ্টা করেও তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ২৪ জুন বেলা তিনটায় তাদের শালদা নদী-অবস্থান থেকে পাকিস্তানি সেনাদের একটি কোম্পানি এবং কসবায় টি আলীর বাড়ি থেকে আরেকটি কোম্পানি দুই দিক থেকে এসে কাইমপুরের কাছে মিলিত হয়। তারপর মর্টার, মেশিনগান ও কামানের সাহায্যে আমাদের মন্দভাগ অবস্থানে আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড গোলার সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাদের শক্তিশালী দলটি মন্দভাগ রেলস্টেশনের ৩০০ গজ পশ্চিমে জেলা বোর্ডে সড়কের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। আমাদের সেনারাও তাদের বাংকার থেকে মেশিনগান ও হালকা মেশিনগানের গুলিতে পাকিস্তানি সেনাদের

ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে থাকে। ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টার পরও পাকিস্তানি সেনারা যখন অগ্রসর হতে পারছিল না, তখন তাদের আক্রমণ বন্ধ করে দেয় এবং পিছু হটে চলে যায়। এ আক্রমণের সময় পাকিস্তানি সেনাদের ২৪ জন হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা তাদের কাইমপুরের অবস্থানও তুলে নিয়ে শালদা নদীর মূল ঘাঁটিতে চলে যায়।

ঢাকায় আমাদের গেরিলারা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ যাতে স্বাভাবিকভাবে না চলে, সে জন্য তারা ২৯ জুন বিকেল পাঁচটায় সিদ্ধিরগঞ্জ ও খিলগাঁও পাওয়ার লাইনের একটি পাইলন ধ্বংস করে দেয়। বিধ্বস্ত পাইলনটি অন্য দুটি পাইলনের তার নিয়ে ছিঁড়ে পড়ে যায়। ফলে কমলাপুর ও তেজগাঁওয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনেকাংশে কমে যায়। বিস্ফোরণের ঠিক পরপরই পাকিস্তানি সেনাদের একটি হেলিকপ্টার ওই এলাকায় গেরিলাদের অনেক খোঁজাখুঁজি করে। আমাদের গেরিলারা নিরাপদে ফিরে আসে। আরেকটি গেরিলাদল সিদ্ধিরগঞ্জের মাতুয়াইলে মাটির নিচ দিয়ে যাওয়া পাওয়ার লাইন উড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানি সেনারা নিকটবর্তী ঘাঁটি থেকে জিপে করে এসে দলটিকে ধরার চেষ্টা করে এবং এদের ওপর গোলাগুলি করে, কিন্তু গেরিলাদলটি নিরাপদে ফিরে আসে।

স্থানীয় লোকমুখে আমরা সংবাদ পাই, পাকিস্তানি সেনাদের একটি জিপ ও টহলদল প্রায়ই সায়েদাবাদ থেকে কর্নেল বাজার পর্যন্ত আসে। এ সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন খোলাপাড়ায় এবং তুলাইশমলে একটি করে প্লাটুনের সাহায্যে অ্যামবুশ লাগায়। ২৭ জুন সন্ধ্যার সময় পাকিস্তানি সেনাদের টহলদল খোলাপাড়ায় আমাদের অ্যামবুশে পড়ে যায়। এতে পাকিস্তানি সেনাদের আটজন নিহত হয় এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা পালিয়ে যায়। এর পরদিন ২৮ জুন সন্ধ্যা সাতটায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি জিপ তুলাইশমলে আমাদের অ্যামবুশে পড়ে। অ্যামবুশ দলের গুলিতে জিপটি রাস্তা থেকে পড়ে যায়। জিপে পাঁচজন পাকিস্তানি সেনা ছিল, তারাও সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। আমাদের দল অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়।

পাকিস্তানি সেনারা কুমিল্লা শহরের পূর্ব দিকে বিবিরবাজার এলাকায় যে ঘাঁটি গড়েছিল, সেখানে আমরা প্রায়ই আক্রমণ করে তাদের ব্যতিব্যস্ত রাখতাম। লেফটেন্যান্ট মেহবুব খবর পায় যে পাকিস্তানি সেনারা সন্ধ্যার পর তাদের বাংকার থেকে আর বাইরে আসে না। রাতে যেসব পাহারাদার থাকে, তারাও বাংকারের মধ্যে বসে থাকে। এ সংবাদ পেয়ে লেফটেন্যান্ট মেহবুব দুটি প্লাটুনকে ২৪ জুন রাতে শত্রুদের বিবিরবাজার ঘাঁটির কয়েকটি বাংকার

ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়ে কুমিল্লার দক্ষিণ থেকে পাঠিয়ে দেয়। দলটি অরণ্যপুর হয়ে শত্রুদের বিবিরবাজার অবস্থানের পেছন দিকে পৌঁছায় এবং রাত তিনটায় অবস্থানের ভেতরে অনুপ্রবেশ করে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। প্রথমেই তারা তাদের সামনের একটি বাংকারে গ্রেনেড ছোড়ে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। এরপর আরও দু-একটি বাংকার ধ্বংস করে তারা সকাল হওয়ার আগেই শত্রু-অবস্থান ত্যাগ করে। এই অতর্কিত আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের ২১ জন নিহত ও সাতজন আহত হয়।

বিজয়পুরের যে রাস্তার সেতুটি আমাদের কমান্ডো দল উড়িয়ে দিয়েছিল, পাকিস্তানি সেনারা সেটি সাময়িকভাবে মেরামত করে আবার যাতায়াত শুরু করে। লেফটেন্যান্ট মেহবুব আবার একটি কমান্ডো প্লাটুন পাঠায় এবং প্লাটুনটি ২১ জুন বিজয়পুর সেতুর কাছে অ্যামবুশ পেতে পাকিস্তানি সেনাদের অপেক্ষায় থাকে। রাত দুইটার সময় পাকিস্তানি সেনাদের দুটি গাড়ি কুমিল্লা থেকে ওই রাস্তায় আসে। গাড়িগুলো যখন সেতুর ওপর দিয়ে চলাতে শুরু করে, ঠিক তখনই আমাদের দল তাদের ওপর গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িগুলো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতু থেকে নদীতে পড়ে যায়। এতে দুটি গাড়িই বিনষ্ট হয় এবং আটজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আমার হেডকোয়ার্টারস থেকে গেরিলাদের ৬০ জনের একটি দলকে আমি ফরিদপুরে পাঠাই। মাদারীপুর, পালং, রাজৈর, নড়িয়া প্রভৃতি থানায় গেরিলাদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এই দলগুলো তাদের নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে ঘাঁটি গড়ে তোলে। এখানে তারা কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি দালালকে হত্যা করে। এরপর তারা নিজ নিজ এলাকার থানাগুলো, যেখান থেকে দালাল পুলিশ পাকিস্তানিদের খবরাখবর জোগাত, সেই থানাগুলো ভালোভাবে রেকি করে। প্রথমে তারা শিবচর ওয়্যারলেস স্টেশনটি ধ্বংস করে দেয়। এরপর গেরিলা কমান্ডার খলিলের নেতৃত্বে ২৭ জুন রাত ১১টায় পালং থানার ওপর আক্রমণ চালানো হয়। এ আক্রমণে একজন দালাল সাব-ইন্সপেক্টর ও দুজন পুলিশ সদস্য নিহত হয়। গেরিলারা নয়টি রাইফেল দখল করে নেয়। তারা থানার ওয়্যারলেস স্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়। নড়িয়ার গেরিলাদল খবর পায় যে মাদারীপুরের ডিআইবি ইন্সপেক্টর ও দালাল সিআই স্থানীয় এক দালালের বাড়িতে গোপন আলোচনায় ব্যস্ত। এ সংবাদ পেয়ে তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। তারপর নড়িয়ার ওয়্যারলেস স্টেশন ধ্বংস করে দেয়।

শত্রুদের একটি ছোট দল রাজৈর থানার টাহেরহাটে এসে অবস্থান নেয়। রাজৈরের গেরিলাদলটি তাদের অবস্থান সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খবর নেয়। ২৮ জুন রাত ১১টায় ২০ জনের একটি গেরিলাদল টাহেরহাটে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। এ আক্রমণে পাকিস্তানিদের ১০ সেনা নিহত হয় এবং তারা টাহেরহাট অবস্থান থেকে পালিয়ে যায়।

পাকিস্তান রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয় যে ২৮ জুন সন্ধ্যায় জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন। এ সংবাদ জানতে পেরে আমি ইয়াহিয়া খানের ভাষণকে তাৎক্ষণিক সংবর্ধনা জানানোর জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এ সম্পর্কে আমি আমার সাবসেক্টর কমান্ডারদের আমার হেডকোয়ার্টারসে ডেকে পাঠাই এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে ভাষণের সময় পাকিস্তানিরা সর্বক্ষেত্রেই রেডিও শোনার জন্য তাদের নিজ নিজ প্রতিরক্ষা অবস্থানে একত্র হবে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল হবে। এ সময় তাদের এ অসতর্কতা আমাদের জন্য আনবে এক সুবর্ণ সুযোগ। তা ছাড়া আমাদের অ্যাকশনও হবে ইয়াহিয়া খানের ভাষণের সমুচিত জবাব। এ জন্য আমি সব সাবসেক্টর কমান্ডারকে নির্দেশ দিলাম, তারা সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পর থেকে যখন ইয়াহিয়ার ভাষণ আরম্ভ হবে ঠিক সে সময়, আমার সেক্টরের সব এলাকায় একযোগে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর তীব্র আক্রমণ চালাবে। এ নির্দেশ অনুযায়ী চতুর্থ বেঙ্গলের 'আলফা' কোম্পানি নয়নপুরের পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে তিন দিক থেকে অগ্রসর হয় এবং ভাষণ আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ পরই পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা এ অতর্কিত আক্রমণে হকচকিত হয়ে যায়। এর পাশাপাশি আমাদের মর্টারের গোলাও তাদের ওপর পড়তে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা তাদের অবস্থানের চারদিকে দৌড়াদৌড়ি ও চিৎকার করে বাংকারের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেশিনগানের গুলিতে তাদের অনেকেই মারা যায়। আধঘণ্টা এভাবে গুলি চালানোর পর আমাদের সেনারা শত্রু-অবস্থান ছেড়ে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে আসে। এ যুদ্ধে ১৮ জন নিহত এবং বহু আহত হয়।

ওই দিনই আমাদের একটি কোম্পানি মর্টারসহ লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে ঠিক ওই সময় লাতুমুড়ায় শত্রু-অবস্থানের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। তখন তারা ইয়াহিয়ার ভাষণ শুনছিল। এ আক্রমণের ফলে

শত্রুদের মধ্যে বেশ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি সেনাদের পাঁচজন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। আমাদের কোম্পানি শত্রুদের ওপর আড়াই ঘণ্টা আক্রমণ চালিয়ে নিরাপদে পিছু হটে আসে।

ঢাকায় ওই সময়টিকে উদ্‌যাপন করার জন্য আমি ৫০ জন গেরিলার একটি দলকে পাঠিয়ে দিই। দলটি ২৭ জুন ঢাকায় পৌঁছায়। তারপর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ঢাকা শহরের প্রধান স্থানগুলোতে, যেমন—জিন্নাহ অ্যাভিনিউ [বর্তমানে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ], মতিঝিল, শাহবাগ, পুরানা পল্টন, সদরঘাট, চকবাজার প্রভৃতি স্থানে একযোগে ইয়াহিয়া খানের ভাষণের সময় গ্রেনেড বিস্ফোরণ এবং মোটরগাড়িতে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণের শব্দে পাকিস্তানি সেনারা চারদিকে ছোটাছুটি শুরু করে দেয় এবং ঢাকায় রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এ বিস্ফোরণজনিত ঘটনার ফলে ঢাকায় বাঙালিরা তাদের মনোবল আবার ফিরে পায় এবং তারা ইয়াহিয়ার ভাষণের সমুচিত জবাবে আনন্দিত হয়।

মতিনগর থেকে দুটি মর্টার দিয়ে একটি ছোট দলকে গোমতীর উত্তর দিক দিয়ে কুমিল্লা শহরের দিকে পাঠানো হয়। দলটি ভাষণের সময় কুমিল্লা শহরের কাছাকাছি অবস্থান থেকে কুমিল্লা সার্কিট হাউসের ওপর মর্টারের গোলা ছোড়ে। কুমিল্লা সার্কিট হাউসে পাকিস্তানি সেনাদের 'মার্শাল ল'র প্রধান অফিস ছিল। মর্টারের গোলা এসে অফিসে পড়ার পর সেখানেও পাকিস্তানি সেনারা ছোটাছুটি করতে থাকে। কুমিল্লা শহরেও কয়েক মিনিটের মধ্যে নীরবতা নেমে আসে।

কুমিল্লা থেকে পাকিস্তানিদের একটি জিপ ও একটি তিন টনের গাড়ি দক্ষিণে যাচ্ছিল। লেফটেন্যান্ট মেহবুবের একটি অ্যামবুশ দল সন্ধ্যার সময় ফুলতলীর কাছে পাকিস্তানি দলটিকে আক্রমণ করে। এতে জিপটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এ অ্যামবুশে পাকিস্তানিদের ২৪ জন সেনা ও তিনজন অফিসার নিহত হয় এবং একজন অফিসারসহ চারজন আহত হয়। ওই অফিসার একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ছিল।

লেফটেন্যান্ট মেহবুবের আরেকটি প্লাটুন ঠিক ওই সময়ে বিবিরবাজার শত্রু-অবস্থানের ভেতরে অতর্কিতে অনুপ্রবেশ করে একটি মেশিনগানসহ কয়েকটি বাংকার ধ্বংস করে দেয়। পাকিস্তানি সেনাদের ১১ জন এতে নিহত হয়।

এ ছাড়া, মিয়াবাজার, ফেনী, বিলোনিয়া, লাকসাম, শালদা নদী, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানেও মর্টার ও গ্রেনেডের সাহায্যে পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর একযোগে একই ধরনের আক্রমণ চালানো হয়।

ইয়াহিয়া খান মনে করেছিলেন যে তাঁর ভাষণ দিয়ে তিনি বাঙালিদের শান্ত করবেন এবং আবার তাঁর মিথ্যা আশ্বাসে বাঙালিরা অত্যাচারের কথা ভুলে যাবে, কিন্তু আমাদের সমগ্র এলাকায় সব অ্যাকশন থেকে তিনি নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছিলেন যে বাঙালিরা তার জবাব কী দিয়েছে!

সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আমি আমার যুদ্ধের এলাকাকে কয়েকটি সাবসেক্টরে বিভক্ত করে নিই। আমার সাবসেক্টরগুলো নিম্নলিখিত জায়গায় তাদের অবস্থান গড়ে তোলে।

ক) গঙ্গাসাগর, আখাউড়া ও কসবা সাবসেক্টর : এর অধিনায়ক ছিল ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন। তার সঙ্গে ছিল লেফটেন্যান্ট ফারুক, ক্যাপ্টেন মাহবুব ও লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবির। এখানে চতুর্থ বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানি এবং ইপিআরের দুটি কোম্পানি ছিল। এদের সঙ্গে মর্টারের একটি দল ছিল। এই সাবসেক্টর কসবা, আখাউড়া, সায়েদাবাদ, মুরাদনগর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত তাদের অপারেশন চালাত।

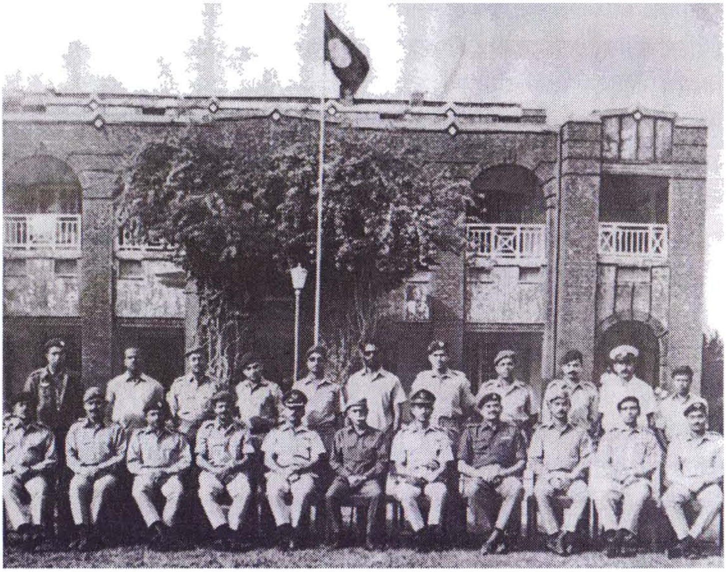
খ) দ্বিতীয় সাবসেক্টর ছিল মন্দভাগে : এর অধিনায়ক ছিল ক্যাপ্টেন গাফফার। তার অধীনে চার্লি কোম্পানি ও একটি মর্টারের দল ছিল। এ দল মন্দভাগ রেলস্টেশন থেকে কুটি পর্যন্ত তাদের অপারেশন চালাত।

গ) তৃতীয় সাবসেক্টরে ছিল শালদা নদী : এর অধিনায়ক ছিল ক্যাপ্টেন আবদুস সালেক চৌধুরী। এর অধীনে 'আলফা' কোম্পানি এবং ইপিআরের একটি কোম্পানি ছিল। এ দল শালদা নদী, নয়নপুর ও বুড়িচং এলাকা পর্যন্ত তাদের অপারেশন চালাত।

ঘ) চতুর্থ সাবসেক্টর ছিল মতিননগরে : কমান্ডে ছিল লেফটেন্যান্ট দিদারুল আলম। হেডকোয়ার্টারস কোম্পানির কিছুসংখ্যক সেনা এবং ইপিআরের একটি কোম্পানি গোমতীর উত্তর বাঁধ থেকে কোম্পানীগঞ্জ পর্যন্ত এই সাবসেক্টরে অপারেশন চালাত।

ঙ) গোমতীর দক্ষিণে ছিল নির্ভয়পুর সাবসেক্টর : এর অধিনায়ক ছিল ক্যাপ্টেন আকবর ও লেফটেন্যান্ট মেহবুব। এ দলের অপারেশন চলত কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর ও লাকসাম পর্যন্ত।

চ) রাজনগর সাবসেক্টর ছিল সর্বদক্ষিণে : এ সাবসেক্টরের অধিনায়ক ছিল ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, [জাফর ইমাম বীর বিক্রম, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও মন্ত্রী], ক্যাপ্টেন শহীদ [মো. শহিদুল ইসলাম, বীর প্রতীক, পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল] ও লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান। এই সাবসেক্টর বেলুনিয়া, লাকসামের দক্ষিণ এলাকা ও নোয়াখালীতে



কলকাতায় সেক্টর কমান্ডারদের সভায় কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে মেজর খালেদ ও অন্য সেক্টর কমান্ডাররা
ছবি : *মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র* থেকে

অপারেশন চালাত। এই সাবসেক্টরে চতুর্থ বেঙ্গলের 'ব্রাভো' কোম্পানি, ইপিআরের একটি কোম্পানি ও গণবাহিনীর লোক নিয়ে ছিল সদ্য গঠিত এক একটি কোম্পানি।

জুলাই মাসে পাকিস্তানি সেনারা কসবা ও মন্দভাগ পুনর্দখলের প্রস্তুতি নেয় এবং কুটিতে ৩১ বালুচ রেজিমেন্টের বাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনীর সমাবেশ করে। ক্যাপ্টেন গাফফারের অধীনে মন্দভাগ সাবসেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুসেনাদের মোকাবিলার জন্য তৈরি ছিল। জুলাই মাসের ১৯ [কারও কারও মতে ১০ জুলাই] তারিখে শত্রুসেনারা একটি কোম্পানি নিয়ে শালদা নদীতে নৌকাযোগে অগ্রসর হয়। সুবেদার ওহাবের [আবদুল ওয়াহাব, বির বিক্রম, পরে অনারারি ক্যাপ্টেন] নেতৃত্বে মন্দভাগ সাবসেক্টরের একটি প্লাটুন মন্দভাগ বাজারের কাছে শত্রুদের এই অগ্রবর্তী দলটির ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। এ সংঘর্ষে শত্রুসেনারা সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। শালদা নদীর তীর থেকে সুবেদার ওহাবের প্লাটুনটি শত্রুসেনার ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে অন্তত পক্ষে তাদের ৬০ থেকে ৭০ জন লোক

হতাহত হয় এবং অনেকেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারায়। চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের এই আক্রমণে ৩১ বালুচ রেজিমেন্টের অধিনায়ক কর্নেল কাইয়ুম [লেফটেন্যান্ট মাজহারুল কাইয়ুম, ৩৩ বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার], ৫৩তম গোলন্দাজ বাহিনীর কুখ্যাত অফিসার ক্যাপ্টেন বোখারিসহ আরও তিন-চারজন অফিসার এবং ৮-১০ জন জুনিয়ার অফিসার প্রাণ হারায়। [একটি স্পিড বোটে ১২ জন আরোহী ছিল। তাতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাজহারুল কাইয়ুমসহ আরেকজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল, দুজন মেজর, তিনজন ক্যাপ্টেন (একজন বাঙালি ক্যাপ্টেনসহ), একজন সুবেদার মেজর, একজন সেনা, সিভিল পোশাকের একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন ব্যবসায়ী ও স্পিডবোটের চালক ছিল। তাদের সবাই নিহত হয়। ক্যাপ্টেন বোখারির দেহে ৭২টি গুলি লাগে]। ক্যাপ্টেন বোখারি ২৫ মার্চের পর কুমিল্লা শহরে অনেক হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিল। তার মৃত্যুতে কুমিল্লাবাসী অত্যন্ত আনন্দিত হয়। শত্রুসেনারা শালদা নদীতে বিরাট এ বিপর্যয়ের পর তাদের বাহিনীকে পিছু হটিয়ে কুট্টিতে নিয়ে যায়। এবং আমি আমার ঘাঁটি মন্দভাগ ও শালদা নদীতে আরও শক্ত করে তুলি।

ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইন সম্পর্কে জেনারেল [লেফটেন্যান্ট জেনারেল] টিক্কা খান দম্ভ করে ঘোষণা করেছিলেন যে ওটা জুন মাসের মধ্যে খুলবে। তাঁর সেই আশা চিরতরে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পাকিস্তান আমলে এ রেললাইনে ট্রেন চলেনি। ইতিমধ্যে জুলাই মাসে আমি খবর পাই যে পাকিস্তানি বাহিনী বেলুনিয়াতে ঢোকার চেষ্টা করছে। আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে নির্দেশ দিই, যেন তাদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এ সময় ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ছাগলনাইয়ায় পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। পাকিস্তানি বাহিনী ছাগলনাইয়ার ওপর ফেনীর দিক থেকে চট্টগ্রাম সড়কের ওপর আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে তাদের ২০ থেকে ২৫ জন লোক হতাহত হয়। শত্রুসেনারা পিছু হটে যায়। কিন্তু তার কয়েক দিন পরে পাকিস্তানি সেনারা ছাগলনাইয়ার দক্ষিণ দিক থেকে ফেনী-চট্টগ্রাম পুরোনো সড়ক ধরে অগ্রসর হয় এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের সেনাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আমাদের কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হওয়ায় এবং শত্রুদের গোলার মুখে টিকতে না পেরে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমার কাছে পরবর্তী কর্মপন্থার নির্দেশ চেয়ে পাঠায়। আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে তার সেনাদের ছাগলনাইয়া থেকে সরিয়ে বেলুনিয়া সাবসেক্টরের রাজনগরে আনার জন্য বলি। আমাদের এই পদক্ষেপে বেলুনিয়াতে অবস্থিত শত্রুসেনারা ঘেরাও

হওয়ার আতঙ্কে বেলুনিয়া থেকে ফেনীতে পশ্চাদপসরণ করে এবং ফেনীতে তাদের প্রধান ঘাঁটি গড়ে তোলে। বেলুনিয়া শত্রুমুক্ত হওয়ায় আমি বেলুনিয়াকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত রাখার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিই। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম এবং লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামানকে তাদের নিজ নিজ কোম্পানি নিয়ে বান্দুয়ায় (ফেনী থেকে সাত মাইল উত্তরে) প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করার জন্য নির্দেশ দিই। বান্দুয়াতে সম্মুখবর্তী অবস্থান গড়ার লক্ষ্যে মুন্সিরহাটে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের অধীনে আমার সেনাদল বেশ মজবুত প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। বেলুনিয়া একটি ১৭ মাইল লম্বা এবং ১৬ মাইল চওড়া বাল্‌জ। এই বেলুনিয়ায় আমরা যে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গড়ে তুলি, সে প্রতিরক্ষাবূহ্যকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানি সেনারা এর পর থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে এ এলাকায় অনেক যুদ্ধে পাকিস্তানিদের বিপুল সেনা হতাহত হয়। এবং তাদের ক্ষয়ক্ষতিও হয় ব্যাপক। বেলুনিয়া পাকিস্তানি সেনাদের জন্য বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায়।

এখানকার জনসাধারণের দুঃখকষ্ট, এক কথায় বর্ণনাতীত। পাকিস্তানি বাহিনীর গোলার আঘাতে প্রতিটি বাড়ি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং অনেক নিরীহ লোক মারা যায়। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ কোনো দিনও তাদের মনোবল হারায়নি। যুদ্ধ যত দিন চলেছে, তত দিনই তারা মুক্তিবাহিনীর অসামরিক ব্যবস্থাপনাগত কাজে হাসিমুখে সাহায্য করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রক্ষাব্যূহকে শক্তিশালী করার জন্য পরিখা খননে ও অন্যান্য কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করেছে। মে মাসে আমাদের মুন্সিরহাট ডিফেন্স ও বান্দুয়ার অবস্থানটি বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জায়গাটি আমরা বিশেষ কারণে প্রতিরক্ষা ঘাঁটির জন্য মনোনীত করেছিলাম। ওই জায়গার সামনে কতগুলো প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন ছিল, যেগুলি শত্রুসেনার অগ্রসর হওয়ার পথে বিরাট বাধাস্বরূপ ছিল। এতে শত্রুসেনাদের নাজেহাল করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। আমাদের অবস্থানটি মুহুরী নদীর পাশ ঘেঁষে পশ্চিম দিক থেকে ছিলোনিয়া নদীকে ছাড়িয়ে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্যূহটি কমপক্ষে চার মাইল চওড়া ছিল। অবস্থানটির পরিকল্পনা আমরা এমনভাবে করেছিলাম যে শত্রুসেনারা আমাদের ঘাঁটি আক্রমণ করতে চাইলে ওই প্রতিরক্ষা-অবস্থানের সামনে দিয়ে আসা ছাড়া তাদের আর কোনো রাস্তা খোলা ছিল না। পরবর্তীকালে আমাদের এ পরিকল্পনা ঠিকই কাজে লেগেছিল। শত্রুরা যেখান দিয়েই আসার চেষ্টা করেছে, আসতে গিয়ে আমাদের সেনাদের গোলাগুলির আঘাতে তাদের অহরহ হতাহত হতে হয়েছে। এসব সেক্টরে

প্রথমে আমাদের সেনাসংখ্যা ছিল দুই কোম্পানি (৩০০ জনের মতো) এবং কিছুসংখ্যক গণবাহিনী। শত্রুসংখ্যা আমাদের চেয়ে সব সময় বেশি ছিল। এ ছাড়া শত্রুদের ছিল শক্তিশালী অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিমানবাহিনী ও ট্যাংক। আমাদের মুন্সিরহাটে প্রধান ঘাঁটি সম্পর্কে শত্রুদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য বান্দুয়া রেলস্টেশনের কাছে ছিলোনিয়া নদীর ওপর একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপনের নির্দেশ দিই। এটা ছিল একটি ডিলেয়িং পজিশন। এ পজিশনের সামনে রাস্তা ও রেলেসেতুগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যাতে শত্রুদের অগ্রসর হওয়ার পথে আরও বাধার সৃষ্টি হয়। শত্রুসেনার সম্ভাব্য অগ্রসর হওয়ার রাস্তার পশ্চিম ও পূর্ব পাশে রাস্তার দিকে মুখ করে আমরা বেশ কতগুলো উঁচু ঢিবি ও মজবুত বাংকার তৈরি করি এবং ওই দুটি অবস্থানকে লাইট মেশিনগান ও মেশিনগানে সজ্জিত করি। এটা একধরনের ফাঁদ, যার ভেতরে ঢুকলে দুই পাশ থেকে বর্ষণ করা গুলিতে শত্রুসেনাদের ফিরে যাওয়ার উপায় থাকে না। এসব বাংকার এমনভাবে লুকানো ছিল যে সামনে থেকে বোঝার কোনো উপায়ই ছিল না।

৭ জুন, সকাল। আমরা জানতে পারলাম, শত্রুসেনারা ফেনী থেকে বেলুনিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সকাল ১০টার দিকে বান্দুয়ার আশপাশে শত্রুসেনারা এসে জমা হতে লাগল এবং প্রথমবারের মতো আমাদের পজিশনের ওপর গোলাগুলি চালাতে লাগল। আমার নির্দেশ ছিল যে শত্রুদের এই গোলাগুলির কোনো জবাব যেন দেওয়া না হয়। শত্রুসেনারা বান্দুয়া সেতুর ওপর একটি বাঁশের পুল নির্মাণ করে যখন পার হওয়ার চেষ্টা করছিল, ঠিক সে সময় আমাদের অগ্রবর্তী ডিলেয়িং পজিশনের বীর সৈনিকেরা তাদের ওপর গুলি চালায়। এতে প্রথম সারিতে যেসব শত্রুসেনা সেতু অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিল, তাদের সবাই গুলি খেয়ে পানিতে পড়ে যায়। এ পর্যায়ে শত্রুসেনাদের অন্তত ৪০-৫০ জন হতাহত হয়। এরপর শত্রুসেনারা পিছু হটে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় তীব্র আক্রমণ চালায়। আমাদের ডিলেয়িং পজিশনের সেনারা শত্রুদের বহুসংখ্যক সেনা হতাহত করে বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। কিন্তু আক্রমণ যখন আরও তীব্র রূপ ধারণ করে, ডিলেয়িং পজিশনকে তারা ত্যাগ করে প্রধান ঘাঁটি মুন্সিরহাটের দিকে পিছু হটে আসে।

শত্রুরা কিছুটা সফলতা লাভ করায় আরও প্রবল বেগে সামনের দিকে এগোতে থাকে এবং ছিলোনিয়া নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এখানে এসে তারা নদী পার হওয়ার সব প্রস্তুতি নেয়। আমাদের প্রধান ঘাঁটি থেকে ৮০০ গজ

সামনে আনন্দপুর গ্রামে শত্রুসেনারা তাদের সমাবেশ ঘটাতে থাকে। নদী পার হয়ে আমাদের আক্রমণ করার জন্য তারা সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। নদী পার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে কামানের সাহায্যে আমাদের ঘাঁটির ওপর তারা প্রবল আক্রমণ শুরু করে। তারা বৃষ্টির মতো গোলা ছুড়ছিল। এই আকস্মিক আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্য আমরা ভালোভাবেই বুঝতে পারছিলাম। এ সুযোগে পাকিস্তানি সেনারা নৌকা ও বাঁশের পুলের সাহায্যে নদীর পরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। শত্রুদের কামানের গোলায় যথেষ্ট বিপর্যস্ত ছিলাম, তবু মানসিক দিক দিয়ে আমাদের সেনাদের মনোবল ছিল খুবই অটুট। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের বহু সেনা নদী পার হয়ে আমাদের অবস্থানের ২০০-৩০০ গজের মধ্যে চলে আসে এবং কিছুসংখ্যক তখনো নদী পার হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় আমাদের মর্টার ও মেশিনগানগুলো গর্জে ওঠে। আমাদের এ অকস্মাৎ হামলায় শত্রুসেনাদের অনেকেই হতাহত হয়। তারা বাধাবিপত্তি ডিঙিয়ে প্রবল বেগে অগ্রসর হতে থাকে। এর পরও আমাদের সেনারা তাদের ওপর হামলা অব্যাহত রেখে তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে । কিন্তু ও রকম খারাপ অবস্থাতেও তারা দক্ষতার সঙ্গে অগ্রসর হয়। কিন্তু আল্লাহ হয়তো তাদের সহায় ছিলেন না।

এ সময় তারা আমাদের সামনের মাইন ফিল্ডের বৃত্তে এসে পড়ে। তাদের পায়ের চাপে একটির পর একটি মাইন ফাটতে আরম্ভ করে। আমাদের চোখের সামনে অনেক শত্রুসেনা তুলার মতো উড়ে যেতে থাকে। সেই সঙ্গে আমাদের গোপনে মেশিনগানগুলো থেকে নিক্ষিপ্ত বৃষ্টির মতো গুলি আর মাইনের আঘাত তাদের মধ্যে একটি ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কয়েকজন শত্রুসেনা এসব বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আমাদের কয়েকটি অগ্রবর্তী বাংকারের সামনে পর্যন্ত পৌঁছায়, কিন্তু আমাদের সৈনিকেরা গ্রেনেড হাতে তাদের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং তারা সেখানেই আমাদের গ্রেনেডের আঘাতে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে শত্রুসেনারা আর সামনে এগোনোর সাহস পায়নি। যারা পেছনে ছিল তারাও এই সংকটজনক অবস্থা এবং ভয়াবহতা বুঝতে পেরে পেছন দিকে পালাতে শুরু করে। শত্রুসেনাদের পালাতে দেখে আমাদের সেনারাও উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে এবং আরও প্রবল উৎসাহে তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। আমাদের মর্টারও পশ্চাদপসরণরত শত্রুদের ওপর অনবরত আক্রমণ চালিয়ে তাদের হতাহত করতে থাকে। ওদের খুব কম সেনাই আমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে ছিলোনিয়া নদীর অপর পারে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ সময়

আমাদের ওপর শত্রুসেনারা অনবরত কামানের গোলা চালিয়ে যাচ্ছিল, যাতে তাদের বিপর্যস্ত অবশিষ্ট সেনারা নিরাপদে পেছনের ঘাঁটি আনন্দপুরে পৌঁছাতে পারে। এর কিছুক্ষণ পরে অর্থাৎ বেলা দুইটার সময় তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে একটি নীরবতা নেমে আসে। আমরা কিছুক্ষণ আবার তাদের পুনরাক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি, কিন্তু পরে জানতে পারি যে তাদের অবস্থা সত্যি বিপর্যস্ত এবং তাদের মনোবল একেবারেই ভেঙে গেছে। পুনরাক্রমণের শক্তি আর তাদের নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অন্তত পক্ষে ৩০০ জনের মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং ছিলোনিয়া নদীতে কত লাশ ভেসে গেছে তার হিসাব আমরা পাইনি। পরে জানতে পারি যে পাকিস্তানিরা একটি ব্যাটালিয়নের চেয়েও বেশি সেনাদল নিয়ে এই আক্রমণ চালিয়েছিল এবং ব্যাটালিয়নটির ৬০ ভাগের মতো লোক নিহত বা আহত হয়েছে। ফেনীতে এখনো তাদের অনেকের কবর আছে।

এর পর থেকে শত্রুসেনারা আনন্দপুরে স্থায়ী ঘাঁটি করার জন্য বাংকার খোঁড়ার কাজ শুরু করে দেয়। আস্তে আস্তে তাদের সেনাসংখ্যাও অনেক বেড়ে যেতে থাকে। আমরা খবর পেলাম, ওরা চট্টগ্রাম ও ঢাকা থেকে বিপুল অস্ত্র ও নতুন সেনা এনে সমাবেশ করছে। সেই সঙ্গে প্রচুর কামান ও ট্যাংকও তারা নিয়ে এসেছে। ৭ জুনের বেলুনিয়া যুদ্ধের পর তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও হতাহতের সংখ্যা দেখে পাকিস্তানিরা বুঝতে পেরেছিল যে আমরা এই জায়গায় তাদের সঙ্গে আবার সম্মুখসমরের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সে জন্য আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের আমি ফাঁদে ফেলার জন্য তৈরি ছিলাম। পাকিস্তানি সেনারা আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হয়ে সে ফাঁদে পা দিয়ে যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। সে কারণে ভবিষ্যতে তারা যা-ই করুক, খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

বেলুনিয়ার বিপর্যয় পাকিস্তানি সেনাদের সবাইকে বিচলিত করে তোলে। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, যেকোনো উপায়ে হোক বেলুনিয়া পুনর্দখল করতেই হবে। তাই তাদের সেনাসমাবেশ চলতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান স্বয়ং জুলাই মাসে ফেনীতে আসেন বেলুনিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ ও তা পরিচালনার জন্য। আমি আমার প্রতিরক্ষাগত অবস্থান আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করি। মন্দভাগ থেকে ক্যাপ্টেন গাফফারকে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'চার্লি' কোম্পানি এবং কিছু মর্টারসহ বেলুনিয়া সেক্টরে গিয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার নির্দেশ দিই। যেহেতু আমার কাছে আর কোনো সেনা ছিল না, তাই

আমি এই তিন কোম্পানি সেনার সাহায্যে জাফর ইমামকে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি থাকার নির্দেশ দিই। শত্রুরা আমাদের প্রতিরক্ষা থেকে মাত্র ৮০০ গজ দূরে গতিয়ানালার অপর পারে তাদের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল। উভয় পক্ষে, অনবরত গুলিগোলা বিনিময় হতো, আর তা ছাড়া শত্রুদের গোলন্দাজ বাহিনী আমাদের ঘাঁটির ওপর অবিরাম শেলিং চালিয়ে যেত। আমাদের সেনাদের বাংকার ছেড়ে বাইরে চলাফেরার উপায় ছিল না। কিন্তু শত্রুপক্ষের এই গোলাগুলি এবং আর্টিলারি ফায়ারিংয়ের মধ্যেও আমাদের বীর বঙ্গশার্দুলরা তাদের মনোবল হারায়নি এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা এই গোলাগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রে গান-বাজনার মতো মনে করত। মাঝে মাঝে আমাদের সেনারা পরিত্যক্ত গ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের অনেককে হতাহত করত এবং অনেক সময় ১০৬ মিলিমিটার ট্যাংকবিধ্বংসী কামানের সাহায্যে তাদের বাংকার উড়িয়ে দিয়ে আসত। এসব আকস্মিক আক্রমণে শত্রুরা বেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ত এবং তাদের মধ্যে হতাহতের ঘটনাও ঘটত যথেষ্ট পরিমাণে। তার পরই তারা শুরু করত গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে অবিরাম বৃষ্টির মতো গোলাগুলি। জুন মাসের ১৭ তারিখ পর্যন্ত এভাবেই চলল।

পাকিস্তানিদের এবারের যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখে ওই এলাকার জনমনে যথেষ্ট ত্রাসের সৃষ্টি হয়। প্রথমবারের আক্রমণে জনসাধারণের তেমন বেশি ক্ষতি হয়নি, কেননা তখন শত্রুসেনারা আমাদের হাতে পর্যুদস্ত হচ্ছিল। যুদ্ধের বিভীষিকা তারা সেবারই প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর এবারের প্রস্তুতির খবরে তারা একটা ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়ে। সময়টা ছিল ভরবর্ষার মৌসুম। সব জায়গায় ছিল পানি। পানি ভেঙে ছেলেমেয়ে নিয়ে শত্রুদের অকস্মাৎ আক্রমণের মুখে গ্রামবাসীর পক্ষে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এ জন্য আমরা স্থানীয় লোকদের নির্দেশ দিই, যাতে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আগেই দূরে সরে যায় বা সরে যেতে পারে। কেউ স্বেচ্ছায় আর কেউ-বা নিরুপায় হয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নিজেদের বাড়িতে থেকে যায়। আমাদের সেনারা তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহকে শক্তিশালী করতে থাকে। যেসব জায়গা দিয়ে শত্রুপক্ষের আমাদের অবস্থানের ভেতরে ঢোকার আশঙ্কা ছিল, আমরা সেসব জায়গায় মাইন পুঁততে থাকি। ২১ জুন রাত আটটায় শত্রুরা হঠাৎ করেই আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। প্রায় আধঘণ্টা পর তিনটি হেলিকপ্টার আমাদের অবস্থানের পাশ দিয়ে পেছনের দিকে চলে যায়। তখন চারদিক অন্ধকার ছিল

এবং গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। হেলিকপ্টারগুলো আমাদের অবস্থানের পশ্চাদভাগে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সেনারা বুঝতে পেরেছিল যে শত্রুসেনারা প্রতিরক্ষাব্যূহের পেছন দিকে ছত্রীবাহিনী নামিয়েছে। আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলো থেকেও খবর আসতে লাগল যে শত্রুরা মুহুরী ও ছিলোনিয়া নদীর পাড় দিয়ে এগিয়ে আসছে। ট্যাংকও আছে তাদের সঙ্গে। তাদের অবস্থানের সামনে বিপুলসংখ্যক সেনা। এই অবস্থায় শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছি আমরা। অন্যদিকে তাদের ছত্রীবাহিনী আমাদের সেনাদের পেছন থেকে ঘিরে ফেলার জন্যও প্রস্তুত। এ রকম একটি সংকটময় অবস্থাতেও ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, ক্যাপ্টেন গাফফার, লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান ও ক্যাপ্টেন শহীদের নেতৃত্বে সামান্য সামরিক শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের জন্য আমাদের সেনাদের মনোবল ছিল অটুট। আমার সব অফিসার ওই চরম মুহূর্তে তাদের সাহস এবং দৃঢ়প্রত্যয়ের পরিচয় দিয়েছিল।

রাত তখন সাড়ে নয়টা। বৃষ্টি বেশ একটু জোরালো হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই শত্রুরা তাদের অগ্রগমন অব্যাহত রেখেছে। এ সময় ক্যাপ্টেন গাফফারের অবস্থানের পেছন থেকে শত্রুরা হামলা চালায়। ক্যাপ্টেন গাফফার ও তার সেনারা বীরত্বের সঙ্গে শত্রুসেনাদের হামলার মোকাবিলা করে চলে। প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষ তাদের বেশ কিছু হতাহত সেনা সদস্যকে ফেলে ক্যাপ্টেন গাফফারের অবস্থান থেকে বিতাড়িত হয়। এ সময় ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের কোম্পানির ওপরও শত্রুরা আক্রমণ চালায়। তাদের ট্যাংকগুলোও আস্তে আস্তে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে আসছিল। সেই সঙ্গে তাদের কামানের গুলিও আমাদের অবস্থানের ওপর এসে পড়ছিল। লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান, যাঁর কোম্পানি সবচেয়ে বাঁয়ে ছিল, সেখানেও শত্রুরা আস্তে আস্তে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমাকে এ পরিস্থিতির কথা জানায়। আমি বুঝতে পারলাম যে শত্রুসেনারা ডানে, বাঁয়ে এবং হেলিকপ্টারের সাহায্যে আমার প্রতিরক্ষাব্যূহের পেছন দিকেও অবস্থান নিয়েছে এবং আস্তে আস্তে আমার সব ট্রুপসকে ঘিরে ফেলার মতলব এঁটেছে। শত্রুদের চাপ আস্তে আস্তে বেড়েই চলছিল। উভয় পক্ষেরই হতাহতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে ক্রমেই। তাদের অনেকেই আমাদের মাইন ফিল্ডের আওতায় পড়ে গিয়ে প্রাণ হারালেও সাহসে বুক বেঁধে তারা অগ্রসর হচ্ছিল। ইতিমধ্যে আমার পাঁচজন লোক নিহত ও ৩৫ জন আহত হয়। এই অন্ধকারে সমগ্র অবস্থান জুড়ে চলছিল মুখোমুখি হাতাহাতি যুদ্ধ। শত্রুপক্ষের

ক্ষয়ক্ষতি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি হলেও আমাদের পক্ষেও হতাহতের সংখ্যা কম ছিল না। সংখ্যাটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ৩০ থেকে ৪০ জনে। এক অর্থে এই সংখ্যাটা ছিল খুবই ভয়াবহ। তা ছাড়া আমার সেনাসংখ্যা ছিল অনেক কম আর অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়েও আমরা তাদের চেয়ে অনেক দুর্বল। আমি বুঝতে পারলাম, সকাল পর্যন্ত তারা যদি আমাকে এভাবে ঘিরে রাখতে পারে, তাহলে তারা দিনের আলোতে বিপুল শক্তি নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং ট্যাংক ও কামানের গোলায় আমার সেনাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলবে।

রাতের অন্ধকারে তাদের ট্যাংক ও কামানের গোলা আমাদের ওপর কার্যকর হয়নি। কিন্তু দিনের আলোতে এসব অস্ত্র আমার অবস্থানের জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে বর্তমান অবস্থান থেকে ডানে বা বাঁয়ে সরে গিয়ে শত্রুদের এড়িয়ে পেছনে এসে চিথলিয়ায় নতুন প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করার নির্দেশ দিই। এ নির্দেশ অনুযায়ী রাত একটায় ক্যাপ্টেন জাফর, ক্যাপ্টেন শহীদ ও ক্যাপ্টেন গাফফার তাদের নিজ নিজ দল নিয়ে শত্রুদের এড়িয়ে চিথলিয়াতে নতুন প্রতিরক্ষা অবস্থানে পৌঁছায়। পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে নতুন অবস্থান তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। পরদিন সকাল নয়টা কি ১০টা হবে। আমি নিজেও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলাম লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান ও তার দলটির না পৌঁছানোর জন্য। যখন প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি হচ্ছিল, তখন আমি তিন-চারজন সেপাইকে সঙ্গে নিয়ে শত্রুদের সম্পর্কে জানার জন্য এগিয়ে যেতে থাকি। চিথলিয়া থেকে বেশ কিছুটা আগে মুন্সিরহাটের কাছে গিয়ে দেখতে পাই যে শত্রুরা সকালের মধ্যে মুন্সিরহাট রেলস্টেশন পর্যন্ত দখল করে নিয়েছে এবং এর আগে আর অগ্রসর হওয়ার সাহস করেনি। তারা ভেবেছিল, আমাদের পেছনের পজিশনগুলো হয়তো এখনো অক্ষুণ্ন আছে। আমরা যে রাতের মধ্যেই এসব ঘাঁটি ছেড়ে চিথলিয়ায় নতুন ব্যূহ রচনা করেছি, এ সম্পর্কে তারা সকাল ১০টা পর্যন্ত জানতে পারেনি। তারা খুব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিল। আমি প্রায় দুপুর একটা পর্যন্ত আমার রেকি ও অনুসন্ধান শেষ করে চিথলিয়ায় ফেরত আসি, ঠিক সেই মুহূর্তে শত্রুদের তিন-চারটি হেলিকপ্টার উড়ে আসে এবং আমাদের অবস্থানের ৭০০-৮০০ গজ ডানে রেললাইনের উঁচু বাঁধের পেছনে অবতরণ করে। এ ছাড়া আরও দুটি হেলিকপ্টার আসে, যেগুলো আমাদের বাঁয়ে আধা মাইল দূরে একটি পুকুরের বাঁধের পেছনে অবতরণ করে। এর পরপরই সেদিক থেকে ভয়ংকর গোলাগুলির আওয়াজ

শুনতে পাই। আমি বুঝতে পারলাম, শত্রুরা আমার বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। আমাদের প্রতিরক্ষা-অবস্থান তৈরির কাজ তখনো একেবারেই প্রাথমিক অবস্থায়। এ সময় ছিল আমার জীবনের এক চরম মুহূর্ত। বাঁ থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আরও প্রচণ্ডতর হচ্ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্যাপ্টেন জাফর ও ক্যাপ্টেন গাফফারকে এখনই এ মুহূর্তে তাদের নিজ নিজ কোম্পানি নিয়ে বর্তমান অবস্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিই। আমি ও আমার সব সেনা সহযোদ্ধা অবস্থান ত্যাগ করার আধা ঘণ্টার মধ্যেই শত্রুরা সেদিন আক্রমণ চালিয়েছিল।

এবারও শত্রুসেনারা অল্পের জন্য আমাকে এবং আমার সেনাদলকে ধরার সুবর্ণ সুযোগ হারিয়ে ফেলে। হয়তো বা এ ছিল পরম করুণাময় আল্লাহর আশীর্বাদ। আমি পরে জানতে পারি, আমার অবস্থানের বাঁ থেকে যে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম, তা ছিল লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামানের অধীন সেনাদের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের সংঘর্ষ। পাকিস্তানি সেনারা যখন হেলিকপ্টারযোগে বাঁয়ে অবতরণ করছিল, সে সময় লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামানের সেনাদলের সামনে তারা পড়ে যায়। এতে তাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান শত্রুদের প্রচণ্ড আঘাত হেনে পরে বাঁ দিক দিয়ে পেছনে হটে আসে এবং আমার সঙ্গে মিলিত হয়। আমি অবস্থান ত্যাগ করলেও এবং পাকিস্তানি বাহিনী আবার বেলুনিয়া পুনর্দখল করে নিলেও শত্রুপক্ষের যত সংখ্যক সেনা হতাহত হয়, তা ছিল সত্যিই অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতিরই নামান্তর। আমাদের পশ্চাদপসরণ ছিল একটি রণকৌশলেরই অংশ। আমাদের সেনা, অস্ত্র, গোলাবারুদ সবকিছুই ছিল অপর্যাপ্ত। সে তুলনায় শত্রুপক্ষের শক্তি ছিল বিপুল। আমার তখনকার যুদ্ধের নীতি ও কৌশলই ছিল শত্রুদের ওপর অতর্কিতে আঘাত হানা বা তাদের প্রলোভন দেখিয়ে আমাদের মনোনীত জায়গায় অগ্রসর হতে প্রলুব্ধ করা এবং তাদের পর্যুদস্ত ও ধ্বংস করা—শত্রুদের এভাবে ব্যতিব্যস্ত রেখে আস্তে আস্তে নিজেদের শক্তি আরও বাড়িয়ে তোলা এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করা। অঙ্কুরেই ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সব সংঘর্ষেই আমি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে অতর্কিতে আঘাত হানতাম। আবার যখন আমাদের নিজেদের যথেষ্ট ক্ষতি হতো, তখন হঠাৎ করেই সংঘর্ষ এড়িয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতাম। এতে শত্রুরা আরও মরিয়া হয়ে উঠত এবং পাগলের মতো আমার নতুন অবস্থানে এসে আঘাত হানত। বারবারই এ-জাতীয় রণকৌশলের পুনরাবৃত্তি করতে হতো।

যে সময় বেলুনিয়ায় সম্মুখযুদ্ধ চলছিল, ঠিক সে সময় আমি শত্রুর পেছনের এলাকায় আঘাত হানার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। আমার হেডকোয়ার্টারসে অন্ততপক্ষে ৪ হাজার গেরিলা সে সময় প্রশিক্ষণরত ছিল। এদের আমি বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে বিশেষ বিশেষ ধরনের গেরিলাযুদ্ধের পদ্ধতিতে শিক্ষা দিচ্ছিলাম। একটি দলকে বিস্ফোরক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলাম—যাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে যত রাস্তা ও রেলসেতু আছে, সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা, যাতে শত্রুরা অনায়াসে যাতায়াত করতে না পারে এবং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে পাকিস্তানি সেনাদল তাদের রেশন ঠিকমতো পৌঁছাতে না পারে। এ ছাড়া দলটির দায়িত্বের মধ্যে ছিল কিছু মনোনীত শিল্পকারখানা সাময়িকভাবে অকেজো করে দেওয়া। বিশেষ করে সেইসব শিল্প, যাদের তৈরি মাল পাকিস্তানি বাহিনী বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এসব শিল্পকারখানা অকেজো করার সময় আমাকে অনেক সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করতে হয়েছে। কেননা সব শিল্পই আমাদের দেশের সম্পদ এবং এগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেললে পরবর্তীকালে অর্থাৎ স্বাধীনতার পর আমাদের নিজেদেরই আবার সংকটের সম্মুখীন হতে হবে। ফলে প্রতিটি টার্গেট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সেগুলো সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করতে হতো এবং তার পরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতাম। ধ্বংস না করে শিল্পকারখানাগুলোকে পুরোপুরি সাময়িক অকেজো করার এক অভিনব পদ্ধতি আমি খুঁজে পাই। আমার সেক্টরের বেশির ভাগ শিল্পকারখানা ঢাকার চারপাশে অর্থাৎ ঘোড়াশাল ও নরসিংদীতে অবস্থিত ছিল। আমি জানতে পারি যে এসব শিল্পের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি সাধারণত সাহাজীবাজার পাওয়ার হাউস ও কাপ্তাই থেকে পাওয়ার লাইনের মাধ্যমে আসে। আমি আমার গেরিলাদের প্রথম টার্গেট দিই ওইসব পাওয়ার লাইন উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। প্রতি সপ্তাহে ২০টি টিম বিভিন্ন এলাকায় পাওয়ার লাইনের পাইলন ধ্বংস করতে থাকে। এর ফলে শিল্প এলাকাগুলোতে প্রায় ৭৫ শতাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পাকিস্তানি বাহিনী নিরুপায় হয়ে প্রতিটি লাইনের নিচে অ্যান্টি-পার্সোনেল মাইন পুঁতে রাখত, যাতে আমার লোকজন পাইলনের কাছে যেতে না পারে।

এরপর তারা সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউস থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে শুরু করে। আমি যখন এ খবর জানতে পারি, তখন সিদ্ধিরগঞ্জের সরবরাহ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ যাতে না যেতে পারে তার পরিকল্পনা করতে থাকি। আমার হেডকোয়ার্টারস থেকে তিনটি দলকে ঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ-পদ্ধতি সম্পর্কে

সব তথ্য আনার জন্য পাঠাই। এক সপ্তাহের মধ্যে তারা পুঙ্খানুঙ্খভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে আমাকে বিস্তারিত তথ্য জানায়। তারা আরও জানায়, পাকিস্তানি বাহিনীর একটি শক্তিশালী দল ট্যাংকসহ সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে তাদের আস্তানা গেড়েছে। চারদিকে বাংকার প্রস্তুত করে সে জায়গাটিকে পাহারা তারা দিচ্ছে। কেন্দ্রটি অকেজো করতে হলে একটি বিরাট যুদ্ধের পর সেটিকে দখল করতে হবে। শত্রুঘাঁটি যতটা শক্তিশালী, তাতে করে আমরা সফল হতে পারি, আবার নাও হতে পারি। আর তা ছাড়া আমিও প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রটি সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম না। আমি এসব ভেবে অন্য পন্থা অবলম্বন করার জন্য চিন্তা করতে থাকি।

এ সময় ওয়াপদার একজন ইঞ্জিনিয়ার আমার ক্যাম্পে আসেন। তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমার যে অনুসন্ধান দলটি খবরাখবর এনেছিল, তারা আসার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের একটি নকশা ওয়াপদার প্রধান দপ্তর থেকে চুরি করে এনেছিল। আমি ইঞ্জিনিয়ার জনাব ভূঁইয়াকে [মমিনুল হক ভূঁইয়া বীর প্রতীক, পরে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী] এই নকশা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের একটি হুবহু পূর্ণ মডেল আমার হেডকোয়ার্টারসের জন্য তৈরি করার নির্দেশ দিই। ইঞ্জিনিয়ার ভূঁইয়া আমার নির্দেশ অনুযায়ী ঢাকা, টঙ্গী, ঘোড়াশাল ও নারায়ণগঞ্জের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল তৈরি করেন। সে মডেলের ওপর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে আলোচনাকালে আমি বুঝতে পারি যে ঢাকায় মোট নয়টি জায়গায় (পোস্তগোলা, ডেমরা, হাটখোলা জংশন, খিলগাঁও, মতিঝিল, ধানমন্ডি, শাহবাগ, কমলাপুর, উলন) গ্রিড সাবস্টেশন আছে এবং এগুলো যদি আমরা অকেজো করে দিতে পারি, তাহলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। এও বুঝতে পারি যে বিদ্যুৎ সরবরাহ সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে মোটামুটি তিনটি লাইনে আসে এবং যদি সবগুলো সাবস্টেশন একসঙ্গে অকেজো করে না দেওয়া যায়, তাহলে বিদ্যুৎ অন্য পথ দিয়ে চলবে। ঢাকা ও শিল্প এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ অকেজো করে দেওয়ার জন্য আমি জুলাই মাস থেকে ১৬টি দলকে প্রশিক্ষণ দিতে থাকি। এসব দলে ৮ থেকে ১০ জন গেরিলাকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিই, যাতে তারা সাবস্টেশনগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি খুব কম সময়ের মধ্যে চিনে নিতে পারে এবং সেগুলো অনায়াসে ধ্বংস বা অকেজো করে দিতে পারে। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয়, যাতে তারা এ কাজে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করে। দুই মাস প্রশিক্ষণের পর এসব দলকে আমার হেডকোয়ার্টারসের মডেলের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ

রিহার্সালের বন্দোবস্ত করি, যাতে প্রতিটি দলের প্রত্যেক ব্যক্তির তার কাজ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ না থাকে। নিজ নিজ কাজ যাতে সক্রিয়ভাবে তারা সম্পন্ন করতে পারে, সে কারণেই এ ব্যবস্থা করা হয়।

এসব দলকে আমি কসবার উত্তরে আমাদের যে গোপন প্রবেশপথ ছিল, সে পথেই ঢাকায় পাঠাই। দলগুলো নবীনগর এবং রূপগঞ্জ হয়ে নদীপথে ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে প্রথম তাদের রেকি (অনুসন্ধান) সম্পন্ন করে। অনুসন্ধানের পর জানতে পারে যে কতগুলো সাবস্টেশনে পাকিস্তানিরা ছোট ছোট দলে তাদের সেনাদের বিভক্ত করে পাহারার বন্দোবস্ত করেছে। আবার কোনো কোনোটি পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ কিংবা স্থানীয় রাজাকারদের দিয়ে বন্দোবস্ত করেছে পাহারার। দলগুলো তাদের সব সরঞ্জাম ও অস্ত্র ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রেখে চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে খবর পাঠায় এবং আমার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। আমি বুঝতে পারলাম, কোনো কোনো জায়গায় ছোট ছোট পাহারার বন্দোবস্ত করা হলেও এগুলো ধ্বংস করার সুযোগ এখনই। এরপর হয়তো পাহারা আরও সুদৃঢ় হওয়ার আশঙ্কা আছে। সে জন্য আর কালবিলম্ব না করে সবগুলো পাওয়ার সাবস্টেশন একযোগে অতিসত্বর ধ্বংস বা অকেজো করার নির্দেশ পাঠাই। আমার নির্দেশ পাওয়ার পর সব দলই নিজ নিজ কমান্ডারদের নেতৃত্বে একযোগে জুন মাসের ২৭ তারিখ রাতে হঠাৎ করেই তাদের আক্রমণ চালায়। তারা এসব আক্রমণে ধানমন্ডি, শাহবাগ, পোস্তগোলা, উলন, মতিঝিল, ডেমরা প্রভৃতি সাবস্টেশন পুরোপুরি ধ্বংস বা সাময়িকভাবে অকেজো করে দিতে সক্ষম হয়। আক্রমণের সময় আমার লোকদের সঙ্গে অনেক জায়গায় পাকিস্তানি সেনাদের সংঘর্ষ হয়; বিশেষ করে, ধানমন্ডি সাবস্টেশনে। দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিল রুমী [শহীদ মো. শাফি ইমাম রুমী, বীর বিক্রম]। সে একাই স্টেনগান হাতে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর হামলা চালায় এবং সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলে। তার অসীম সাহসিকতার ফলে দলের অন্য সদস্যরাও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং পাকিস্তানি সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সাবস্টেশনটি ধ্বংস করে দেয়। এরূপ সংঘর্ষ শাহবাগ ও ডেমরাতেও ঘটে। বাকি জায়গাগুলোয় আমার লোকেরা এমনই অকস্মাৎভাবে সাবস্টেশনগুলোর ভেতর ঢুকে পড়ে যে পাকিস্তানি সেনা বা পুলিশ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের হাতে বন্দী বা নিহত হয়। এ অপারেশনে আমরা অন্তত শতকরা ৭৫ ভাগ সফলতা লাভ করি। ঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ ২৪ ঘণ্টার জন্য সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়। অবশ্য পাকিস্তানিরা বিমানযোগে সাবস্টেশনের যন্ত্রপাতি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসে এবং

সরবরাহ ব্যবস্থাপ কিছুটা পুনরুদ্ধার করে। তবু শিল্প এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ চিরতরে কমে যায়। এতে পাটকলগুলো চালানোর চেষ্টা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়।

এ সময় আমি আরও জানতে পারি, প্রিন্স সদরুদ্দিন জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ঢাকায় আসছেন সরেজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য। লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান সে সময় প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন প্রিন্স সদরুদ্দিনকে বাংলাদেশের অবস্থা স্বাভাবিক দেখানোর জন্য। আমি তাঁর এই চেষ্টাকে বানচাল করার জন্য আরও পাঁচটি দল তৈরি করি। তাদের কাজ ছিল ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো এবং অবস্থা যে স্বাভাবিক নেই, সে সম্পর্কে প্রিন্স সদরুদ্দিনকে বুঝিয়ে দেওয়া। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রিন্স সদরুদ্দিনের অবস্থানকালে দলগুলো ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটায়। সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ ঘটানো হয় মতিঝিলে। দুই গেরিলা আলম [বদিউল আলম] ও সাদেক [মাসুক সাদেক চুল্লু] গাড়ির ভেতরে ৬০ পাউন্ড বিস্ফোরক রেখে মতিঝিলে হাবিব ব্যাংক বিল্ডিংয়ের সামনে বিলম্বিত ফিউজের মাধ্যমে ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটায়। এ বিস্ফোরণের ফলে হাবিব ব্যাংকের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ ঘটনায় পুরো ঢাকা শহর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জনসাধারণ সঙ্গে সঙ্গে কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। সেদিন রাতেই প্রিন্স সদরুদ্দিন যখন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, দলটি হোটেলের বারান্দায় আরেকটি বিস্ফোরকভর্তি গাড়ির ওপর বিস্ফোরণ ঘটায়। চারদিকে সংঘটিত এসব বিস্ফোরণের ঘটনা থেকে জাতিসংঘের মহামান্য পর্যবেক্ষক বেশ ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান যা স্বাভাবিকভাবে দেখানোর চেষ্টা করছেন, তা স্বাভাবিক নয়। ঢাকার অপারেশন যখন চলছিল, তখন আমি আমার বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের মিলিত দলকে বিভিন্ন থানায় পাঠাচ্ছিলাম থানাগুলো দখল করে নেওয়ার জন্য। এই দিনগুলো ছিল বিশেষ অসুবিধার। কারণ, আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলে ও সেনাদের সবাই ছিল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কিন্তু তাদের কাছে সেই যুদ্ধ করার জন্য ছিল না পর্যাপ্ত অস্ত্র আর গোলাবারুদ। অনেক চেষ্টা করেও গোলাবারুদ ও অস্ত্রের কোনো ব্যবস্থা করতে পারছিলাম না।

আমাদের বন্ধুরা সব সময় আমাদের এই বলে আশ্বাস দিত, 'এই তো অস্ত্র এসে পড়ছে।' কোনো সময় বলত, 'ট্রেনে মাল ভর্তি হয়ে গেছে, বন্যার জন্য আসতে পারছে না। কেননা রেললাইন বন্ধ।' আবার কোনো সময় বলত, 'ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে।' এমনও অনেক সময় গেছে যখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ

অপারেশন পরিকল্পনা তৈরি করার পরও আমাদের সে পরিকল্পনা বাতিল করতে হতো কেবল অস্ত্রের অভাবে। নিজেদের কাছে যেসব অস্ত্র ছিল সেসবেরও গোলাবারুদ অনেক অনেক হিসেব করে ব্যবহার করার পরেও প্রায় শেষ হওয়ার পথে ছিল। এ সময় সমস্ত মুক্তিবাহিনীতে হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। অনেক সময় বহু অনুরোধের পর হয়তো ৩০৩ রাইফেলের পাঁচটি করে গুলি সাহায্য হিসেবে পেতাম। এ ধরনের যুদ্ধের জন্য যা ছিল খুবই অল্প। এতসব অসুবিধা ও সংকটের মধ্যেও আমরা ভেঙে পড়িনি। আমি আমার সেনাদলকে নির্দেশ দিই, যে উপায়েই হোক আর যেখানেই হোক, পাকিস্তানি বাহিনীকে অ্যামবুশ করে বা অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের সজ্জিত করে তুলতে হবে। এ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেকের আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াতে হবে। আমার এই নির্দেশ বেশ কাজে লাগে। সবাই আবার পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে।

জুলাই মাসে টিক্কা খান আবার মন্দভাগ ও শালদা নদী পুনর্দখল করার চেষ্টা চালায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩১ বালুচ রেজিমেন্ট কুট্টি নামক জায়গায় সেনাসমাবেশ করে। আমাকে এ খবর আমাদের লোকেরা পৌঁছে দেয়। আমি ক্যাপ্টেন গাফফারকে মন্দভাগের অবস্থান আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং বাজারের কাছে শক্তিশালী অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিই। শত্রুসেনারা সকালে বালুচ রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানিকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়। সকাল সাড়ে ১০টায় শত্রুসেনারা অবস্থানের অগ্রবর্তী স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং আমাদের মাইনফিল্ডের ভেতরে আটকা পড়ে। তবুও তারা অগ্রসর হতে থাকে। তারা যখন আমাদের অবস্থান থেকে ৫০ গজের মধ্যে এসে পড়ে, ক্যাপ্টেন গাফফারের সেনাদল তাদের ওপর অকস্মাৎ গুলিবর্ষণ শুরু করে। আমাদের অবস্থান এতখানি সামনে, শত্রুরা তা জানত না। চারদিকের গুলিতে তাদের দুটি কোম্পানি সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তারা চারদিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। এতে তাদের নিহতের সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। ৩১ বালুচ রেজিমেন্ট কিছুক্ষণ পর তাদের আক্রমণ বন্ধ করে। কিন্তু এক ঘণ্টা পর পাকিস্তানি সেনারা শালদা নদীর দক্ষিণ তীর ঘেঁষে আমাদের অবস্থানের ডান পাশ দিয়ে পেছনে আসার চেষ্টা করে। তারা যে এমন একটা কিছু করতে পারে, ক্যাপ্টেন গাফফার তা আগেই অনুমান করেছিল। এ জন্য ক্যাপ্টেন গাফফারও তৈরি ছিল। সুবেদার ওহাবের [আবদুল ওয়াহাব বীর বিক্রম। পরে অনারারি ক্যাপ্টেন] অধীনে একটি কোম্পানিকে সে আগে

থেকেই শালদা নদীর দক্ষিণ তীরে অ্যামবুশ পজিশনে রেখেছিল। শত্রুরা অজ্ঞাতে এ অ্যামবুশ পজিশনটির ফাঁদে পড়ে যায়। নিরুপায় হয়ে তারা অবস্থানটির ওপর প্রবল আক্রমণ চালায়। কিন্তু আমাদের গুলির মুখে এই আক্রমণ ভণ্ডুল হয়ে যায়। আর উপায় না দেখে পরবর্তী আক্রমণ স্থগিত রেখে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে যায়। ক্যাপ্টেন গাফফারের সেনাদল ও সুবেদার ওহাবের সেনাদল পশ্চাদ্‌গামী শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে। এ সময় চারদিকের ধানখেতে এবং অন্যান্য জায়গায় বেশ পানি ছিল। এসব পানি ভেঙে পশ্চাদপরসণ করার সময় অনেক শত্রু হতাহত হয়। যুদ্ধের শেষে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র খুঁজে আমরা অন্তত ১২০টি মৃতদেহ খুঁজে পাই। আরও অনেক মৃতদেহ, যেগুলো পানিতে ছিল, খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ যুদ্ধের ফলাফল আমার জন্য অনেক সুফল বয়ে এনেছিল। আমরা আটটি মেশিনগান, ১৮টি হালকা মেশিনগান এবং প্রায় দেড় শ রাইফেল, দুটি রকেট লঞ্চার, দুটি মর্টার ও অজস্র গোলাবারুদ হস্তগত করি। আরও অনেক অস্ত্রশস্ত্র পানিতে ছিল, সেগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি। মৃতদেহগুলোর মধ্যে একজন ক্যাপ্টেন, একজন লেফটেন্যান্ট এবং আরও কয়েকজন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারকে শনাক্ত করা হয়। শত্রুরা এ সময় বৃষ্টি ও বন্যার জন্য আমাদের হাতে বেশ নাজেহাল হচ্ছিল এবং বাধ্য হয়ে তাদের গতিবিধি শুধু রাস্তা ধরে হাঁটার মধ্যেই সীমিত রাখতে হচ্ছিল। কিন্তু আমরা শত্রুদের এ দুর্বলতা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারছিলাম না, যেহেতু তখনো আমরা অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে দুর্বল ছিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের বেশ কিছু লোক প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেলেও। অস্ত্রের অভাবে এসব তাদেরকে আমরা ভেতরে পাঠাতে পারছিলাম না। শত্রুরা আমাদের দুর্বলতা বুঝতে পেরে তাদের গতিবিধি আরও বাড়ানোর জন্য জলযানের জোগাড় করতে লাগল—বাংলাদেশের যত লঞ্চ, স্টিমার, স্পিডবোট ছিল, সেগুলো তারা দখল করে নিল। মেশিনগান সজ্জিত করে সেগুলোকে গানবোট হিসেবে তারা ব্যবহার করতে লাগল।

আমার কাছে খবর আসে যে, শত্রুরা নারায়ণগঞ্জের 'পাক বে' কোম্পানিকে ৩০০ ফাইবার গ্লাস স্পিডবোট তৈরির নির্দেশ দিয়েছে। এবং সেগুলোর তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই কোম্পানির একজন অফিসারের ভাই আমার মুক্তিবাহিনীতে ছিল। সে এসে খবর দেয় যে এই স্পিডবোটে লাগানোর জন্য ৩০০ ইঞ্জিন সদ্য আনা হয়েছে এবং সেগুলো এখন মজুত করে রাখা হয়েছে। আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, ফাইবার গ্লাস স্পিডবোট তৈরি হয়ে গেলে শত্রুদের গতিবিধি অনেক গুণ বেড়ে যাবে এবং

এই বর্ষার মৌসুমে হায়েনারা বাংলাদেশের আনাচকানাচে পৌঁছাতে পারবে। তখন আমাদের মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সুদূর গ্রামের গোপন অবস্থানগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। সে জন্য এ মেশিনগুলো এখনই ধ্বংস করে দিতে হবে। তৎক্ষণাৎ সেই ছেলেটিকে আরও ১০ জন গেরিলা মনোনয়ন করার নির্দেশ দিই। নির্দেশমতো মনোনীত দলটিকে প্রশিক্ষণের পর নারায়ণগঞ্জ পাঠিয়ে দিই। নারায়ণগঞ্জে এসে তারা প্রথম 'পাক বে'র গুদামটি রেকি পর্যবেক্ষণ করে এবং জানতে পারে যে, যে গুদামটিতে মেশিনগুলো রাখা হয়েছে, সেখানে দুজন পুলিশ ও দুজন চৌকিদার পাহারা দিচ্ছে। সেদিনই সন্ধ্যায় আমাদের দল অতর্কিতে পুলিশ সদস্যদের নিরস্ত্র করে ফেলে এবং পুলিশ ও চৌকিদারদের একটি কামরায় বন্ধ করে গুদামের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। গুদামের ভেতরে ডিজেল ও পেট্রল ছিল। সেগুলো সব মেশিনের ওপর ঢেলে দেয় এবং যেসব ফাইবার গ্লাস নৌকা প্রস্তুত করা হয়েছিল, তাতে পেট্রল ঢেলে দেয়। এরপর তাতে তারা আগুন ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সব মেশিন এবং ফাইবার গ্লাসের নৌকাগুলোতে আগুন লেগে যায় এবং বিস্ফোরণ ঘটে। এ বিস্ফোরণে শত্রুদের সব মেশিন ও ৩০০ নৌকা ধ্বংস হয়ে যায়।

এ অপারেশনের ফলে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের গতিবিধি অনেকাংশে সীমিত করতে বাধ্য হয়। অপরদিকে, মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সুদূর গ্রামাঞ্চলে তাদের গোপন অবস্থান বিপদমুক্ত রাখা সম্ভব হয় এবং তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে।

২ জুলাই ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় একটি দল লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে শত্রুদের লাতুমুড়া অবস্থানের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে মর্টারের সাহায্য নেওয়া হয়। আক্রমণের ফলে ১২ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও চারজন আহত হয়।

কুমিল্লায় আমাদের অ্যাকশন তীব্রতর হওয়ায় পাকিস্তানি সেনারা কুমিল্লার উত্তরে গোমতী বাঁধের ওপর তাদের অবস্থান গড়ে তোলে এবং আরও উত্তরে তাদের কর্তৃত্ব বাড়ানোর জন্য টহল দিতে শুরু করে। পাকিস্তানি সেনারা যাতে শহরের বাইরে তাদের কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপন করতে না পারে, সে জন্য আমি 'ব্রাভো' কোম্পানির দুটি প্লাটুনসহ কোটেশ্বরে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলার নির্দেশ দিই। পাকিস্তানি সেনারা দু-তিন দিন এই এলাকায় সম্মুখবর্তী জায়গায় তাদের টহল বজায় রাখে। এরপর ৪ জুলাই পাকিস্তানি সেনাদের একটি ভারী দল ভোররাত চারটার সময় আমাদের অবস্থানের আধা মাইল পশ্চিমে

কোটেশ্বর গ্রামের ভেতর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ভোররাত চারটা ১৫ মিনিটে তারা আরও এগিয়ে আমাদের ২০০ থেকে ৩০০ গজের মধ্যে এসে পৌঁছায়। এ সময় আমাদের সেনারা তাদের ওপর গুলি চালায়। এর পরও পাকিস্তানি সেনারা দু-তিন ঘণ্টা অগ্রসর হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের গুলির মুখে বারবারই তারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এরপর তারা ৫০০-৬০০ গজ পিছু হটে গিয়ে আমাদের বাঁয়ে সারিপুরের দিক থেকে আবার এগোনোর চেষ্টা করে। এবারও পাকিস্তানি সেনারা আমাদের গোলাগুলির সামনে টিকতে না পেরে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এ সংঘর্ষে পাকিস্তানি সেনাদের কমপক্ষে ৩০ জন হতাহত হয়। আর আমাদের একজন প্রাণ হারায়।

হোমনা থানা পাকিস্তানি সেনাদের জন্য সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ঢাকায় যেসব গেরিলাকে অপারেশনের জন্য পাঠাতাম, তারাও এই হোমনা দিয়ে যাতায়াত করত। সে জন্য পাকিস্তানি সেনারা লঞ্চে করে সব সময় দাউদকান্দি থেকে হোমনায় টহল দিতে আসত। আর হোমনার দালাল পুলিশ সদস্যরা পাকিস্তানি সেনাদের মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে খবরাখবর দিত। এই পুলিশ স্টেশনটি আমার জন্য বিরাট একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে জন্য থানাটি দখল করে নেওয়ার জন্য আমি হাবিলদার গিয়াস উদ্দিন আহাম্মদকে নির্দেশ দিই। হাবিলদার গিয়াস তার সেনাদল ও স্থানীয় গেরিলাদের নিয়ে থানাটি আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। তারা খবর নিয়ে জানতে পায় যে, থানায় বাঙালি দালাল পুলিশ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশও যথেষ্ট আছে। থানা রক্ষায় পুলিশ থানার চারদিকে বাংকার তৈরি করেছে এবং কয়েকটি হালকা মেশিনগানও তাদের কাছে আছে। সম্পূর্ণ খবরাখবর নিয়ে হাবিলদার গিয়াস থানা আক্রমণের একটি পরিকল্পনা নেয়। ১ জুলাই রাত ১১টার সময় হাবিলদার গিয়াস তার গণবাহিনী ও নিয়মিত বাহিনীকে নিয়ে থানায় অতর্কিতে আক্রমণ করে। এতে পাকিস্তানি পুলিশ সদস্যরা হালকা মেশিনগানের সাহায্যে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের আক্রমণের মুখে তাদের সবাই নিহত হয়। হাবিলদার গিয়াস থানাটি দখল করে নেয়। থানার সব অস্ত্রশস্ত্র তার হস্তগত হয় এবং আমাদের ঢাকা যাওয়ার রাস্তাও শত্রুমুক্ত হয়।

আমাদের একটি প্লাটুন মিয়াবাজার থেকে ফুলতলীতে টহল দিতে যায়। রাত তিনটার সময় তারা দেখতে পায়, পাকিস্তানি সেনাদের একটি জিপ ও দুটি ট্রাক কুমিল্লা থেকে দক্ষিণের দিকে টহল দিতে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে

আমাদের প্লাটুন কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রাস্তার ওপর অ্যামবুশ পেতে এ গাড়িগুলোর বহরটির ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে। অ্যামবুশের জায়গায় তারা একটি মেশিনগান ও তিনটি হালকা মেশিনগান রাস্তার দুদিকে লাগিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের জন্য অপেক্ষায় থাকে। ভোররাত সাড়ে চারটায় পাকিস্তানি সেনাদের গাড়িগুলো মিয়াবাজার অবস্থানে ফেরত আসে। আসার পর গাড়িগুলো আমাদের অ্যামবুশে পড়ে যায়। অ্যামবুশ দল খুব নিকটবর্তী স্থান থেকে মেশিনগান ও হালকা মেশিনগানের গুলি চালিয়ে গাড়িগুলোর ক্ষতিসাধন করে। পাকিস্তানি সেনারা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নিচে নামার চেষ্টা করে কিন্তু এতেও তাদের অনেক লোক মেশিনগানের গুলিতে হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের কমপক্ষে তিনজন অফিসারসহ ২১ জন নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়। পরে খবর পাওয়া যায় যে নিহতদের মধ্যে একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেলও ছিল। এই অ্যামবুশের সময় পাকিস্তানি সেনারা কুমিল্লা বিমানবন্দর থেকে তাদের সাথিদের সাহায্য করার জন্য আমাদের অ্যামবুশ-অবস্থানের ওপর কামানের প্রচণ্ড গোলা ছুড়তে থাকে। গোলার মুখে বেশিক্ষণ টিকতে না পেরে আমাদের অ্যামবুশ দলটি সেই অবস্থান ছেড়ে পিছু হটে আসে।

জুলাই মাসের ১ তারিখে পাকিস্তানি সেনারা আবার তাদের শালদা নদী ও কসবা অবস্থানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালায়। সকাল ১০টার সময় শালদা নদী থেকে পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল কসবার দিকে অগ্রসর হয়। দলটি কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর মন্দভাগের কাছে গাফফারের 'চার্লি' কোম্পানির সামনে উপস্থিত হয়। দুপুর ১২টার সময় পাকিস্তানি সেনারা যখন ক্যাপ্টেন গফফারের 'চার্লি' কোম্পানির অবস্থানের সামনে দিয়ে কসবার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, ঠিক সে সময় ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে চতুর্থ বেঙ্গলের 'চার্লি' কোম্পানি তাদের (পাকিস্তান সেনা) ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। পাকিস্তানি সেনারা আর অগ্রসর হতে পারেনি এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে তাদের সহযোদ্ধাদের মৃতদেহগুলো ফেলেই শালদা নদীর অবস্থানে পালিয়ে যায়। পালানোর পথে আমাদের মর্টারের গোলা তাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। এ সংঘর্ষে পাকিস্তানি সেনাদের আটজন আহত ও তিনজন নিহত হয়।

পাকিস্তানি সেনারা জুলাই মাসের ৪ তারিখে ফেনী থেকে দুটি কোম্পানি নিয়ে বেলুনিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। রাস্তায় তারা শালধর বাজারে কিছুক্ষণের অবস্থান নেয়। এ সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের একটি প্লাটুন ৩ ইঞ্চি মর্টারসহ বেলা দুইটার পর শত্রুদের ওই দলটির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাদের

মনোবল বেলুনিয়াতে থাকার সময়ই যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। এ ছাড়া সে সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যে সাময়িকভাবে বানানো ট্রেঞ্চগুলোতে থাকাও বেশ অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছিল। অতর্কিত আক্রমণের ফলে মেশিনগান ও মর্টারের গোলাগুলিতে তাদের অসংখ্য লোক হতাহত হয়। পরে জানা যায়, তাদের অন্ততপক্ষে ৩০ জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছে। পাকিস্তানি সেনারা এরপর শালধর বাজারের পার্শ্ববর্তী সাহেবনগর ও অন্যান্য গ্রাম থেকে স্থানীয় লোকজনদের অন্য কোথাও চলে যেতে বলে। লেফটেন্যান্ট মেহবুব মতলব এলাকাতে মুক্তিবাহিনীর একটি প্লাটুনকে পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি মতলব এলাকায় গিয়ে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। সেখানে তারা জানতে পারে, মতলব থানায় পাকিস্তানি পুলিশ ও রেঞ্জার মোতায়েন করা হয়েছে। এসব পুলিশের অত্যাচারে স্থানীয় লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানি পুলিশ স্থানীয় দালালদের সহায়তায় প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। আমাদের দলটি মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে এই থানা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা থানা সম্পর্কে সব খবর জোগাড় করে। ২ জুলাই রাতে গেরিলাদলটি থানার ওপর আক্রমণ করে। পাকিস্তানি পুলিশ এবং রেঞ্জাররা এই আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে কিন্তু তীব্র আক্রমণের মুখে পাঁচজন পুলিশ নিহত ও সাতজন আহত হয়। ঠিক এ সময় গেরিলাদের কাছে যে হালকা মেশিনগানটি ছিল, সেটি খারাপ হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে গেরিলারা আক্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। গেরিলাদেরও একজন নিহত হয়। কিন্তু এই আক্রমণের পর থেকে পাকিস্তানি পুলিশ সদস্যরা আর থানার বাইরে আসার সাহস পায়নি এবং সমস্ত মতলব থানা এলাকা মুক্তিবাহিনীর আওতায় এসে যায়।

শালদা নদীতে আমাদের তৎপরতা ঠিকঠাকমতোই চলছিল। মেজর সালেকের এক টহলদল খবর আনে যে পাকিস্তানি সেনারা রেলসড়কের পূর্ব দিক দিয়ে একটি ছোট রাস্তা তাদের শালদা নদী ও নয়নপুর অবস্থানের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করে থাকে। মেজর সালেক পাঁচজনের একটি ডেমোলিশন দল পাঠিয়ে সেই রাস্তায় মাইন পুঁতে দেয়। ৯ জুলাই সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় পাকিস্তানিদের এক প্লাটুন সেনা শালদা নদী থেকে নয়নপুর যাওয়ার পথে এসব অ্যান্টি-পার্সোনেল মাইনের ওপর পড়ে যায়। মাইন বিস্ফোরণে ১০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা বিপর্যস্ত হয়ে শালদা নদীতে ফিরে আসে।

৬ জুলাই পাকিস্তানি সেনারা প্রায় একটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে মন্দভাগ বাজার পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সেখান থেকে তারা সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের 'আলফা' ও 'চার্লি' কোম্পানি মেজর সালেক ও ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনাদের শালদা নদী এনক্লেভের ভেতরে অগ্রসর হওয়ার পথে প্রবলভাবে বাধার সৃষ্টি করে। পাকিস্তানি সেনারা তাদের ফিল্ড আর্টিলারি মন্দভাগ বাজার পর্যন্ত নিয়ে আসে এবং কামানের সাহায্যে আমাদের অবস্থানের ওপর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে তীব্র গোলা বর্ষণ করতে থাকে। গোলাবর্ষণে আমাদের ১১ জন আহত হয় এবং অন্তত ৩২ জন বেসামরিক ব্যক্তি হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা তাদের আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে এবং শালদা নদী এনক্লেভ দখল করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। আমাদের মুক্তিসেনারাও তাদের এই আক্রমণে তীব্র বাধা দিতে থাকে। আমাদের মর্টারের গোলা তাদের কামানের অবস্থান পর্যন্ত পৌঁছাতে ব্যর্থ হলেও আমাদের গোলাগুলোর মুখে তাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়ে যায়। তারা পিছু হটে মন্দভাগ বাজারে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। মেজর সালেক পাকিস্তানি সেনাদের শালদা নদীর অবস্থানের বিরুদ্ধে তার কার্যকলাপ আরও তীব্র করার জন্য ৯ জুলাই পাকিস্তানি অবস্থানের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা-সংক্রান্ত সম্পূর্ণ খবরাখবর রেকি-সম্পৃক্ত টহলদল পাঠিয়ে আনিয়ে নেয় এবং অবস্থানগুলোর ওপর আমাদের নিজস্ব প্রথম গোলন্দাজ বাহিনীর [মুজিব ব্যাটারি] সহায়তায় গোলাবর্ষণের পরিকল্পনা নেয়। সেই সঙ্গে একটি অ্যামবুশ দল শালদা নদীর পেছনে পাঠিয়ে দেয় এবং তাদেরকে পাকিস্তানি সেনাদের নদীপথে যাতায়াতে বাধা সৃষ্টির নির্দেশ দেয়। ৯ জুলাই সন্ধ্যা ছয়টার সময় পাকিস্তানি সেনারা যখন তাদের অবস্থানের ওপর ঘোরাফিরা করছিল, ঠিক সে সময় আমাদের কামান ও মর্টারগুলো পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করতে থাকে। গোলাবর্ষণ প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলে। হঠাৎ এই মর্টার ও কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে শত্রুরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। এতে তাদের অনেকে হতাহত হয়। পরে জানা যায় যে এতে দুজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ১১ জন আহত হয়। একটি মেশিনগানের বাংকারসহ তিনটি বাংকার ধ্বংস হয়। কামানের গোলার আঘাতে তাদের একটি অ্যামিউনিশন জিপ ধ্বংস হয়ে যায়। এর পরদিন একটি স্পিডবোট পাকিস্তানি সেনাদের নিয়ে শালদা নদী হয়ে পশ্চিম দিকে যাচ্ছিল। আমাদের টহলদল, যেটি আগে থেকেই শালদা নদীর পেছনে অবস্থান নিয়েছিল, তারা পাকিস্তানি বাহিনীর স্পিডবোট অ্যামবুশ করে। অ্যামবুশে আমাদের গুলির আঘাতে স্পিডবোটটি ডুবে যায়। ১২ জন

পাকিস্তানি সেনা হয় গুলিতে, না হয় পানিতে ডুবে মারা যায়। ধৃতদের মধ্যে একজন মেজর ও একজন ক্যাপ্টেন ছিল এবং তাদের পদমর্যাদার ব্যাজ অ্যামবুশ দল নিয়ে আসে। শুধু তা-ই নয়, পানি থেকে তারা একটি মেশিনগান, একটি ওয়্যারলেস সেট ও একটি ম্যাপ (যাতে শত্রু-অবস্থানগুলো চিহ্নিত করা ছিল) উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। এর পরই পাকিস্তানি সেনাদের কামানের গোলা আমাদের দলের ওপর পড়তে থাকে। আমাদের দল তখন বাধ্য হয়ে অ্যামবুশ এলাকা ত্যাগ করে।

১০ জুলাই পাকিস্তানি সেনারা একটি কোম্পানি নিয়ে বিকেল চারটার সময় পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানি সেনারা শালদা নদীর উঁচু স্থান সাগরতলা দখল করার জন্য অগ্রসর হয়। গোলন্দাজ বাহিনীও তাদের সাহায্য করে। কিন্তু সাগরতলা উঁচু অবস্থানের ওপর আমাদের যে প্লাটুনটি ছিল, সেটি এবং রেললাইনের পশ্চিমে আমাদের আরেকটি প্লাটুন তাদের প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়। আমাদের ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং মেশিনগানের গোলাগুলিতে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ পর্যুদস্ত হয়। তাদের ৩০-৪০ জন হতাহত হয়। এরপর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে শালদা নদীতে তাদের নিজ অবস্থানে পালিয়ে যায়।

পাকিস্তানিদের একটি দল নবীনগরে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। পাকিস্তানি সেনারা নবীনগরে অবস্থান নেওয়ার ফলে আমাদের পক্ষে নরসিংদী, ভৈরব বাজার এবং কালীগঞ্জে যাতায়াতের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানি সেনারা



২ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মেজর খালেদ ছবি : রবীন সেনগুপ্ত

কয়েকজন স্থানীয় দালালের সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতির অজুহাতে সমস্ত এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করে। ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন এ এলাকাকে আবার বিপদমুক্ত করার জন্য ১৬ জনের একটি দলকে হাবিলদার আউয়ালের নেতৃত্বে নবীনগরে পাঠায়। হাবিলদার আউয়াল কসবার উত্তর দিয়ে প্রবেশ করে নবীনগরের তিন মাইল পশ্চিমে তার গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে। আউয়াল স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ খবর জোগাড় করে। এরপর ৮ জুলাই সকাল ছয়টায় পাকিস্তানি সেনাদের নবীনগরের অবস্থানটির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের জন্য পাকিস্তানি সেনারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তারা হকচকিয়ে যায় এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দলটি পাকিস্তানি সেনাদের সাতজন ও পাঁচজন দালালকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। সংঘর্ষে আমাদের একজন আহত হয়।

আমি এ সময় ঢাকায় আরও কয়েকটি গেরিলাদল পাঠাই। এ দলগুলো আগের পাঠানো দলগুলোর সঙ্গে যোগ দেয় এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাদের গেরিলা কার্যক্রম চালিয়ে যায়। একটি দল জুলাই মাসের প্রথমেই পাকিস্তানি সেনাদের ছোট একটি অ্যামিউনিশন পয়েন্ট আক্রমণ করে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে পাকিস্তানি বাহিনী সারা ঢাকায় সান্ধ্য আইন জারি করে এবং সেই সঙ্গে সারা শহরে পাহারার ব্যবস্থা করে। ওই দিনই দুজন গেরিলা নিউ মার্কেটের কাছে পাকিস্তানি সেনাদের একটি জিপের ভেতর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে একজন অফিসার ও তিনজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ৫ জুলাই নারায়ণগঞ্জে দুজন গেরিলার আরেকটি দল গুলশান সিনেমা হলের পর্দার ওপর একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে পর্দাটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায় এবং নিকটবর্তী পাঁচজন দালালও আহত হয়। সারা নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ৪ জুলাই দুপুর ১২টার সময় পাঁচজন গেরিলার একটি দল পাগলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পাইলন উড়িয়ে দেয়। ১০ জন গেরিলার একটি দল নিউ মার্কেটের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ ও পাকিস্তানি সেনাদের একটি মিলিত দলের ওপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে আটজন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ ও চারজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়।

এদিকে ১১ জুলাই সকাল আটটা থেকে হঠাৎ পাকিস্তানি সেনারা ভারী কামান এবং মর্টারের সাহায্যে আমাদের শালদা নদী-অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড গোলাগুলি চালাতে থাকে। এর ফলে আমাদের শালদা নদী-অবস্থানের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাকিস্তানি সেনাদের গোলাগুলি সারা দিন ধরে চলে। মর্টার

স্প্লিন্টারের আঘাতে চতুর্থ বেঙ্গলের হাবিলদার তাজুল মিয়া এবং সিপাহি আবদুর রাজ্জাক গুরুতর আহত হয়। এ ছাড়াও দুজন বেসামরিক লোক নিহত ও আটজন বেসামরিক লোক আহত হয়। এই প্রচণ্ড গোলাগুলির ফলে আমাদের অবস্থানের সব সেনা স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের আশঙ্কা করছিল। কিন্তু বিকেলের দিকে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। পরে আর আক্রমণও হয়নি।

৯ জুলাই পাকিস্তানি সেনারা আমাদের কোটেশ্বর অবস্থানের ওপর সকাল ছয়টায় আবার তাদের আক্রমণ শুরু করে। এই অবস্থানের সেনারা মর্টার ও কামানের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাদের এই আক্রমণের মোকাবিলা করে। পাকিস্তানি সেনারা প্রথমে দুটি কোম্পানি নিয়ে আক্রমণ চালায়। পরে আরও দুটি কোম্পানিকে শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য নিয়ে আসে। তিন-চার ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের কামানের গোলায় এবং মেশিনগানের গুলিতে পাকিস্তানিদের আক্রমণ ব্যাহত হয়। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের অন্তত ২৪-২৫ জন নিহত হয়। তারা আক্রমণ বন্ধ করে পিছু হটে যায়।

আমাদের টহলদল ৯ জুলাই পাকিস্তানি সেনাদের কোম্পানি হেডকোয়ার্টারসে রেকি করে এবং অবস্থান জানতে পারে। আমাদের কামানগুলো 'আলফা' কোম্পানির হেডকোয়ার্টারসের ওপর অতর্কিতে প্রচণ্ড গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে দুজন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং ছয়জন আহত হয়। এর মধ্যে একজন অফিসার ও তার সিগন্যালারও ছিল। স্থানীয় লোকজন অফিসারটির কাঁধে ব্যাজ দেখে তাকে শনাক্ত করতে পেরেছিল। এতে শত্রুদের মনোবল ভেঙে গিয়েছিল।

১০ জুলাই রাতে ক্যাপ্টেন গাফফার চতুর্থ বেঙ্গলের 'চার্লি' কোম্পানি থেকে দুটি সেকশনকে শালদা নদীর পশ্চিমে কামালপুর ও মাইজখারের ভেতর অ্যামবুশ পাতার জন্য পাঠায়। দলটি সকাল হওয়ার আগেই অ্যামবুশ নিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় বসে থাকে। দুপুর আড়াইটায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি ভারী দল শালদা নদী-অবস্থান থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দলটি যখন আমাদের অ্যামবুশ-অবস্থানের ভেতর এসে পড়ে, ঠিক সে সময় পাকিস্তানি সেনাদের সম্মুখবর্তী অংশের ওপর আমাদের সেনারা গুলি চালাতে শুরু করে। অতর্কিত আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা হতভম্ব হয়ে যায় এবং কিছু বোঝার আগেই তাদের অনেক লোক হতাহত হয়। ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা পেছনের দিকে পালাতে শুরু করে। এ অবস্থাতেও তাদের অনেক হতাহত হয়। সংঘর্ষে পাকিস্তানি সেনাদের একজন মেজর, দুজন ক্যাপ্টেন ও

আটজন সেনা নিহত হয়। আমাদের অ্যামবুশ দল একটি মেশিনগান, ২২৫টি গুলি, একটি এসএসজি, একটি জি৩ রাইফেল এবং একটি এএন-পিআরসি১০ ওয়্যারলেস সেট হস্তগত করে।

হোমনায় হাবিলদার গিয়াসের অধীনে যে মুক্তিবাহিনীর দলটি হোমনা থানায় আক্রমণ চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়, সেই দল এই এলাকাতেই তাদের ঘাঁটি গড়ে তোলে। দলটির তৎপরতার মুখে পাকিস্তানি বাহিনী নিকটবর্তী থানাগুলোকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। পাকিস্তানি সেনারা রাস্তার প্রতিটি সেতুর ওপর তাদের কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করে। প্রতিটি হাটবাজার এলাকাতেও তারা ক্যাম্প স্থাপন করে। এ ছাড়া নিকটবর্তী সব এলাকার চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের ডেকে 'শান্তি কমিটি' গড়ে তোলার জন্য কড়া নির্দেশ দেয়। প্রতিটি এলাকার চেয়ারম্যানকে স্থানীয় লোক নিয়োগ করে পাকিস্তানি সেনাদের অধীনে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে এবং তাদের কাজ করতে বাধ্য করে। কোনো স্থানীয় লোক যদি তাদের নির্দেশমতো কাজ করতে অস্বীকার করত, তাহলে পাকিস্তানি সেনারা তাদের বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনকে হত্যার হুমকি দিত এবং বাড়িঘরের ক্ষতি করত কিংবা ভয় দেখিয়ে তাদের নির্দেশমতো কাজ করাতে বাধ্য করত। পাকিস্তানি সেনারা স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় হাবিলদার গিয়াসের দলটির সন্ধান পায় এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে পাকিস্তানি বাহিনীর তথ্য আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পাই। তাদের ধারণা ছিল যে হোমনা ও দাউদকান্দি এলাকায় কমপক্ষে আমাদের ৬ হাজারেরও বেশি লোক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ জন্য পাকিস্তানি সেনারা কখনো রাতে তাদের ক্যাম্পগুলোর বাইরে আসতে সাহস করত না। এ ছাড়া তারা কোনো সময়ই দলে ভারী না হলে ক্যাম্পের বাইরে টহলে বের হতো না। পাকিস্তানি সেনাদের এই ভীতসন্ত্রস্ত মানসিক অবস্থার জন্য আমাদের দলটির পক্ষে নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সুবিধা হয়। সপ্তাহে এক দিন কি দুই দিন লঞ্চের সাহায্যে পাকিস্তানি সেনাদের এসব ক্যাম্পে রসদ জোগানো হতো—এ সংবাদ আমাদের দলটি জানতে পারে। ৬ জুলাই দাউদকান্দি থানার অন্তর্গত মাসিমপুর বাজারের আধা মাইল পশ্চিমে জয়পুর গ্রামে গোমতীর শাখানদীর পাড়ে হাবিলদার গিয়াস তার দল নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের জন্য একটি অ্যামবুশ পাতে। সকাল ১০টার সময় পাকিস্তানি সেনাদের দুটি লঞ্চ দাউদকান্দির দিক থেকে গোমতী হয়ে এই শাখানদীতে আসে। লঞ্চগুলো অ্যামবুশের সামনে এসে পড়তেই আমাদের দলটি গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা নদীর ভেতর

থেকে অ্যামবুশ দলটির ওপর হামলা না করতে পারায় এবং তীরে অবস্থিত অ্যামবুশ দলের তীব্র গোলাগুলিতে তাদের লঞ্চগুলোর যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং অনেক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। উপায়ান্তর না দেখে লঞ্চগুলো পিছু হটে যায় এবং দাউদকান্দির দিকে পালিয়ে যায়। পরে বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা খবর পেয়েছি, অন্তত ২০-২৫ জন পাকিস্তানি সেনা আহত বা নিহত হয়েছে। অ্যামবুশের ভেতর পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও লঞ্চগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ অ্যামবুশ দলের কাছে রাইফেল ও হালকা মেশিনগান ছাড়া বড় অস্ত্র—রকেট লঞ্চার কিংবা কামান ছিল না; তবু এ অ্যামবুশের ফলাফল ছিল আমাদের জন্য বিরাট সাফল্য। ফলে পাকিস্তানি সেনারা এ এলাকায় চলাফেরা আরও কমিয়ে দেয়। এতে আমাদের কর্তৃত্ব এবং স্থানীয় লোকজনের মনোবল আরও বেড়ে যায়। এরপর হোমনার দাউদকান্দি থানার জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

চতুর্থ বেঙ্গলের 'ব্রাভো' কোম্পানির একটি প্লাটুন চৌদ্দগ্রাম এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। পাকিস্তানি সেনারা কুমিল্লা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক খোলার জন্য তাদের চেষ্টা দিন দিন বাড়িয়ে যাচ্ছিল। যেসব সড়কসেতু আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম, সেগুলো পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করছিল তারা। ৯ জুলাই সকাল আটটায় আমাদের প্লাটুন চৌদ্দগ্রামের উত্তরে সড়কের ওপর বালুজুরি ভাঙ্গাপুলের কাছে অ্যামবুশ পাতে। বেলা ১১টার সময় পাকিস্তানি সেনারা একটি সিঅ্যান্ডবির ট্রাক এবং দুটি জিপে করে এসে ওই ভাঙা পুলের কাছে থামে। তারা পুলটি মেরামত করার প্রস্তুতি নেয়। ঠিক সে সময় আমাদের অ্যামবুশ দল তাদের ওপর গোলাগুলি চালাতে থাকে। এর ফলে পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অ্যামবুশ দলের গুলিতে তাদের অনেক লোক হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা পুলের কাছ থেকে হটে গিয়ে পেছনে অবস্থান নেয় এবং পরে চৌদ্দগ্রাম থেকে আরও পাকিস্তানি সেনা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা আমাদের অ্যামবুশ-অবস্থানের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। আমাদের দলটিও একটু পিছু হটে উঁচু জায়গায় আরও শক্ত অবস্থান গড়ে তোলে। পাকিস্তানি সেনারা বেলা তিনটার সময় মর্টার, কামান, মেশিনগানের সহায়তায় আমাদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ করে। আমাদের দল সাহসিকতার সঙ্গে এ আক্রমণ মোকাবিলা করে। আমাদের গুলিতে পাকিস্তানি সেনারা পর্যুদস্ত হয়ে তিন-চার ঘণ্টা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিকেল

পাঁচটায় আক্রমণ বন্ধ করে পিছু হটে যায়। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের ৩০ জন নিহত ও ছয়জন আহত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের চারদিকে মৃতদেহগুলো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফেলে রেখে তারা পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটার পর আমাদের দলটি অনেক অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয় এবং শত্রুদের ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাকটিও নিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু ট্রাকটির এত বেশি ক্ষতি হয়েছিল যে সেটা আনা সম্ভব হয়নি। ট্রাকটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পাকিস্তানি সেনাদের যে দুজন দালাল যুদ্ধের সময় পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, তারাও গুলিবিদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে যাওয়ার পর আমাদের দল দু-তিনটি টহল ও পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের তাড়িয়ে দেয়। বিকেল সাড়ে চারটার সময় পাকিস্তানি সেনাদের একটি জঙ্গি বিমান যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে এবং আমাদের দলকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের দল সেখান থেকে একটু দূরে সরে যাওয়ায় জঙ্গি বিমানটি কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে ফেরত চলে যায়। এই সংঘর্ষের পর ১০ জুলাই সন্ধ্যায় একটি অ্যামবুশ দল ওই অবস্থানের এক মাইল দক্ষিণে লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামানের নেতৃত্বে আবার ফাঁদ পাতে। আমাদের ধারণা ছিল, পাকিস্তানি সেনারা আবার ওই সেতুর কাছে আসবে। ১০ জুলাই সারা দিন পাকিস্তানি সেনাদের জন্য তারা অপেক্ষা করে। কিন্তু আমাদের ধারণামতো সেদিন না এসে ১১ জুলাই বেলা ১১টার সময় দুটি গাড়িসহ পাকিস্তানি সেনাদের একটি কোম্পানি মিয়াবাজারের দিক থেকে আস্তে আস্তে ভাঙা সেতুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা যখন অ্যামবুশ-অবস্থানের ভেতর পৌঁছায়, ঠিক সে সময় অ্যামবুশ দল তাদের ওপর প্রচণ্ড গুলি চালাতে থাকে। এতে শত্রুপক্ষের বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। তারা পিছু হটে গিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং উভয় পক্ষের যুদ্ধ সারা দিন ধরে চলে। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের ১০ থেকে ১৫ জন হতাহত হয়। বেলা তিনটায় পাকিস্তানি সেনারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে আবার পিছু হটে। আমাদের দল রাত দুইটা পর্যন্ত আবার আক্রমণের অপেক্ষায় থাকে। এরপর লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান তার দলবল নিয়ে বালুজুরির ভগ্নপ্রায় সেতুটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে নিজের ঘাঁটিতে চলে আসে। আসার পথে চৌদ্দগ্রাম-লাকসাম রোডের ওপর বাঙ্গড়ার পশ্চিমে অ্যান্টি-পার্সোনেল মাইন পেতে রাখে। মাইন পাতার সময় দুর্ঘটনায় আমাদের কমান্ডো প্লাটুনের দুজন লোক সামান্য আহত হয়।

এ সময় পাকিস্তানিরা চাঁদপুর থেকে ফেনী দিয়ে চট্টগ্রাম রেললাইন পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে। আমার রাজনগর সাবসেক্টর থেকে ক্যাপ্টেন

জাফর ইমাম একটি প্লাটুন ও ইঞ্জিনিয়ারিং একটি দলকে বিস্ফোরকসহ মিয়াবাজারের দক্ষিণে পাঠিয়ে দেয়। দলটি সরিষাদী রেলসেতু সম্পর্কে খবরাখবর নেয় এবং গোমতীর কাছে সরিষাদী রেলসেতুটি আক্রমণ করার জন্য বেছে নেয়। কিছুসংখ্যক স্থানীয় দালাল অস্ত্রসহ সেতুটি পাহারা দিত। ১৩ জুলাই রাত ১১টার সময় আমাদের দলটি সরিষাদী সেতু আক্রমণ করে। পাহারারত সশস্ত্র দালালদের কয়েকজন নিহত হয় এবং বাদবাকিদের তাড়িয়ে দিয়ে তারা ডেমোলিশন লাগিয়ে সেতুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে পাকিস্তানিরা শুধু ফেনী ও গুণবতীর মধ্যে মাঝে মাঝে ট্রেন চলাচল চালু রাখত। অবশ্য এর আগে ট্রেন চলাচল করতে পারত না। দলটি পাকিস্তানিদের নয়াপুর বিওপি অবস্থানের ওপর ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। এতে দুজন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং সাতজন আহত হয়।

১৩ জুলাই রাত ১০টায় পাকিস্তানি সেনাদের দত্তসার দীঘি ও আমতলা অবস্থানগুলোর ওপর ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে দুটি দল আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের ১৫ জন আহত ও কিছু নিহত হয়। শালদা নদীতে পাকিস্তানি সেনারা আবার নতুন করে তাদের শক্তি বাড়াতে থাকে। ১১ জুলাই পাকিস্তানি সেনারা আমাদের শালদা নদী-অবস্থানের দিকে মারমুখী টহল চালাতে থাকে। আমাদের সেনারাও মেজর সালেকের [আবদুস সালেক চৌধুরী বীর উত্তম] নেতৃত্বে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর লক্ষ রাখে। ১২ জুলাই রাত আটটায় পাকিস্তানি সেনারা প্রচণ্ডভাবে শালদা নদীতে আমাদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। আমাদের চতুর্থ বেঙ্গলের 'আলফা' কোম্পানি মেজর সালেকের নেতৃত্বে এ আক্রমণের মোকাবিলা করে। আমাদের সেনাদের গুলিতে পাকিস্তানি সেনাদের বিপুলসংখ্যক সদস্য হতাহত হয়। তারা পর্যুদস্ত হয়ে আক্রমণ বন্ধ করে রাত ১১টার দিকে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। সারা রাত উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকে। ভোর পাঁচটায় পাকিস্তানি সেনারা একটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে আবার শালদা নদীর দক্ষিণে গোরঙ্গলা অবস্থানের ওপর নতুনভাবে আক্রমণ শুরু করে। সেই সঙ্গে তারা আমাদের আশাবাড়ী অবস্থানেও হামলা চালায়। এ দুই আক্রমণ ও আমাদের মেশিনগানের গুলি ও মর্টারের গোলার সামনে তারা পর্যুদস্ত হয়। অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। দিনের আলোয় আমাদের সেনারা বাংকার থেকে অগ্রসরমাণ শত্রুদের হতাহত করে। পাকিস্তানি সেনারা তাদের আক্রমণ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় এবং পিছু হটে যায়। আমাদের সেনারা পলায়নপর শত্রুদের তাড়া করে। যুদ্ধের সময় আমাদের মর্টারের গোলায়

পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থিত একটি অ্যামিউনিশন ও রেশন-স্টোরে বিস্ফোরণ ঘটে, ফলে ২১ জন আহত ও কিছুসংখ্যক নিহত হয়। ওই দিনই লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবিরের একটি দল পাকিস্তানি সেনাদের লাতুমুড়াতে যে অবস্থান ছিল, তার পেছনে আক্রমণ চালায় এবং এতে বেশ কয়েকজনকে আহত ও নিহত হয়। অ্যান্টি-পার্সোনেল মাইন বিস্ফোরণে পাকিস্তানি সেনাদের গোসাইস্থ বিওপির একটি টহলদলের ১১ জন হতাহত হয়। ১৩ জুলাই ক্যাপ্টেন গাফফারের একটি দল সন্ধ্যা ছয়টায় মন্দভাগ বাজার এবং নাক্তের বাজার শত্রু-অবস্থানের ওপর মর্টারের সাহায্যে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের ১২ জন নিহত হয় এবং বেশ কয়েকটি বাংকারও ধ্বংস হয়। পাকিস্তানিরা আমাদের মন্দভাগ অবস্থানের ওপর কামানের সাহায্যে পাল্টা আক্রমণ চালায়। এতে আমাদের একজন নায়েক এবং তিনজন সেপাই আহত হয়।

আমাদের স্পেশাল কমান্ডোরা জুলাই মাসের ৯, ১০ ও ১১ তারিখে ঢাকা শহরে তাদের কার্যক্রম আরও তীব্র করে। গেরিলা কমান্ডার হাবিবুল আলম [হাবিবুল আলম বীর প্রতীক] ও কাজীর [কাজী কামাল উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম] নেতৃত্বে একটি ইমপ্রোভাইসড টাইম বোমা ফার্মগেটের কাছে পাঞ্জাবিদের 'মাহরুফ রেস্টুরেন্ট'-এ স্থাপন করা হয়। এ রেস্তোরাঁয় পাকিস্তানি সেনা ও দালালেরা সব সময় আসত। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বোমাটি বিস্ফোরিত হয় এবং এতে কয়েকজন দালালসহ ১৬ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। এর মধ্যে আটজন মারা যায় এবং ১২ জন আহত হয়। হলিক্রস কলেজ ভবনেরও কিছু ক্ষতি হয়।

চারজনের আরেকটি গেরিলাদল ডিআইটি ভবনের কাছে দুজন পাহারারত পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করে। এই দল এরপর সিদ্দিকবাজারের কাছে টহলরত পাকিস্তানি একটি সেনাদলকে অ্যামবুশ করে এবং দু-তিনজন পাকিস্তানি সেনা এতে নিহত হয়। মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক, নাজ সিনেমা হল, ওয়াপদা ভবন ইত্যাদি স্থানে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এসব ঘটনার ফলে পুরো ঢাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানি সেনারা ব্যতিব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ঢাকার স্বাভাবিক অবস্থাও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং এলাকাবাসীর মনোবল আরও বেড়ে যায়।

জুন মাসে আমি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সব ফ্রন্টে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলাম, সে সময় বুঝতে পারলাম, যদিও আমাদের যোদ্ধাদের আঘাতে পাকিস্তানি সেনাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল এবং আমাদের সংখ্যা দিন দিন

বেড়েই চলছিল, তবু আমাদের চেয়ে তাদের শক্তি অনেকাংশে বেশি ছিল। বিশেষ করে যেখানে পাকিস্তানি সেনারা শক্তিশালী ঘাঁটি গেড়ে বাংকারে অবস্থান নেয়, সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত করা আমাদের পক্ষে সব সময় সম্ভব হতো না। আমি সব সময় সংগঠিত গোলন্দাজ বাহিনীর অভাব অনুভব করতাম। বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তানি সেনাদের বেশ কয়েকটি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ছিল। এসব রেজিমেন্টে যেসব বাঙালি নিযুক্ত ছিল, ২৫ মার্চের পর অনেককে পাকিস্তানিরা হত্যা ও বন্দী করে। আবার অনেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায় এবং পরে সেসব গোলন্দাজ বাহিনীর সেনারা আমাদের সেক্টরে যোগ দেয়। তাদের আমি বিভিন্ন বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়োগ করি। যুদ্ধে এসব সেনা যথেষ্ট সাহসেরও পরিচয় দেয়। এ সেনাদের নিয়ে আমি একটি গোলন্দাজ বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিই। এ পরিপ্রেক্ষিতে গোলন্দাজ বাহিনীর সব সেনাকে কোনাবনে জড়ো করা হয়। একটি নতুন রেজিমেন্ট গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই কষ্ট নতুন রেজিমেন্টকেও বহন করতে হয়। এদের কোনো থাকার জায়গা ছিল না, খাওয়া ও রান্নার কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। রেজিমেন্টের জন্য বিভিন্ন রকমের প্রকৌশলী লোকের দরকার হয়, কিন্তু সব রকমের সেনা আমাদের ছিল না। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় জিনিস কামান ও অন্যান্য সরঞ্জাম, যা একটি গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, তাও আমাদের ছিল না। আমি বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের মিলিটারি অধিনায়কদের সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং অস্ত্রের জন্য অনুরোধ জানাই। অনেক ছোটাছুটির পর তারা কয়েকটি ৩.৭ ইঞ্চি ছোট কামান আমাদের দেয়। এ কামানগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ছিল এবং সম্ভবত সেকেলে হিসেবে পরিত্যক্ত ছিল। তবুও এগুলো পাওয়ার পর আমার গোলন্দাজ বাহিনীর লোকদের মধ্যে একটি নতুন সাড়া জাগে। তারা তৎক্ষণাৎ এ কামানগুলোর ওপর প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে দেয়। প্রকৌশলী লোকের অভাব থাকায় বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং গণবাহিনী থেকে লোক ভর্তি করে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ সময় ক্যাপ্টেন পাশা [আবদুল আজিজ পাশা] পাকিস্তান থেকে কোনোরকমে সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সে শত বাধাবিপত্তি ডিঙিয়ে গোলন্দাজ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধের জন্য মোটামুটি উপযুক্ত করে তোলে। এভাবে বাংলাদেশের প্রথম গোলন্দাজ বাহিনীর (ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট) জন্ম হয়। ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্টের নাম ছিল মুজিব ব্যাটারি। জন্মের পর জুলাই মাস থেকে ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে আমার

কয়েকটি সাবসেক্টরের কমান্ডারের অপারেশনকে ফলপ্রসূ করে তোলে। বিশেষ করে, শালদা নদী, কোনাবনে প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্টের সহায়তার জন্যই পাকিস্তানি বাহিনীর বারবার আক্রমণ ক্যাপ্টেন গাফফার ও মেজর সালেক প্রতিহত ও পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। ক্যাপ্টেন পাশার নেতৃত্বে আমাদের এই সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোলন্দাজ বাহিনীর সেনারা অনেক সময় এমনভাবে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে যে, গোলন্দাজ বাহিনীর ইতিহাসে এক অর্থে তা বিরল ছিল। পাকিস্তানি সেনাদের কাছে ছিল অত্যাধুনিক কামান, আর সেসব কামানের গোলা নিক্ষেপের ক্ষমতা ছিল বেশি। সব সময় পাকিস্তানি সেনাদের চেষ্টা ছিল তাদের কামানের গোলায় আমাদের এই ছোট পুরোনো কামানগুলোকে বিনষ্ট করে দেওয়া। সে জন্য বেশিক্ষণ আমাদের প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্ট কোনো জায়গাতেই থাকতে পারত না। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানিদের গোলা তাদের ওপর পড়ত। তা ছাড়া আমাদের পুরোনো কামানগুলোর গোলা ক্ষেপণের দূরত্ব ছিল পাকিস্তানিদের অর্ধেকেরও কম। সে কারণে অধিকাংশ সময় আমাদের প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্টের লোকেরা তাদের কামানগুলো মাথায় করে কাছে বা পেছনে দুর্গম রাস্তায় নিয়ে যেত এবং শত্রুদের ওপর আক্রমণ করত। এসব আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি সেনারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ত। ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্টের কৌশল ছিল কিছুটা কমান্ডো ধরনের। পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের মুক্তিবাহিনী যখন ডিসেম্বর মাসে ফেনী,



মুজিব ব্যাটারির কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছে　　ছবি : সংগৃহীত

নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়, তখন 'কে' ফোর্সের চতুর্থ বেঙ্গল, দশম বেঙ্গল এবং নবম বেঙ্গলকে প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্ট পাকিস্তানি বাহিনীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সাহায্য করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্টের দান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং ভবিষ্যতে গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য হবে এটা গৌরবের দৃষ্টান্ত।

জুলাই মাসের ১২ তারিখে লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবির সিঅ্যান্ডবি রাস্তার ওপর একটি প্লাটুনকে টহলে পাঠায়। টহলদলটি শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে খবরাখবর নেওয়ার জন্য কুট্টি পর্যন্ত অগ্রসর হয়। বেলা দুইটার সময় এই টহলদল যখন কুটির কাছে টহল দিচ্ছিল, তখন তারা বেশ কিছু গাড়িতে করে কুমিল্লা থেকে আসা পাকিস্তানি সেনাদের সমাবেশ করতে দেখতে পায়। কুট্টিতে গাড়ি থেকে নেমে ওদের এক ব্যাটালিয়নের মতো সেনা মন্দভাগ বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বাকি দুটি দলের একটি নয়নপুরের দিকে, অন্যটি লাতুমুড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আমাদের টহলদলটি বুঝতে পারে যে, পাকিস্তানি এসব সেনা নয়নপুর, মন্দভাগ বাজার ও লাতুমুড়ায় টি আলীর বাড়ির নিজেদের অবস্থানগুলো শক্তিশালী করার জন্য যাচ্ছে। মন্দভাগ বাজারের দলটি বাজারে এসে অবস্থান নেয় এবং দোকানের ভেতর বাংকার তৈরি করতে থাকে। এ ছাড়া তাদের অবস্থানের চারদিকের পাট ও ধান কেটে পরিষ্কার করে ফেলে, যাতে তাদের গুলি আমাদের সম্মুখবর্তী অবস্থানে এসে পড়ে। এসব সংবাদ টহলদলের হেডকোয়ার্টারসে এসে পৌঁছায়। সংবাদ পাওয়ার পর আমি পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটিগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠার আগেই তাদের ওপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিই। ক্যাপ্টেন গাফফারকে চতুর্থ বেঙ্গলের 'চার্লি' কোম্পানি দিয়ে ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্টের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় প্রথম মন্দভাগ বাজার আক্রমণ করার নির্দেশ দিই। ক্যাপ্টেন গাফফার তার কোম্পানি নিয়ে ১২ জুলাই বিকেলে প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্টের কামানগুলোসহ মন্দভাগ বাজার পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ছোট ছোট কয়েকটি দল পাঠিয়ে বাজার এবং শত্রু-অবস্থান সম্পর্কে খবরাখবর নেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন গাফফার তার কোম্পানি ও ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্টের সহায়তায় মন্দভাগ বাজারের শত্রু-অবস্থানের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আমাদের কামানগুলো গোপন পথে নৌকাযোগে বাজারের পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে অবস্থান নেয়। ক্যাপ্টেন গাফফারের আক্রমণের ঠিক পূর্বমুহূর্তে কামানগুলো থেকে অতি নিকটবর্তী শত্রু-অবস্থানের বাংকারগুলো এবং বাজারের ঘরগুলো লক্ষ করে প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করা হতে

থাকে। ফলে অনেক বাংকার ও ঘর ধ্বংস হয়ে যায় এবং বাজারে অবস্থিত পাকিস্তানি সেনারা আহত ও নিহত হয়। আকস্মিকভাবে এত কাছ থেকে কামানের গোলার আক্রমণ পাকিস্তানি সেনারা আশা করতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের অন্তত ৬০-৭০ জন হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের আর্তনাদ ও চিৎকার আমাদের লোকেরাও শুনতে পায়। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের প্রতিরোধশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে এবং তারা অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়। দুই ঘণ্টা যুদ্ধের পর মন্দভাগ বাজার এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র ক্যাপ্টেন গাফফারের দখলে আসে। এরপর দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত মন্দভাগ আমাদের দখলেই থাকে। এর পরদিন আমাদের একটি দল শালদা নদীতে অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। পাকিস্তানি সেনাদের একটি স্পিডবোট দুপুর একটায় অ্যামবুশের মধ্যে পড়ে যায়। অ্যামবুশ দলের গুলিতে স্পিডবোটটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ২০ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। কেউ কেউ নদীতে পড়ে ভেসে যায়। অ্যামবুশ দল পরে নিরাপদে মন্দভাগ অবস্থানে ফিরে আসে। এ সময় আমাদের হেডকোয়ার্টারসে খবর আসে যে, দাউদকান্দিতে পাকিস্তানি সেনারা ফেরিঘাটের কাছে ঘাঁটি স্থাপন করেছে। এখানে প্রায় দুই কোম্পানির মতো পাকিস্তানি সেনা বাংকার নির্মাণ করে ঘাঁটিটি বেশ শক্তিশালী করে তোলে। পাকিস্তানি সেনারা এখানে ঢাকা-কুমিল্লাগামী প্রতিটি গাড়ি দাঁড় করিয়ে অনুসন্ধান চালাত। তা ছাড়া নিকটবর্তী এলাকা স্পিডবোটে চেপে টহল দিতে থাকে। আমরা একটি প্লাটুন দাউদকান্দিতে পাঠিয়ে দিই। এদের সঙ্গে আরেকটি দল পাঠানো হয় সৈয়দনগর ওয়্যারলেস স্টেশন এবং ইলিয়টগঞ্জ রাস্তার সেতু ধ্বংস করার জন্য। আমাদের দলগুলো দাউদকান্দিতে গিয়ে গৌরীপুর নামক স্থানে তাদের ঘাঁটি তৈরি করে। এরপর শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে খবর নেয়। ১৩ জুলাই সন্ধ্যা আটটার সময় প্লাটুনটি দাউদকান্দির উত্তরে গোমতী নদীতে পাকিস্তানি সেনাদের একটি টহলরত স্পিডবোটকে অ্যামবুশ করে। এই অ্যামবুশে একজন লেফটেন্যান্ট এবং ২০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। অফিসারটির র‍্যাংকের ব্যাজ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা হয়। এরপর দলটি পরদিন রাতে সৈয়দনগর ওয়্যারলেস স্টেশনটি ধ্বংস করে দেয়। দলের অপর অংশ ইলিয়টগঞ্জের নতুন সেতুটিতে ডেমোলিশন লাগিয়ে দুটি স্প্যান উড়িয়ে দেয়। তাদের কাজ সম্পন্ন করে দলগুলি নিরাপদে হেডকোয়ার্টারসে ফেরত আসে।

কুমিল্লা-চাঁদপুর রাস্তায় হাজীগঞ্জের কাছে রামচন্দ্রপুরের সেতু উড়িয়ে দেওয়ার পর পাকিস্তানি সেনাদের যোগাযোগব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়। পাকিস্তানি

সেনারা ওই জায়গায় ফেরির বন্দোবস্ত করে। এই ফেরি-যোগাযোগকে বিনষ্ট করার জন্য লেফটেন্যান্ট মেহবুব একটি কোম্পানি রামচন্দ্রপুরে পাঠায়। ৬ জুলাই ভোরে দলটি রামচন্দ্রপুর ফেরিঘাটের কাছে অ্যামবুশ পাতে। এই দলের অন্য অংশ ফেরিঘাট থেকে আরও দক্ষিণে আরেকটি অ্যামবুশ পাতে। ওই দিনই সকাল সাতটার সময় পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল রামচন্দ্রপুর ফেরিঘাটে আসে। তাদের জিনিসপত্র যখন ফেরিতে ওঠানো হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় অ্যামবুশ দল তাদের ওপর গুলি চালায়। এতে পাকিস্তানি সেনাদের চারজন নিহত হয়। উভয় পক্ষে ঘণ্টা খানেক গোলাগুলি চলে। গোলাগুলির সংবাদ পেয়ে চাঁদপুর থেকে পাকিস্তানি সেনাদের প্রায় দুই কোম্পানি সেনা সাহায্যের জন্য আসে। পাকিস্তানি সেনারা ফেরিঘাটের কিছু দূরে এসে গাড়ি থেকে নামে এবং অ্যামবুশ-অবস্থানে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। ঠিক সে সময় আমাদের অন্য অ্যামবুশ দল তাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের ৩১ জন নিহত এবং ৫৪ জন আহত হয়। আমাদের একজন এনসিও এবং একজন সেপাই গুরুতর আহত হয়। এরপর আমাদের দলটি অ্যামবুশ-অবস্থান ত্যাগ করে। আসার পথে ৮ জুলাই মুদাফ্ফরগঞ্জ সড়কসেতুটি উড়িয়ে দিয়ে আসে। এরপর পাকিস্তানি সেনারা সেতুর নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামে মর্টারের সাহায্যে গোলাগুলি করে। সে সময় পাকিস্তানি সেনাদের অভ্যর্থনার জন্য স্থানীয় অনেক দালাল শান্তি কমিটির উদ্যোগে সভার আয়োজন করে এবং মিছিল সহকারে পাকিস্তানি সেনাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তানি সেনারা এ মিছিলের ওপর গুলি চালিয়ে তাদের অনেককে হত্যা করে।

আমাদের চাঁদপুর কোম্পানি যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে তাদের তৎপরতা আরও জোরদার করে। স্থানীয় লোকদের সহায়তার হাজীগঞ্জ ও লাকসাম, চাঁদপুর ও কুমিল্লার সিঅ্যান্ডবি রাস্তা এবং রেলসড়কের ২০০ গজ কেটে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এ সময়ে পাকিস্তানিরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিন ড্রাইভার ও শ্রমিক এনে রাস্তা মেরামত করার চেষ্টা চালায়। আমাদের গেরিলারা এই পাকিস্তানি রেল কর্মচারীদের পিটিয়ে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ফলে রেল ও সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে ২৬ জুলাই পাকিস্তানি বাহিনী একটি কোম্পানিকে চাঁদপুর থেকে এই এলাকায় পাঠায়। পাকিস্তানি সেনাদের কোম্পানিটি রেললাইন ধরে লাকসামের দিকে অগ্রসর হয়। ঠাকুরবাজারের কাছে আমাদের একটি

অ্যামবুশ দল আগে থেকেই অবস্থান নিয়ে ছিল। দুপুর দুইটার সময় পাকিস্তানি সেনাদের কোম্পানিটি যখন অ্যামবুশ-অবস্থানের মধ্যে আসে, তখন আমাদের দলটি তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। ফলে পাকিস্তানি সেনাদের একজন জেসিওসহ ২২ জন পাকিস্তানি সেনা আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে চাঁদপুরে পালায়। এর পরদিন আমাদের গেরিলারা মধু রেলস্টেশনের কাছে রেল ও সড়কসেতু ধ্বংস করে দেয় এবং যে পাকিস্তানি ইঞ্জিনিয়ার পরিদর্শনের জন্য আসে, তাকেও তারা আহত করে।

আমাদের ঢাকার গেরিলাদল তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। ব্রিটিশ সরকারের একটি পার্লামেন্টারি দল বাংলাদেশের সে সময়ের পরিস্থিতি সরেজমিনে জানার জন্য ঢাকায় আসে। দলটি ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অবস্থান করছিল। ২৪ জুন সকাল সাড়ে সাতটায় তারা হোটেলের ভেতরের লবিতে বসে বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঠিক সে সময় আমাদের তিনজন গেরিলা হোটেলের সামনের বারান্দায় দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়, অর্থাৎ সেই দলটিকে ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে এভাবেই অবহিত করে। এর কয়েক দিন পর আমাদের গেরিলারা জানতে পারে যে নারিন্দা 'গৌরী মন্দিরে' পাকিস্তানিদের অনেক দালাল সমবেত হয়ে আলোচনার আয়োজন করেছে। দালালেরা যখন আলোচনায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় আমাদের গেরিলারা আলোচনা সভায় একটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে ২০-২৫ জন পাকিস্তানি দালাল হতাহত হয়। ঢাকার গেরিলাদল টিঅ্যান্ডটি বিভাগের একজন পাকিস্তানি ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর গাড়িতে এম-১৪ মাইন দিয়ে বুবিট্র্যাপ লাগিয়ে রাখে। ফলে পাকিস্তানি ওই অফিসারসহ গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। পাকিস্তানি অফিসাররা মাঝে মাঝে ধানমন্ডির 'সাংহাই' চায়নিজ রেস্তোরাঁয় সান্ধ্য ভোজে আসত। এ সংবাদ পাওয়ার পর আমাদের একটি গেরিলাদল ৮ জুলাই রাত নয়টায় সেখানে যায়। পাকিস্তানি অফিসাররা সেখানে এলে তাদের ওপর গ্রেনেড ছোড়া হয়। ফলে দু-তিনজন পাকিস্তানি অফিসার নিহত হয়। পাকিস্তানি পুলিশ এ সময় রাতে ট্যাক্সিতে কিংবা জিপে চেপে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় টহল দিত। টহলরত এসব পাকিস্তানি পুলিশ সদস্যকে অ্যামবুশ করার জন্য ঢাকার গেরিলাদল একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তাদের গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ খবরাখবর নেওয়া হয়। ১০ জুলাই একটি পাকিস্তানি পুলিশ টহলদল ধানমন্ডি ২ নম্বর রোডের দিকে যাচ্ছিল। গেরিলাদের একটি দল তাদের পিছু নেয়। পুলিশের টহলদলটি ২ নম্বর রাস্তার মোড়ে যখন তাদের গতি কমিয়ে দেয়, ঠিক সে সময় গেরিলারা পুলিশের

গাড়িতে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। এতে একজন অফিসারসহ পাঁচজন পাকিস্তানি পুলিশ নিহত হয়। আমাদের গেরিলাদল নিরাপদে সে স্থান ত্যাগ করে। এর কদিন পর আমাদের আরেকটি গেরিলাদল নিউ বেইলি রোডে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি জিপের ওপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণে তিন-চারজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় এবং জিপটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত আমাদের গেরিলাদল পোস্ট অফিসের ভেতর বিস্ফোরণ ঘটায় এবং মণ্ডলপাড়া ও চৌধুরীবাড়ী ইলেকট্রিক সাবস্টেশনটি ১২ জুলাই রাত সাড়ে ১০টার সময় ধ্বংস করে দেয়। এ ছাড়া সিদ্ধিরগঞ্জ ও আশুগঞ্জের মাঝে একটি বৈদ্যুতিক পাইলনও উড়িয়ে দেয় তারা। শুধু তা-ই নয়, ধ্বংস করে তারা সিদ্ধিরগঞ্জ ও নরসিংদীর মাঝে দুটি বৈদ্যুতিক পাইলন। এর ফলে কাঞ্চন ও কালীগঞ্জের বেশ কয়েকটি শিল্পকারখানা বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর ফতুল্লা ও ঢাকার মাঝামাঝি পাগলা রেলসেতুটি উড়িয়ে দেয়। ফলে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার মধ্যে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় আমার হেডকোয়ার্টারসে খবর আসে যে পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানি বাহিনীর তত্ত্বাবধানে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ পরীক্ষা বানচাল করে দেওয়ার জন্য আমরাও একটি পরিকল্পনা নিই। এ পরিকল্পনানুযায়ী আমার হেডকোয়ার্টারস থেকে ঢাকার গেরিলাদলগুলোকে নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষার দিন সিদ্ধেশ্বরী স্কুল এবং আরও কয়েকটি স্কুলে পরীক্ষার ঠিক পূর্বমুহূর্তে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ফলে খুব কমসংখ্যক ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পরীক্ষা হলে আসে। ১৫ জুলাই রাতে একটি গেরিলাদল বকশীবাজারে অবস্থিত শিক্ষা বোর্ড অফিস আক্রমণ করে। ডেমোলিশন দিয়ে বোর্ড ভবনের বেশ কিছু অংশ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এতে বোর্ডের বেশ কিছু দলিল ও কাগজপত্র ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে এ পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয় এবং অনেক ছাত্রছাত্রী ইচ্ছাকৃতভাবেই পরীক্ষা বর্জন করে।

হাবিলদার গিয়াসের [গিয়াস উদ্দিন আহাম্মদ] নেতৃত্বে আমাদের মুরাদনগরের দলটি ১৬ জুলাই রাত একটার সময় ইলিয়টগঞ্জের দেড় মাইল পশ্চিমে পুটিয়া গ্রামের সামনে কুমিল্লা-দাউদকান্দি সড়কের ওপর কয়েকটি অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন পুঁতে রাখে। পরদিন সকালে পাকিস্তানি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা ওয়াপদার একটি ট্রাক মাইনে বিস্ফোরিত হয়। ফলে ট্রাকটি ধ্বংস হয়ে যায়। এতে অবস্থানরত একজন পাকিস্তানি সেনা, দুজন

রাজাকার ও ড্রাইভারসহ সবাই নিহত হয়। পরে পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি জিপ ও ট্রাক অ্যান্টি-ট্যাংক মাইনে বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস হয়। ফলে পাঁচজন পাকিস্তানি সেনা, একজন পাকিস্তানি মেজর ও ছয়জন রাজাকার নিহত হয়। এ সংবাদ পেয়ে কুমিল্লা থেকে পাকিস্তানি সেনারা ৩০টি গাড়িতে করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের গাড়িগুলো ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে এসে দাঁড়ায়।

সামনের গাড়ি থেকে বেশ কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা নেমে আস্তে আস্তে ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের পুঁতে রাখা অ্যান্টি-পার্সোনেল মাইনের বিস্ফোরণে তাদের ছয়-সাতজন লোক নিহত হয় এবং আরও অনেকে আহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা আর সামনে এগোয়নি। সারা দিন পাকিস্তানি সেনারা মাইন ডিটেকটরের সাহায্যে ঘটনাস্থলের চারদিকে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালায়। সব বেসামরিক যাতায়াতও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে মুক্তিবাহিনীর সন্ধানে ব্যাপক তল্লাশি শুরু করে। হাবিলদার গিয়াসের দলের একজন নায়েক মোস্তফা কামাল স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মিশে পাকিস্তানি সেনাদের দুরবস্থা দেখে। দাউদকান্দি থেকে পশ্চিমে নারায়ণগঞ্জ এবং দাউদকান্দি সড়কের ওপর বাউসিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ছিল। সেতুটি সম্পূর্ণ কংক্রিটের তৈরি এবং বেশ মজবুত। সেতুটি ধ্বংস করার জন্য জুলাই মাসের প্রথমে আমি মো. রফিক নামে একজন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাকে মনোনীত করি। আরেকজন গেরিলাকে তার সঙ্গে সেতুটি রেকি করার জন্য পাঠাই। মো. রফিক সেতুটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রেকি করে এবং সেতুটির একটি নকশা বানিয়ে নিয়ে আসে। এরপর অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর ছেলে ভাষণের নেতৃত্বে ১০ জনের একটি ডেমোলিশন দল রফিককে সঙ্গে দিয়ে বাউসিয়া সেতুটি ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়ে দিই। দলটি প্রথম মুরাদনগরে গিয়ে তাদের স্থানীয় ঘাঁটি তৈরি করে। এরপর তারা গোমতী নদী পার হয়ে বাউসিয়ায় পৌঁছায়। সেখানে এক দিন থাকার পর স্থানীয় গেরিলাদের সাহায্য নিয়ে ১২ জুলাই রাতে বাউসিয়া সেতুতে ডেমোলিশন লাগায়। কিন্তু ডেমোলিশন বিস্ফোরণের সময় 'ইগনিশন' ঠিকমতো কাজ করেনি। এরই মধ্যে স্থানীয় দালাল চেয়ারম্যান এবং রাজাকার পাকিস্তানি বাহিনীকে খবর দেয়। পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার হঠাৎ করে ভাষণের ডেমোলিশন দলের ওপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ভাষণের দলের তিনজন গেরিলা গুরুতর আহত হয়। এ তিনজনের মধ্যে একজন স্থানীয় বিশিষ্ট

মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রাজ্জাক কোরাইশীও ছিল। গেরিলাদলটি ইগনিশন কাজ না করার দরুন সেতু উড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের চাপে অবস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তারা আহত গেরিলাদের সঙ্গে করে আনতে সক্ষম হলেও যেসব বিস্ফোরক সেতুটিতে লাগানো হয়েছিল, সেগুলি উঠিয়ে আনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং তারা ২৬০ পাউন্ড টিএনটি সেখানেই ফেলে রেখে হেডকোয়ার্টারসে ফেরত আসে। এত বিরাট পরিমাণ টিএনটি শত্রুর হাতে পড়া ও নষ্ট হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে ছিল একটি বিরাট ক্ষতির কারণ। ওই সময় বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আমাদের খুব কম ছিল। অনেক চেষ্টার পর হয়তো কিছু কিছু আমরা জোগাড় করতে সক্ষম হতাম। ঢাকা-কুমিল্লা রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া আমার লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্য এভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় আমি যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং এর পরই আবার বিস্ফোরক জোগাড় করার চেষ্টায় থাকি। দু-তিন সপ্তাহ পরে অনেক কষ্টে আবার কিছু পরিমাণ টিএনটি সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। টিএনটি জোগাড় করার পর আমি মো. রফিককে ডেকে পাঠাই। শেষ পর্যন্ত আমরা বাউসিয়ার সেতুটি উড়িয়ে দিয়ে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলাম।

লাতুমুড়াতে লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে যে কোম্পানি অবস্থান নিয়েছিল, সেই অবস্থানের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী তাদের চাপ অব্যাহত রাখে। লাতুমুড়ার উত্তরে চন্দ্রপুর ও ইয়াকুবপুরে পাকিস্তানি সেনারা তাদের অবস্থানগুলো আরও জোরদার করে তোলে এবং লাতুমুড়া অবস্থান থেকে আমাদের বিতাড়িত করার চেষ্টা করে। লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবিরের কোম্পানি পাকিস্তানি বাহিনীর প্রচণ্ড চাপের মুখেও তাদের অবস্থান সাহসের সঙ্গে ধরে রাখে। মুক্তিযোদ্ধারা এই অবস্থান থেকে প্রায়ই পাকিস্তানি সেনাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাতে থাকে। ১৭ জুলাই বিকেল চারটায় আমাদের ওপি দেখতে পায় যে লাতুমুড়া থেকে শত্রুপক্ষের একটি দল চন্দ্রপুরের শত্রু-অবস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবির তৎক্ষণাৎ একটি প্লাটুন চন্দ্রপুরের রাস্তায় পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি চন্দ্রপুর থেকে একটু দূরে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা যখন সেই অবস্থানে পৌঁছায়, ঠিক তখনই তদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালানো হয়। ফলে চারজন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং একজন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা অ্যামবুশ থেকে বাঁচার জন্য লাতুমুড়ায় পালিয়ে যায়।

২০ জুলাই সকাল নয়টার সময় একটি প্লাটুনকে পাকিস্তানি সেনাদের ইয়াকুবপুর, চন্দ্রপুর ও বগাবাড়ী অবস্থানের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য পাঠানো হয়। প্লাটুনটি গোপন পথে গ্রামের ভেতর দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের খুব কাছে যেতে সমর্থ হয়। রেকি করার পর তারা দেখতে পায়, পাকিস্তানি সেনাদের কিছু লোক বিভিন্ন বাংকারের ওপর বসে চা পানে ব্যস্ত এবং তাদের পাহারার ব্যবস্থা বেশ শিথিল। এ ছাড়া আরও তিন থেকে চারটি দল বাংকারের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের একজন ওপি গাছের ওপর বসা ছিল। আমাদের প্লাটুনটি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে তাদের বাংকারগুলোর খুব কাছে পৌঁছায়। প্রথমে তারা ওপিকে গুলি করে গাছ থেকে ফেলে দেয় এবং পাকিস্তানি সেনাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। যেসব পাকিস্তানি সেনা বাংকারের ওপর দাঁড়িয়ে এবং বসে চা পানে ব্যস্ত ছিল, গোলাগুলিতে তারা সঙ্গে সঙ্গে আহত ও নিহত হয়। নিকটবর্তী একটি ঘর থেকে কিছু পাকিস্তানি সেনা বেরিয়ে আসে এবং বাংকারের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারাও আহত ও নিহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনাদের প্রতি-আক্রমণ করার আগেই আমাদের প্লাটুনটি অবস্থান ছেড়ে নিজেদের এলাকায় নিরাপদে ফিরে আসে। এ সংঘর্ষের ফলে ১৩ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয়। আমাদের একজন সদস্য গুরুতর আহত হয়।

শালদা নদীতে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে চতুর্থ বেঙ্গলের 'আলফা' ও 'চার্লি' কোম্পানি তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। পাকিস্তানি সেনারা শালদা নদী রেলস্টেশন থেকে নয়নপুরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছিল। ১৭ জুলাই তদের একটি দল রেলস্টেশনের প্রায় ১ হাজার গজ দক্ষিণে মনোরা রেলসেতু পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সেতুর কাছে এসে পাকিস্তানি সেনাদলটি সেতুর চারদিকে বাংকার তৈরির প্রস্তুতি নেয়। বেলা সাড়ে ১২টার সময় 'আলফা' কোম্পানির একটি প্লাটুন মর্টারসহ পাকিস্তানি সেনাদলটির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি সেনারা সম্পূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের বেশ কিছু লোক আহত ও নিহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা উপায়ান্তর না দেখে আবার শালদা নদীর দিকে পিছু হটে যায়। পরদিন সকাল নয়টার সময় শালদা নদী থেকে পাকিস্তানি সেনারা আবার মনোরা সেতুর দিকে অগ্রসর হয়। সকাল নয়টায় আমাদের সেনারা আবার তাদের বাধা দেয় এবং পাকিস্তানি সেনাদের ওপর মর্টার ও কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। ফলে পাকিস্তানি সেনাদের চারজন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা আর অগ্রসর না হয়ে পিছু হটে মনোরা সেতুর উত্তরে

অবস্থান নেয়। ১৯ জুলাই পাকিস্তানি সেনারা সেতুর দক্ষিণে আবার অবস্থান নিয়ে বাংকার খোঁড়ার চেষ্টা করে। এবারও পাকিস্তানিরা আমাদের মর্টার, কামান ও মেশিনগানের গোলাগুলিতে অনেকে হতাহত হলে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পরে স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা যায়, পাকিস্তানি সেনারা আহত ও নিহত সঙ্গীদের নৌকায় করে পেছনে নিয়ে যায়। এদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সংবাদ জানা না গেলেও পরে জানা যায় যে তাদের আটজন নিহত এবং ১৪ জন আহত হয়। ২১ জুলাই সন্ধ্যায় চতুর্থ বেঙ্গলের 'আলফা' কোম্পানির একটি প্লাটুন শালদা নদীর অবস্থানের ভেতরে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আক্রমণে আটজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও সাতজন আহত হয়। দেড় ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের দলটি শত্রু-অবস্থান ত্যাগ করে নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসে। এই আক্রমণের সঙ্গে আমাদের ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বহু পাকিস্তানি সেনাকে হতাহত করে। জুলাই মাসে কুমিল্লায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং কিছুটা সফলও হয়েছিল। এ সময় কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনারা তাদের ক্যাম্প গড়ে তুলেছিল। এসব ক্যাম্প থেকে তারা শহরে ঘন ঘন টহল চালাত। কুমিল্লায় পাকিস্তানি সেনাদের এই তৎপরতা খর্ব করার জন্য আমাদের গেরিলাদের ২০ জনের দল একটি ৩ ইঞ্চি মর্টারসহ কুমিল্লার উত্তরে অনুপ্রবেশ করে। ২০ জুলাই সকাল সাড়ে ১০টার সময় গেরিলাদলটি কুমিল্লা শহরে পাকিস্তানি সেনাদের বিভিন্ন অবস্থানের ওপর মর্টারের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ করে। একটি গোলা আজাদ স্কুলে, একটি সাধনা ঔষধালয়ের কাছে, একটি গোয়ালপট্টিতে, একটি কালীবাড়ির কাছে এবং একটি গোলা এসডিওর [মহকুমা প্রশাসক] অফিসের কাছে বিস্ফোরিত হয়। গোলাগুলো বিস্ফোরণের ফলে পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের দিকে ছুটতে থাকে। বিশেষ করে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সদ্য আসা সেনারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। অনেক পাকিস্তানি সেনা স্থানীয় লোকজনের কাছে সেনানিবাসের রাস্তা জানতে চায়। আবার অনেকে ভয়ে সেতুর তলায় লুকিয়ে পড়ে।

কুমিল্লায় যখন গেরিলারা তাদের তৎপরতা চালাচ্ছিল, ঠিক সে সময় গেরিলাদের আরেকটি দল চাঁদপুরেও তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। ১৭ জুলাই রাত ১০টায় বাবুরহাটের পূর্বে কুমিল্লা-চাঁদপুর রাস্তায় আশিকাটি গ্রামের কাছে যখন পাকিস্তানি সেনাদের একটি গাড়ির বহর যাচ্ছিল, তখন আমাদের

গেরিলারা গাড়িতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে আটজন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়। ১৯ জুলাই দুপুর একটার সময় বাবুরহাটে পাকিস্তানি সেনাদের একটি গাড়ির ওপর গেরিলারা গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে পাঁচজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও সাতজন আহত হয়।

১১ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় দুজন গেরিলা চাঁদপুর পাওয়ার স্টেশনের সামনে পাহারারত দুজন পাকিস্তানি সেনা ও দুজন পাকিস্তানি পুলিশের ওপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে তারা নিহত হয়। চাঁদপুরে শান্তি কমিটির দালালদের একটি আলোচনা সভায় গ্রেনেড নিক্ষেপ করার পর সাতজন দালাল আহত হয়। এ ছাড়া ইলিয়টগঞ্জেও পাকিস্তানি সেনাদের স্থানীয় এক দালালের লঞ্চ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এসব কার্যকলাপের ফলে স্থানীয় লোকজনদের মনোবল আবার বেড়ে যায়। তারা মুক্তিবাহিনীর ওপর আস্থা ফিরে পায়।

কসবার উত্তরে কাশিমনগর রেলসেতুর কাছে পাকিস্তানিদের দুটি প্লাটুন অবস্থান নিয়ে সেতুটিকে পাহারার কাজে নিযুক্ত ছিল। সেতুটি ধ্বংস করার জন্য আমি ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনকে নির্দেশ দিই। নির্দেশ পাওয়ার পর ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন সেতুটি রেকি করার জন্য ডেমোলিশন এক্সপার্টসহ একটি রেকি দল পাঠায়। এই রেকি দল শত্রু-অবস্থান সম্পর্কে এবং সেতু সম্পর্কে বিস্তারিত খবরাখবর নিয়ে আসে। এরপর ১৮ জুলাই রাত দুইটায় একটি রেইডিং প্লাটুন ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনের নেতৃত্বে কাশিমপুর সেতুর উদ্দেশে রওনা হয়। রাত আটটার সময় সেতুর নিকটবর্তী পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর আমাদের প্লাটুন আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে ১৭ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। যারা বেঁচেছিল তারা অবস্থান ত্যাগ করে খাইরাতুল্লায় পালিয়ে যায়। আমাদের রেইডিং দল সেতুতে বিস্ফোরক লাগিয়ে তা ধ্বংস করে দেয়। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে।

আমি তখন কুমিল্লা ও নোয়াখালী এলাকায় যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম। এই সময় শত্রুদের খবরাখবর নেওয়ার জন্য একটি ইন্টেলিজেন্স নেট স্থাপন করি। এদের দায়িত্ব ছিল শত্রুদের সম্পর্কে বিস্তারিত খবর আমাদের কাছে পাঠানো। বিশেষ করে, ওই সব ইন্টেলিজেন্সে এমন কিছু লোক কাজ করত, যাদের সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। যেমন লাতু মিয়া। সে কুমিল্লা সেনানিবাস হাসপাতালে মালির কাজ করত। সে আমাদের খবর পাঠায়, সেনানিবাসে পাকিস্তানি সেনাদের দুটি ব্রিগেড আছে এবং সেখানে একটি

ডিভিশন হেডকোয়ার্টারস স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া ৫০০-৬০০ রাজাকার ও ৫০০ সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। সে আরও খবর পাঠায়, কুমিল্লা সেনানিবাসের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা খুবই মজবুত করা হয়েছে এবং এই প্রতিরক্ষাব্যূহ সেনানিবাসের বাইরে উত্তরে গোরা কবরস্থান পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে। কুমিল্লা বিমানবন্দরেও একটি ব্যাটালিয়ন শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরি করেছে। কুমিল্লা ও নোয়াখালী এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের শক্তি এক ডিভিশনেরও বেশি। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের এত শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের মনোবল বেশ কমে গেছে। সাধারণ সেপাইরা এ যুদ্ধের নৈরাশ্যজনক ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করত। আসলে তাদের জোর করে যুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছিল। সে জন্য তারা অসন্তোষ প্রকাশ করত। তাদের মধ্যে পলায়নপর মনোভাব খুবই প্রবল। তারা যুদ্ধ-এলাকা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে খুবই ইচ্ছুক। তারা আমাদের আরও খবর পাঠায় যে পাকিস্তানি সেনাদের হতাহতের সংখ্যা খুবই বেশি। শুধু সেনানিবাস হাসপাতালেই ৫০০ থেকে ৬০০ আহত সেনা চিকিৎসাধীন ছিল। হাসপাতালে স্থানের অভাবে তাঁবুর ভেতরে অনেক আহত সেনাকে রাখা হয়েছে এবং গুরুতর আহত সেনাদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আহতদের সংখ্যা এত বেশি হওয়ার জন্যও সাধারণ সেনাদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল। কুমিল্লা শহরে আমাদের এবং পাকিস্তানিদের তৎপরতার ফলে লোকজন শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। শহরবাসী পরিচয়পত্র ছাড়া শহরে বের হতে পারছিল না। কুমিল্লার উত্তরে পাকিস্তানি সেনারা আমাদের কোটেশ্বর-অবস্থান পুনর্দখলের জন্য চেষ্টা চালায়। ২৪ জুলাই পাকিস্তানি সেনাদের একটি কোম্পানি গোঙ্গজ পার হয়ে কোটেশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সকাল ১০টায় পাকিস্তানি সেনাদের কোম্পানিটি যখন আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের সামনে পৌঁছে যায়, তখন আমাদের মুক্তিবাহিনীর সেনারা মর্টার ও হালকা মেশিনগানের সাহায্যে তাদের অগ্রগমনে বাধা দেয়। আমাদের গোলাগুলিতে পাকিস্তানি সেনাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবু পাকিস্তানি সেনারা তাদের আক্রমণের চাপ অব্যাহত রাখে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারাও সাহসের সঙ্গে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। পাকিস্তানি সেনাদের হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ বন্ধ করে দুই ঘণ্টা পরে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এই সংঘর্ষের ফলে পাকিস্তানি সেনাদের ১৫ জন হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা সারা দিন আমাদের অবস্থানের ওপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করে।

ওই দিনই কোটেশ্বর ও কসবার অবস্থান থেকে দুই দল গেরিলা বুড়িচং থানার কাছে একটি সড়কসেতু, তিনটি বিদ্যুৎ পাইলন এবং কসবার কাছে একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। বেলুনিয়াতে আমাদের সেনারা যখন পাকিস্তানিদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত এবং পাকিস্তানিরা ফেনীর দিক থেকে বেলুনিয়া সেতুতে ঢোকার চেষ্টা করছিল, ঠিক সেই সময় পাকিস্তানি সেনারাও আমাদের পেছনে ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তারা কিছুসংখ্যক দালালকে এ কাজে নিয়োগ করে। মাইনসহ এ দালালদের তারা আমাদের অবস্থানের পেছনে পাঠায়। দালালেরা আমাদের লাইনের পেছনে রাস্তায় ছয়টি অ্যান্টি-পার্সোনেল ও নয়টি অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন লাগায়। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের সতর্কতার জন্য এই অ্যান্টি-ট্যাংক মাইনগুলোতে আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। মাইন পোঁতার খবর একজন স্থানীয় লোক আমাদের বেলুনিয়া হেডকোয়ার্টারসে পাঠিয়ে দেয়। খবর পাওয়ামাত্র হেডকোয়ার্টারস থেকে আমাদের একটি ডেমোলিশন বিশেষজ্ঞ দল গাইডের সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তৎক্ষণাৎ মাইনগুলো নিষ্ক্রিয় করে দেয়। আমরা স্থানীয় লোকদের পাকিস্তানি ধ্বংসাত্মক তৎপরতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে বলি। এরপর যখনই পাকিস্তানি দালালেরা এ রকম ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য আমাদের অবস্থানের পেছনে আসার চেষ্টা করেছে, স্থানীয় জনগণ তাদের সে চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

জুলাই মাসের শেষের দিকে লেফটেন্যান্ট মেহবুব তাঁর সাবসেক্টর মিয়াবাজার, চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে তৎপরতা জোরদার করে। পাকিস্তানি সেনারা মিয়াবাজারে যে ক্যাম্প করেছিল, সেখান থেকে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রাস্তা আবার খোলার চেষ্টা করে। লেফটেন্যান্ট মেহবুব মিয়াবাজার সাবক্যাম্পটি রেইড করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৩ জুলাই লেফটেন্যান্ট মেহবুব ১৫ জনের একটি কমান্ডো প্লাটুনকে মিয়াবাজারে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প রেইড করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। দলটি সন্ধ্যায় মিয়াবাজারের কাছে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে তাদের একটি ছোট রেকি দল পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর সংগ্রহ করে। রাত ১২টায় কমান্ডো দলটি গোপন পথে অগ্রসর হয়ে শত্রু-অবস্থানের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। এ হামলার জন্য পাকিস্তানি সেনারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। হামলায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। আমাদের কমান্ডো দলটি এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের বেশ কয়েকটি বাংকার গ্রেনেড ছুড়ে উড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানি সেনারা আক্রান্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে এবং আমাদের সেনাদের

গুলিতে প্রায় ২০ জন নিহত এবং ১০ জন আহত হয়। এক ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পর আমাদের কমান্ডো দল পাকিস্তানি সেনাদের বিপুল ক্ষতিসাধন করে। শত্রুসেনাদের অবস্থান ছেড়ে মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে চলে আসে।

চাঁদপুরে পাকিস্তানিরা তাদের ঘাঁটি আরও শক্তিশালী করে তোলে। চাঁদপুরের এ ঘাঁটি থেকে তারা বিভিন্ন জায়গায় গাড়িতে টহল দিত। টহলের জন্য দু-তিনটি জিপ ও দু-তিনটি তিন টনের ট্রাক গাড়ির বহরের আকারে ব্যবহার করত তারা। পাকিস্তানি সেনারা এসব টহল ভোরে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ও রাত ১২টার পর চালাত এবং প্রতিটি গাড়ির ব্যবধান থাকত ৫০ থেকে ১০০ গজের মধ্যে। এ সংবাদ স্থানীয় গেরিলারা লেফটেন্যান্ট মেহবুব কাছে পৌঁছে দেয়। খবর পেয়ে ২০ জুলাই লেফটেন্যান্ট মেহবুব দুটি প্লাটুন চাঁদপুরের পূর্ব দিকে পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুন দুটি চাঁদপুর থানার আশিকাটির কাছে অ্যামবুশ পাতে। পরদিন ভোর পাঁচটায় চাঁদপুর থেকে একটি টহল গাড়ির বহর আশিকাটির দিকে অগ্রসর হয়। গাড়ির বহর যখন অ্যামবুশ-অবস্থানের মাঝে পৌঁছে যায়, ঠিক তখনই আমাদের অ্যামবুশ দল মেশিনগান ও হালকা মেশিনগানের সাহায্যে গুলি চালায়। এর ফলে গাড়ির বহরের প্রথম তিনটি জিপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রাস্তা থেকে পড়ে যায় এবং অবশিষ্ট গাড়িগুলোরও যথেষ্ট ক্ষতিসাধিত হয়। পাকিস্তানি সেনারা গাড়ি থেকে নেমে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের অ্যামবুশ দলের গুলিতে তাদের অন্তত ১০ জন নিহত এবং ২৫ জন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা গুলির মুখে টিকতে না পেরে পালিয়ে যায়। ওই দিন আশিকাটির তিন মাইল পশ্চিমে সন্ধ্যায় আমাদের আরেকটি অ্যামবুশ দল পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি গাড়ির বহরকে অ্যামবুশ করে। এতে পাকিস্তানি সেনাদের তিনজন নিহত, পাঁচজন আহত এবং একটি ট্রাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমাদের অ্যামবুশ দলের হস্তগত হয়। এ ছাড়া একটি মোটরসাইকেলও দখল করে নেয় অ্যামবুশ দল। মুক্তিসেনাদের অ্যামবুশের খবর পেয়ে পাকিস্তানি সেনারা তাদের হাজীগঞ্জ ক্যাম্প থেকে একটি শক্তিশালী কোম্পানি আমাদের অ্যামবুশ দলকে আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। কোম্পানিটি এক ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ততক্ষণে আমাদের অ্যামবুশ দল সংঘর্ষ শেষে মোটামুটি প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছিল। পাকিস্তানি সেনারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অ্যামবুশ দল আবার তাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এতে পাকিস্তানি সেনাদের ১২ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। এরপর আমাদের

দলটি অবস্থান ত্যাগ করে নিরাপদে নিজ ঘাঁটিতে ফিরে আসে। পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল হাজীগঞ্জের কাছে নরসিংহপুরে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। এ ঘাঁটি থেকে পাকিস্তানি সেনারা ওই এলাকার চারদিকে ত্রাসের সৃষ্টি করে। এ ঘাঁটিকে আক্রমণ করার জন্য লেফটেন্যান্ট মেহবুব নিয়মিত ও গণবাহিনীর একটি সম্মিলিত কোম্পানি পাঠিয়ে দেয়। কোম্পানিটি ১৭ জুলাই হাজীগঞ্জের দক্ষিণে তাদের অস্থায়ী গোপন অবস্থান তৈরি করে। এরপর টহলদল পাঠিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করে। ১৭ জুলাই সন্ধ্যায় আমাদের কোম্পানিটি পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি সেনাদের ১৩ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়। এরপর আমাদের কোম্পানি নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসে।

ফরিদপুরে আমাদের গেরিলাদল তাদের কার্যকলাপ জুন মাস থেকে চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন বেসামরিক শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অচল করে দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১২ জুন গেরিলারা চিকা নদী তহশিল অফিস ও মুন্সেফ অফিস ধ্বংস করে এবং সব অফিশিয়াল কাগজপত্র জ্বালিয়ে দেয়। ১৮ জুলাই একটি গেরিলাদল গোঁসাইরহাট থানার দামুদিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ওপর আক্রমণ চালিয়ে সেটি ধ্বংস করে। ফাঁড়ি থেকে পাঁচটি রাইফেল, প্রচুর গুলি এবং একটি ওয়্যারলেস সেট দখল করে। গেরিলাদল দামুদিয়া তহশিল অফিস ও সার্কেল অফিস জ্বালিয়ে দেয়। এ ঘটনার দুই দিন পর আরেকটি গেরিলাদল ভেদেরগঞ্জ থানা [বর্তমান শরীয়তপুর জেলার অন্তর্গত। তখন মহকুমা] আক্রমণ করে। এতে দুজন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ আহত হয়। আমাদের গেরিলারা একটি ওয়্যারলেস সেট হস্তগত করে। সঙ্গে সঙ্গেই তহশিল অফিস ও পালং থানার [শরীয়তপুর জেলার অন্তর্গত। তখন মহকুমা] আঙ্গারিয়া বাজারে জুট গোডাউনে আগুন লাগিয়ে ২৫ হাজার মণ পাট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। গেরিলারা আঙ্গারিয়া তহশিল অফিসও জ্বালিয়ে দেয়। এসব কার্যকলাপের ফলে মাদারীপুরের শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে যায়।

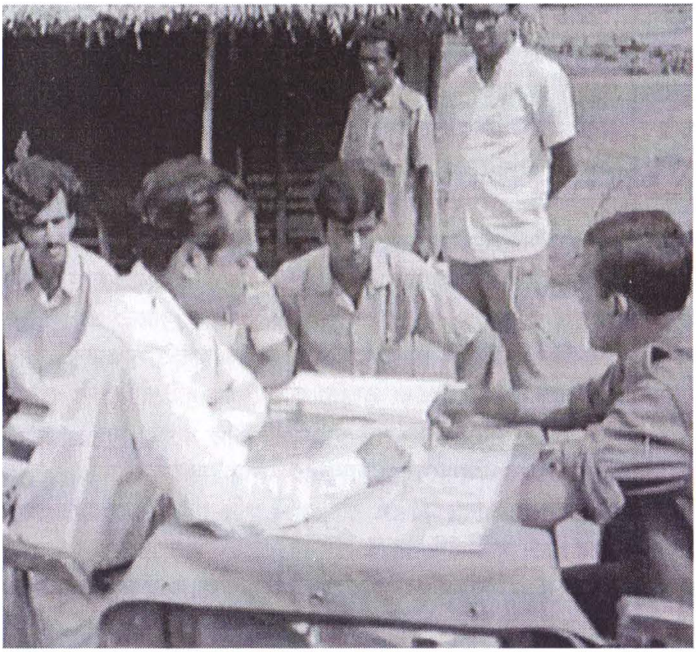
শালদা নদী ও মন্দভাগে ক্যাপ্টেন গাফফার ও মেজর সালেক পাকিস্তানি বাহিনীকে বারবার আঘাত করতে থাকে। আমাদের রেকি দল খবর নিয়ে আসে, ২৪ জুলাই বেলা তিনটার সময় পাকিস্তানি সেনারা নওগাঁ স্কুলে স্থানীয় দালালদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। এ সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন গাফফার মর্টারসহ একটি প্লাটুন নওগাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়। বিকেল

পাঁচটায় পাকিস্তানি সেনাদের ৫০-৬০ জন ও স্থানীয় দালালেরা স্কুল প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে তাদের আলোচনা সভা শুরু করে। সভা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই আমাদের প্লাটুন মর্টারের সাহায্যে পাকিস্তানি সেনাদের এ সমাবেশের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ফলে আলোচনা সভা ভেঙে যায় এবং পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সাতজন দালালসহ পাকিস্তানি সেনাদের ৩০ জন নিহত হয়। আমাদের প্লাটুন নিরাপদে ফিরে আসে। পাকিস্তানি সেনারা শালদা নদীর দক্ষিণে মনোরা ভাঙা রেলসেতুটি মেরামত করার জন্য আবার চেষ্টা চালায়। ২৬ জুলাই সকাল ১০টায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল তাদের শালদা নদী অবস্থান থেকে মনোরা সেতুর কাছে সমবেত হয়। এরপর সেতুর চারদিকে তারা বাংকার তৈরির প্রস্তুতি নেয়। সংবাদ পেয়ে মেজর সালেক মর্টারসহ একটি প্লাটুন পাকিস্তানি সেনাদের মনোরা সেতু থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয়। বিকেল চারটায় আমাদের দলটি আগরতলার কাছে অবস্থান নেয় এবং পাকিস্তানি সেনাদের ওপর মর্টার ও মেশিনগানের সাহায্যে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আমাদের গোলাগুলিতে পাকিস্তানি সেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অনেকে হতাহত হয়। মনোরা সেতু থেকে তারা পালিয়ে যায়। পরে বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানতে পারি, পাকিস্তানি সেনাদের কমপক্ষে চারজন নিহত এবং অনেক আহত হয়।

২৬ জুলাই ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন একটি অ্যামবুশ দল নোয়াগাঁও ও আকসিনার মাঝামাঝি রাস্তায় অ্যামবুশ পাতে। পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল নোয়াগাঁও পথে সেই অ্যামবুশে পড়ে যায়। ফলে সাতজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও চারজন আহত হয়। আমাদের একজন গুরুতর আহত হয়। প্লাটুনটি ফেরার পথে কল্যাণসাগরে আবার একটি অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। পাকিস্তানি সেনাদের একটি কোম্পানি সায়েদাবাদ থেকে কসবার পথে সেই অ্যামবুশে পড়ে যায়। ফলে ২১ জন পাকিস্তানি সেনা ও একজন দালাল নিহত হয় এবং নয়জন আহত হয়। পাকিস্তানি টহলদলের একটি ট্রাকও ধ্বংস হয়। ওই দিনই ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনের একটি কমান্ডো দল বগাবাড়ীতে একটি রেলসেতু ও দু-তিনটি টেলিফোন পাইলন উড়িয়ে দেয়।

আমরা যেসব গেরিলাকে ঢাকা ও কুমিল্লার পশ্চিম ও ভৈরববাজার এলাকায় পাঠাতাম, তারা কসবার উত্তর দিক দিয়ে ছাতুরা ও নবীনগর হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় অনুপ্রবেশ করত। এসব গেরিলা সম্পর্কে এবং আমাদের নিয়মিত বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে খবরাখবর নেওয়ার জন্য

পাকিস্তানি সেনারা দালালদের নিযুক্ত করে এবং আমাদের অনুপ্রবেশের রাস্তা বন্ধ করার জন্য রাস্তায় ও নদীপথে রাজাকারদের পাহারায় মোতায়েন করে। ওই সব দালাল ও রাজাকার আমার অপারেশনে বাধার সৃষ্টি করছিল। দালালদের ধরার জন্য এবং রাজাকারদের সমুচিত শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন ও লেফটেন্যান্ট হারুনকে নির্দেশ দিই। নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন ও লেফটেন্যান্ট হারুন বিভিন্ন স্থানে তাদের লোকজনকে দালালদের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয় এবং অ্যামবুশ পেতে রাখে। ২৫ জুলাই সন্ধ্যায় নরসিংদীর কাছে লেফটেন্যান্ট হারুনের লোক পাকিস্তানি সেনাদের ছয়জন দালালকে অ্যামবুশ করে বন্দী করে। এদের কাছে ১৪ পাউন্ড বিস্ফোরক, তিনটি গ্রেনেড পাওয়া যায়। এর পরদিন আরও সাতজন দালাল আমাদের অ্যামবুশে ধরা পড়ে এবং তাদের কাছ থেকে দুটি রাইফেল, চারটি হ্যান্ড গ্রেনেড, একটি ওয়্যারলেস সেট ও ১২০টি গুলি পাওয়া যায়। এরপর থেকে দালালেরা আর আমাদের এলাকায় আসার সাহস পায়নি। বন্দী দালালদের কাছ থেকে জানা যায় যে পাকিস্তানি অফিসাররা তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সঙ্গে করে এনে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের কাছে ছেড়ে দিয়েছে। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, অন্যথায় তাদের পরিবারবর্গের ওপর কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপর রাজাকারদের শায়েস্তা করার জন্য ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন একটি কোম্পানি পাঠিয়ে দেয়। কমান্ডো কোম্পানিটি ২৫ জুলাই ছাতুরার কাছে রাজাকার ক্যাম্পের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। হামলায় ১৬ জন রাজাকার নিহত ও ছয়জন আহত হয়। তারা পরদিন তাদের নেতাকে আমাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয় এবং মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সহায়তা করার অঙ্গীকার করে। এ ছাড়া অনেক রাজাকার মুক্তিবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এর পর থেকে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই এলাকার রাজাকারদের সক্রিয় সহায়তা মুক্তিবাহিনী সব সময় পেয়েছে। অনেক সময় রাজাকাররাই আমাদের গেরিলাদের নিরাপদ রাস্তায় তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছে। সিঅ্যান্ডবি রাস্তায় যে সেতুর নিচ দিয়ে আমাদের গেরিলারা নৌকায় যাতায়াত করত, রাজাকাররা সেই সেতুর ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে সংকেত দিত। কোনো সময় যদি পাকিস্তানি সেনারা ওই জায়গায় টহলে আসত, তাহলে আগে থেকে হারিকেনের লাল আলো বা টর্চের সাহায্যে সংকেত দিয়ে আমাদের জানাত। এর ফলে রাস্তাটি আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়।



ছবি : খালেদ'স ওয়ার তথ্যচিত্র থেকে

মেজর সালেকের সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন মেজর খালেদ

মেজর সালেক একটি ডেমোলিশন দল ও একটি কমান্ডো প্লাটুনকে ২৮ জুলাই রাত দুইটার সময় হরিমঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়। দলটি হরিমঙ্গলের কাছে রেলসেতু রেকি করে এবং সকাল সাড়ে ছয়টার মধ্যে ডেমোলিশন লাগিয়ে সেতুটি উড়িয়ে দেয়। বিস্ফোরণের ফলে সেতুর মাঝখানে ৪০ ফুটের একটি গ্যাপ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া সেতুর দক্ষিণ পাশে ২৭০ ফুট রেললাইন বারুদ লাগিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়। এর পরদিন এই ডেমোলিশন দল বিজনা রেলসেতু বারুদ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। ২৮ জুলাই সকাল আটটায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল বিজনা সেতুর কাছে পরিদর্শনে আসে। ঠিক সেই সময় আমাদের কামান তাদের ওপর গোলাগুলি করে। ফলে পাকিস্তানি সেনাদের তিনজন নিহত সাতজন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা সেই অবস্থান ছেড়ে বায়েক গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। এরপর ১ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী কোম্পানি হরিমঙ্গল সেতুর কাছে অগ্রসর হয় এবং সেখানে তাদের ঘাঁটি করার চেষ্টা করে। এবারও আমাদের সেনারা তাদের

অগ্রগমনে বাধা দেয়। আমাদের সেনাদের গোলাগুলিতে পাকিস্তানি সেনাদের ৩০ জন হতাহত হয়। ফলে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

কসবার টি আলীর বাড়িতে পাকিস্তানিদের যে অবস্থান ছিল, সে অবস্থান থেকে পাকিস্তানি সেনারা সামনে অনেক দূর পর্যন্ত প্রায়ই যাতায়াত করত। এ সংবাদ লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবির সংগ্রহ করে। সে আরও জানতে পারে যে কাঁচা রাস্তায় পাকিস্তানি সেনাদের কমপক্ষে একটি কোম্পানি যাতায়াত করে। পাকিস্তানি সেনাদের এ দলকে আক্রমণ করার জন্য লেফটেন্যান্ট কবির একটি প্লাটুন পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি কল্যাণসাগরের কাছে ২৩ জুলাই ভোররাত সোয়া চারটায় অ্যামবুশ নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের অপেক্ষায় থাকে। দুই ঘণ্টা অপেক্ষার পর পাকিস্তানি সেনাদের একটি বিরাট দল এই অ্যামবুশে পড়ে যায়। আমাদের যোদ্ধাদের অতর্কিত গুলির আঘাতে পাকিস্তানি সেনাদের ২০ জন নিহত ও আটজন আহত হয়। একজন স্থানীয় দালাল, যে পাকিস্তানি সেনাদের পথনির্দেশক ছিল, সেও মারা যায়। দু-তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং আমাদের লোকজন অবস্থান তুলে নিজ ঘাঁটিতে ফেরত আসে।

কসবার উত্তরে পাকিস্তানি সেনাদের গোসাইয়ে একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। এ ঘাঁটিতে অন্তত ৪০-৫০ জন পাকিস্তানি সেনা অবস্থান করছিল। আমাদের যেসব গেরিলা ঢাকার পথে যাতায়াত করত, এই অবস্থান থাকাতে তাদের যাতায়াতের গোপন পথ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। ঘাঁটিটি ধ্বংস করে দিয়ে যাতায়াতের গোপন পথ নিরাপদ করার জন্য আইন উদ্দিন চতুর্থ বেঙ্গলের 'ডেলটা' কোম্পানিকে পাঠায়। 'ডেলটা' কোম্পানি ৩১ জুলাই রাত ১০টার সময় দক্ষিণ থেকে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের গোসাই-অবস্থানের কাছে পৌঁছায়। আগেই অবস্থানটি রেকি করা ছিল। পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানটি পর্যুদস্ত হয়ে যায়। আক্রমণ দু-তিন ঘণ্টা চলে। 'ডেলটা' কোম্পানির সেনারা বেশ কয়েকটি বাংকার ধ্বংস করে দেয় এবং অন্তত ২০ জন পাকিস্তানি সেনাকে হতাহত করে। আক্রমণের প্রবল চাপে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি সেনারা গোসাই ছেড়ে পেছনে পালিয়ে যায়।

শালদা নদীতে আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের সংঘর্ষ পুরা জুলাই মাস চলতে থাকে। ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে শালদা নদীর শত্রু-অবস্থানটির উত্তর দিকে চতুর্থ বেঙ্গলের 'চার্লি' কোম্পানি মোটামুটি ঘিরে ফেলেছিল। এদিকে দক্ষিণ দিকে আগরতলা কাটামোড়ায় মেজর সালেক চতুর্থ বেঙ্গলের 'আলফা' কোম্পানি দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের শালদা নদী-

অবস্থানের ওপর চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। পাকিস্তানি সেনাদের পেছন থেকে সরবরাহের রাস্তা একমাত্র নদী ছাড়া সবই প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নদীপথেই লুকিয়ে মাঝে মাঝে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে রসদপত্র সরবরাহ করা হতো। এ সরবরাহের পথে পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশ করার জন্য মেজর সালেক একটি প্লাটুন গোপন পথে শত্রুসেনাদের অবস্থানের পেছনে পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি ১ আগস্ট রাতে শালদা নদীর পশ্চিমে নদীর ওপর অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। রাত একটার সময় সাত-আটটি নৌকায় প্রায় ১৫০ জন সেনা ও অন্যান্য সরবরাহ নিয়ে পাকিস্তানিরা তাদের শালদা নদী-অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। নৌকাগুলো যখন অ্যামবুশ-অবস্থানের ভেতরে আসে, আমাদের প্লাটুনটি মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগানের সাহায্যে গুলি চালাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচটি নৌকা ডুবে যায়। পাকিস্তানি সেনারাও পেছন থেকে পাল্টা গোলাগুলি শুরু করে। সংঘর্ষ প্রায় আধ ঘণ্টা স্থায়ী থাকে। এরপর পাকিস্তানি সেনাদের পেছনের নৌকাগুলো ফেরত চলে যায়। এ সংঘর্ষে পাকিস্তানি সেনাদের ৬০-৭০ জন হতাহত হয়, চার-পাঁচটি নৌকা ডুবে যায় এবং অনেক রসদ নষ্ট হয়। নৌকার আরোহী পাকিস্তানি সেনারা ডুবে যায়। পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে আমাদের চারজন নিহত ও একজন আহত হয়।

কুমিল্লার উত্তরে কামালছড়ি [কালাছড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার (তখন মহকুমা) অন্তর্গত] চা-বাগানের কাছে পাকিস্তানি সেনাদের একটি ঘাঁটি ছিল। এখানে মাসাধিককাল ধরে পাকিস্তানি সেনা ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলে আসছিল। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে পাকিস্তানি সেনারা কামালছড়ি [কালাছড়া] চা-বাগানের অবস্থানে বাংকার তৈরি করে। ২ আগস্ট [মতান্তরে অক্টোবর] রাত ১২টার সময় লেফটেন্যান্ট হারুনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দল শত্রু-অবস্থানের ওপর হামলা চালায়। পাকিস্তানি সেনাদের এক কোম্পানি সেনা কামান ও মর্টারের সহায়তায় শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলেছিল। ২ আগস্ট মুক্তিবাহিনীর অসমসাহসী ক্ষুদ্র দলটি হ্যান্ড গ্রেনেড ও ৩০৩ রাইফেলের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শত্রুদের ১০টি বাংকার ধ্বংস করে দেয়। পাকিস্তানি সেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ৫০ জন নিহত সঙ্গীকে ফেলে পেছনে গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। সেখানেও গ্রামবাসীর হাতে আক্রান্ত হয়ে অনেক পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। দুজন পাকিস্তানি সেনা আমাদের হাতে বন্দী হয়। এমজিআইএ ও মেশিনগানসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র এবং ২০-২৫ হাজার গুলি আমাদের হস্তগত হয়। এ ছাড়া

অনেক খাদ্যসামগ্রী ও কাপড় আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের পক্ষে দুজন মুক্তিসেনা নিহত হয়।

জুলাই মাসে নোয়াখালীতে অপারেশনের জন্য ১৪ জন গণবাহিনীর গেরিলা গোপন পথে চৌদ্দগ্রামের আলকরা বাজার হয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। রাত একটার সময় বাজারের কাছে শত্রুদের একটি দল গেরিলাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আমাদের গেরিলারা সাহসের সঙ্গে আক্রমণের মোকাবিলা করে কিন্তু শত্রুদের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। সংঘর্ষে আমাদের একজন গেরিলা নিহত ও কয়েকজন আহত হয় এবং বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র ফেলে তারা পালিয়ে আসে।

হাবিলদার গিয়াসের নেতৃত্বে যে দলটি হোমনা থানায় অবস্থান করছিল, সেই দলটি ২৮ জুলাই রাতে হোমনা থানার সাঘুটিয়া (হোমনা, বাঞ্ছারামপুর, রামচন্দ্রপুরের সঙ্গমস্থল) লঞ্চঘাটে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি টহলদলের ওপর অ্যামবুশ করার জন্য অবস্থান নেয়। ১৩ ঘণ্টা অবস্থানের পর ওই টহলরত লঞ্চটি হাবিলদার গিয়াসের অ্যামবুশের ফাঁদে আটকা পড়ে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী হাবিলদার গিয়াসের দল আকস্মিকভাবে শত্রুদের ওপর হামলা চালায়। ঘটনার আকস্মিকতায় ১৫-২০ মিনিট পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনারা কোনো জবাব দেয় না। দুর্ভাগ্যবশত রকেট লঞ্চার কাজ না করায় হাবিলদার গিয়াসের দল পাকিস্তানি লঞ্চটি ডোবাতে পারেনি। এক ঘণ্টা ধরে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে। পাকিস্তানি সেনারা বিক্ষিপ্তভাবে মর্টারের গোলা ছুড়তে থাকে। সুবেদার গিয়াসের দলের এতে কোনো ক্ষতি হয়নি। এক ঘণ্টা সংঘর্ষের পর পাকিস্তানি সেনাদের লঞ্চটি পালিয়ে যায়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পিছু ধাওয়া করে। পাকিস্তানি সেনাদের হতাহতের সংবাদ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা না গেলেও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, ক্ষতবিক্ষত লঞ্চটি দেড় ঘণ্টা হোমনা থানার ঘাটে নোঙর করে থাকে। সেখানে বেশ কিছু আহত পাকিস্তানি সেনাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং অবশেষে অনেক মৃতদেহসহ লঞ্চটি ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করে।

জুলাই মাসে পাকিস্তানি সেনারা চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রোড খুলতে চেষ্টা করে। এ সময় মাঝে মধ্যে পাকিস্তানি সেনাদের শক্তিশালী দল এ রাস্তায় টহল দেওয়ার জন্য আসত। চৌদ্দগ্রামের উত্তরে ও দক্ষিণে ইমাম-উজ-জামান এসব পাকিস্তানি সেনার টহলদলকে তাড়িয়ে দিত। ৩০ জুলাই সকাল সাতটায় ইমাম-উজ-জামানের একটি প্লাটুন চৌদ্দগ্রামের চার মাইল দক্ষিণে

এক স্থানে অ্যামবুশ পাতে। অ্যামবুশ দল সারা দিন অপেক্ষা করার পর জানতে পারে যে জগন্নাথদীঘির কাছে একটি জিপ টহলে বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছে। জিপটি অ্যামবুশ করার জন্য অ্যামবুশ দল তখনই তৈরি হয়ে যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় পাকিস্তানি বাহিনীর এ জিপ চৌদ্দগ্রামের দিকে অগ্রসর হয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অ্যামবুশ-অবস্থানে পৌঁছায়। পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে অ্যামবুশ দল জিপের ওপর মেশিনগান ও হালকা মেশিনগান থেকে গুলি চালায়। গুলিতে ড্রাইভার আহত হয়। ছয়জন পাকিস্তানি সেনা জিপ থেকে লাফিয়ে নিচে নামে কিন্তু তারাও আমাদের অ্যামবুশ দলের গুলিতে নিহত হয়। পরে অ্যামবুশ দল এক মৃত পাকিস্তানি সেনার পকেটে একটি চিঠি পায়। তা থেকে জানা যায় যে ওই পাকিস্তানি সেনারা ২৯ বালুচ রেজিমেন্টের 'চার্লি' কোম্পানির লোক। নিহত পাকিস্তানি সেনাদের কাছে থেকে রাইফেল এবং যথেষ্ট গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। একজন আহত পাকিস্তানি সেনা আমাদের হাতে বন্দী হয়। এই অ্যামবুশের পর পাকিস্তানিরা কুমিল্লা থেকে আরও সেনা চৌদ্দগ্রামে নিয়ে আসে এবং সারা রাত আমাদের অবস্থানের ওপর মর্টার ও কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। আমাদের লোকেরাও শত্রু-অবস্থানের ওপর মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে।

পরদিন ৩১ জুলাই সকালে পাকিস্তানিদের একটি কোম্পানি চৌদ্দগ্রাম থেকে এবং আরেকটি কোম্পানি জগন্নাথদীঘি থেকে ট্রাঙ্ক রোড হয়ে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা যখন আমাদের অবস্থানের ২০০ গজের মধ্যে পৌঁছায়, তখনই আমাদের অ্যামবুশ-অবস্থান থেকে তাদের ওপর অতর্কিত গুলি চালানো হয়। গুলির আঘাতে ২০ জন পাকিস্তানি সেনা রাস্তার উত্তরে এবং ছয়জন দক্ষিণে আহত ও নিহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা কামানের গোলার সহায়তায় পেছনে সরে যেতে থাকে। এ সময়েও আমাদের গুলির আঘাতে তাদের আরও কিছু সেনা হতাহত হয়। এরপর আমাদের অ্যামবুশ দল সেই অবস্থান ত্যাগ করে হরিশ্বরদার হাটের কাছে নতুন অবস্থান নেয়। এর দুই দিন পর ২ আগস্ট সকাল সাতটায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি ব্যাটালিয়ন উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে হরিশ্বরদার [হরিসর্দার] হাটের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় আমাদের অবস্থানে লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান আরও দুটি প্লাটুন পাঠিয়ে অবস্থানটি শক্তিশালী করে। পাকিস্তানি সেনারা হরিশ্বরদার [হরিসর্দার] হাটের কাছে অবস্থিত ভাঙা সেতু পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সেখানে পেছন থেকে আরও সেনা একত্র করে। আমাদের অ্যামবুশ দল শত্রুদের একসঙ্গে পেয়ে তাদের ওপর

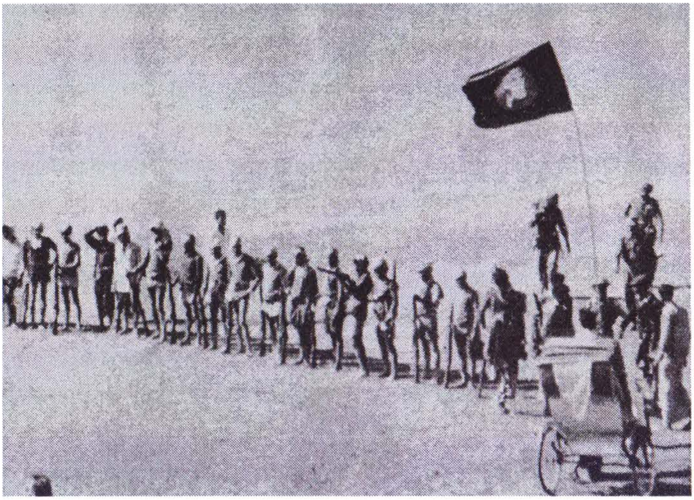
অতর্কিত গোলাগুলি চালায়। এ গোলাগুলি সারা দিন ধরে চলে। পাকিস্তানি সেনারা কামানের গোলার সাহায্যে আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। আমাদের কোম্পানিও সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে থাকে। সারা দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের ২৫ জন হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা ২ আগস্ট রাতে প্রধান সড়কের ওপর তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করে। এর পরদিন ৩ আগস্ট সারা দিন পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলে। ওই দিন সন্ধ্যায় আমাদের কোম্পানি অবস্থান ত্যাগ করে তাদের ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল নয়নপুর রেলস্টেশন এলাকায় সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপন করে অবস্থান করছিল। এই অবস্থানের সঙ্গে এর আগে আমাদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পাকিস্তানি সেনারা এ ঘাঁটির পরিধি আরও বাড়িয়ে শালদা নদীর-অবস্থান পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছিল। মেজর সালেক পাকিস্তানি সেনাদের নয়নপুর ঘাঁটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ঘাঁটিতে পাকিস্তানি সেনাদের এক কোম্পানির বেশি সেনা ছিল। পাকিস্তানি সেনারা স্টেশন ও নিকটবর্তী রেলওয়ে গুদাম এলাকায় তাদের সুদৃঢ় বাংকার তৈরি করে। মেজর সালেক পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত খবরাখবর সংগ্রহ করে। এরপর চতুর্থ বেঙ্গলের 'আলফা' কোম্পানি এবং গণবাহিনীর কিছুসংখ্যক সদস্য নিয়ে রাত সাড়ে ১২টার সময় পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের কাছে জমায়েত হতে থাকে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী রাত আড়াইটার সময় স্টেশনের উত্তর দিক থেকে দুটি প্লাটুন একসঙ্গে পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। একটি প্লাটুন স্টেশনের ২০০ গজ উত্তরে রেললাইন পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের গোলাগুলি তীব্র হতে শুরু করে এবং আমাদের সেনাদের আক্রমণ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। মেজর সালেক অন্য প্লাটুন, অর্থাৎ যারা স্টেশনের দিকে ছিল তাদের আক্রমণ আরও তীব্র করার নির্দেশ দেয়। প্লাটুনটি পাকিস্তানি সেনাদের প্রবল গুলিবর্ষণের মধ্যে রেললাইনের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে থাকে। এ প্লাটুনের লোকজন রেলস্টেশনের ২৫ গজের মধ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয় এবং পাকিস্তানি সেনাদের ছয়-সাতটি বাংকার উড়িয়ে দেয়। এ সময় স্টেশনের নিকটস্থ গুদাম এলাকা থেকে আমাদের লোকদের ওপর তীব্র আক্রমণ শুরু হয়। অতর্কিত এই আক্রমণে আমাদের অনেক লোক হতাহত হয়। অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। মেজর সালেকের পক্ষে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হয় না। নিরুপায় হয়ে মেজর

সালেক তার আহত ও নিহত সেনাদের নিয়ে পেছনে হটে আসতে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধে আমাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। 'আলফা' কোম্পানির সাতজন নিহত ও নয়জন গুরুতর আহত হয়। এ ছাড়া সেনাদের মনোবল কিছুটা দমে যায়। পাকিস্তানি সেনারা তাদের অবস্থান অক্ষত রাখতে সক্ষম হয়। আমার সেক্টরে এটাই ছিল প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুতর বিপর্যয়—যাতে এতজন একসঙ্গে নিহত ও আহত হলো।

ঢাকা ও এর চারপাশে গেরিলারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। ২৫ জুলাই সকাল ছয়টায় পুবাইলের কাছে। রেললাইনের ওপর বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি ট্রেন উড়িয়ে দেওয়া হয়। রেলের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয় এবং ইঞ্জিনে আগুন লেগে বিধ্বস্ত হয়। ট্রেনের আরোহী ৩০-৩৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ সেই সঙ্গে নিহত হয়। বগিগুলো লাইনচ্যুত হয়ে পানিতে পড়ে যায়। গেরিলাদের আরেকটি দল ৪ আগস্ট আড়াইহাজার থানার কাছে একটি সড়কসেতু এবং দরগাঁও সড়কসেতু উড়িয়ে দেয়। ফলে নরসিংদী-ডেমরার মধ্যে যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঢাকা-কুমিল্লা রাস্তায় ৫ আগস্ট বাতেরচরের কাছে সড়কসেতু ও কুমিল্লা-দাউদকান্দির মাঝে একটি সড়কসেতু উড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে ঢাকা-কুমিল্লা সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদিকে ২৭ জুলাই চারজনের একটি গেরিলাদল মতিঝিলের পীরজঙ্গি মাজারের কাছে বিদ্যুৎ সরবরাহ সাবস্টেশনের ওপর আক্রমণ চালায়। পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ সাবস্টেশনটি পাহারা দিচ্ছিল। গেরিলারা দুজন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ সদস্যকে হত্যা এবং বাকিদের নিরস্ত্র করে। তারা তালা ভেঙে সাবস্টেশনে ঢোকে এবং এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে এটি ধ্বংস করে দেয়। ফলে মতিঝিল, কমলাপুর স্টেশন, শাহজাহানপুর, গোপীবাগে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। গেরিলাদলটি এরপর ফেরার পথে শাহজাহানপুরে রাজাকারদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সাহসের সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ৮-১০ জন রাজাকারকে হত্যা করে নিরাপদে নিজ ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে আরেকটি গেরিলাদল সিদ্ধিরগঞ্জ এবং খিলগাঁও ও কমলাপুরের মাঝে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের পাইলন উড়িয়ে দেয়। ফলে টঙ্গী, কালীগঞ্জ প্রভৃতি নিম্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ১৫ জুলাই পাগলা এলাকার গেরিলাদল ফতুল্লা ও ঢাকার মাঝে একটি রেলসেতু এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেল যোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফার্মগেটের কাছে পাকিস্তানিদের একটি চেকপোস্ট



ছবি : মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র থেকে

শত্রুমুক্ত আখাউড়ায় ২ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা

ছিল। এ চেকপোস্টে ৮-১০ জন মিলিটারি পুলিশ সব সময় পাহারায় থাকত। তারা যাতায়াতকারী সব যানবাহন থামিয়ে তল্লাশি করত। ঢাকার একটি গেরিলাদল এ চেকপোস্ট আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কয়েক দিন গাড়িতে রেকি করার পর তারা দেখতে পায় যে পাহারারত মিলিটারি পুলিশ সব সময় সতর্ক থাকে না। একদিন সন্ধ্যায় ঢাকার গেরিলা আলম, কাজী, গাজী ও স্বপন—এ চারজন একটি গাড়িতে ফার্মগেটে আসে। [এই অপারেশনে মোট ৬ জন গেরিলা অংশ নেন। তারা হলো জুয়েল (শহীদ আবদুল হালিম চৌধুরী জুয়েল বীর বিক্রম), বদিউল আলম বীর বিক্রম, স্বপন (কামরুল হক স্বপন বীর বিক্রম), বদিউজ্জামান, লুলু ও আবদুস সামাদ বীর প্রতীক। আবদুস সামাদ গাড়ি চালান]। মিলিটারি চেকপোস্টের কাছে পৌঁছার সময় তাদের পাকিস্তানি সেনারা আসতে নির্দেশ দেয়। তারা তাদের গাড়িটি নির্দেশ অনুযায়ী দ্বিতীয় রাজধানীর দিকে মুখ করে রাস্তার পাশে দাঁড় করায়। চারজন পাকিস্তানি সেনা গাড়ির দিকে তল্লাশির জন্য অগ্রসর হয়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে গেরিলারা তিনটি চায়নিজ স্টেনগান থেকে গুলি চালাতে থাকে। পাকিস্তানি সেনাদের অন্য লোকজনও গাড়ির দিকে এগোতে চেষ্টা করে। গেরিলাদল তাদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে এবং তীব্র গতিতে গাড়ি চালিয়ে অবস্থান ত্যাগ করে। এ সংঘর্ষের ফলে পাকিস্তানি সেনাদের পাঁচজন মিলিটারি পুলিশ আহত ও চারজন নিহত হয়। সঙ্গে

সঙ্গে ফার্মগেট ও কারওয়ান বাজার এলাকাজুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ২ আগস্ট ঢাকার গেরিলাদের আরেকটি দল 'গ্যানিস' ও 'ভোগ' নামের দুটি বড় দোকানে গ্রেনেড ছুড়ে দোকান দুটির ক্ষতি সাধন করে।

লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামানের 'রেকি' দল সংবাদ নিয়ে আসে যে পাকিস্তানি সেনাদের দুটি জিপকে রেশন ও গোলাবারুদ সরবরাহের জন্য বালিয়াজুরি ভাঙা সেতুর কাছে শত্রু-অবস্থানের দিকে যেতে দেখা গেছে। লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান জিপ দুটিকে অ্যামবুশ করার জন্য তৎক্ষণাৎ একটি প্লাটুন বালিয়াজুরি সেতুর কাছে পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি পাকিস্তানি অবস্থানের কাছে পৌঁছে দেখতে পায়, জিপ দুটি রাস্তার ওপর সেতুর কাছে দাঁড়িয়ে আছে। লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামানের প্লাটুনটি সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান নিয়ে জিপের ওপর রাইফেলের সাহায্যে গুলি চালাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের দুজন নিহত হয়। একটি জিপ মৃত সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত ঘুরে পালিয়ে যায়। অন্য জিপটির ওপর প্লাটুনটি গুলি চালাতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা রাস্তার পশ্চিম পাশে অবস্থান নিয়ে আমাদের প্লাটুনের ওপর গুলি চালাতে থাকে। তাদের গুলি ফুরিয়ে এলে তারা গাড়ি থেকে গুলি নেওয়ার চেষ্টা করে—কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ আক্রমণে তাদের ছয়জন মারা যায়। পরে পাকিস্তানি সেনারা আমাদের অ্যামবুশ-অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড গোলা ছুড়তে থাকে। বাধ্য হয়ে আমাদের প্লাটুন অবস্থান ত্যাগ করে। শত্রুদের গাড়িটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এরপর পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল দুপুর দেড়টার সময় আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। দলটি যখন আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের কাছে পৌঁছায় তখন আমাদের সেনারা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড সংঘর্ষে ১০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা বাধ্য হয়ে তাদের আক্রমণ বন্ধ করে ফেরত চলে যায়।

মেজর সালেক ১০ আগস্ট একটি প্লাটুন নিয়ে শালদা নদীর পশ্চিমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা সিঅ্যান্ডবি রাস্তার কাছে শিদলাই গ্রামে তার গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে। পরদিন স্থানীয় লোকের কাছে সে খবর পায় যে সিঅ্যান্ডবি রাস্তার ওপর দিয়ে প্রতিদিন কুমিল্লা থেকে উজানিসার পাকিস্তানি অবস্থানে তিন-চারটি জিপ যাতায়াত করে। এ সংবাদ পেয়ে মেজর সালেক পাকিস্তানি সেনাদের জন্য সিঅ্যান্ডবি রাস্তায় একটি অ্যামবুশ পাতে। সারা দিন ও রাত অপেক্ষা করার পর পাকিস্তানি সেনারা সেদিন আর আসেনি। বোঝা গেল যে তাদের

কোনো দালাল বা রাজাকার হয়তো বা আগে থেকেই অ্যামবুশ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল। অনেক অপেক্ষা করার পর রাস্তায় মাইন লাগিয়ে মেজর সালেকের দলটি তার ঘাঁটিতে রওনা হয়। পথে রসুল গ্রামের কাছে একটি রাজাকার ক্যাম্পে তারা আক্রমণ চালায়। আক্রমণের সময় ক্যাম্প ভবনের ভেতর বেশ কয়েকটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। এই আক্রমণে ২০ জন রাজাকার নিহত ও ৩০ জন বন্দী হয়। এরপর দলটি নিজেদের অবস্থানে নিরাপদে ফিরে আসে।

শালদা নদী, মন্দভাগ এবং এর চারদিকে আমাদের সেনারা পাকিস্তানিদের ওপর প্রায়ই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। পাকিস্তানি সেনাদের হতাহতের সংখ্যাও দিন দিন আরও বেড়ে যাচ্ছিল। আমাদের আক্রমণের ফলাফল সম্পর্কে দুটি সঠিক বিবরণ গ্রামবাসী মারফত জানতে পাই। শালদা নদীর শত্রু-অবস্থানের ওপর আমরা গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ চালানোর ফলে আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে শত্রুপক্ষের অন্তত ৬০ জন নিহত হয়। বাধ্য হয়ে শত্রুরা স্টেশন ছেড়ে নয়নপুর গ্রাম, শালদা নদী গোডাউন ইত্যাদি এলাকায় অবস্থান তৈরি করে। মন্দভাগেও শত্রু-অবস্থানের ওপর আমাদের গোলার আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের ১৫০ জন হতাহত হয়; তাদের একটি ১২০ এমএম মর্টারের গুরুতর ক্ষতিসাধন করা হয়। সব পাকিস্তানি সেনারা বাধ্য হয়ে তাদের কামানের অবস্থান পিছু হটিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিয়ে যায়। আমাদের অ্যামবুশের ফলে তারা শালদা নদীর রাস্তা ছেড়ে নাগাইশ হয়ে ব্রাহ্মণপাড়া থেকে একটি নতুন রাস্তা খোলার চেষ্টা করে। ১১ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাদের একটি কোম্পানি এই নতুন রাস্তায় আসে। আসার পথে নাগাইশ গ্রাম থেকে একজন স্থানীয় লোককে পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়ে আসে। লোকটি পরে আমাদের জানায় যে পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল একেবারেই ভেঙে গেছে। নৌকাতে আসার সময় অনেক সেনাই সামনে অগ্রসরে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাদের কমান্ডাররা অনেকভাবে তাদের উৎসাহিত করার চেষ্টা চালায়। এ ছাড়া তাদের অনেককে চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তারা তাদের পুরোনো দাম্ভিক স্বভাব অনেকটা ত্যাগ করেছে। পাকিস্তানি সেনারা গ্রামবাসীর সঙ্গে মেশার চেষ্টাও করছিল। শত্রুদের এ নতুন রাস্তার খবর পেয়ে মেজর সালেক একটি প্লাটুন পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি নাগাইশ গ্রামে পাকিস্তানি সেনাদের রাস্তায় অ্যামবুশ পাতে। ১৫ আগস্ট সকাল আটটা-নয়টার সময় পাকিস্তানি সেনাদের দুটি রসদবোঝাই নৌকা ব্রাহ্মণপাড়া থেকে নয়নপুরের দিকে যাচ্ছিল। আমাদের প্লাটুন তাদের ওপর

অতর্কিতে আক্রমণ করে নৌকাগুলো ডুবিয়ে দেয়। এই আক্রমণে ১১ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়।

কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানি সেনাদের আরও তিনটি নৌকা শালদা নদী থেকে ব্রাহ্মণপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। এ নৌকাগুলোকেও আমাদের অ্যামবুশ দল শশীদল গ্রামের কাছে অ্যামবুশ করে এবং এতে ১০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। পরদিন পাকিস্তানি সেনাদের দুটি শক্তিশালী প্লাটুন আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দমনে নাগাইশের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের প্লাটুন সংবাদ পেয়ে সুবেদার নজরুল ও নায়েব সুবেদার মুনিরের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনাদের ওই দলকে নাগাইশ পৌঁছার আগেই অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং এতে ২৫ সেনা নিহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে যায়। ১৭ আগস্ট ব্রাহ্মণপাড়ার এ নদীপথ খোলার জন্য পাকিস্তানি সেনাদের একটি বিরাট দল নদীর পাড় দিয়ে অগ্রসর হয় এবং সঙ্গে সেনাবোঝাই তিনটি নৌকাও অগ্রসর হয়। পাকিস্তানি সেনাদের দলকে আমাদের সেনারা আবার অ্যামবুশ করে। অ্যামবুশের ফলে নৌকার আরোহী ১৮ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। পাকিস্তানিদের যে দলটি পাড় দিয়ে আসছিল, তাদের আক্রমণের প্রবল চাপে বাধ্য হয়ে আমাদের সেনারা পিছু হটে আসে। পাকিস্তানি সেনারা দু-তিনবার অ্যামবুশে পড়ার পরও শালদা নদীর নাগাইশ-ব্রাহ্মণপাড়ার যোগাযোগের পথ খোলার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। কারণ, এ পথ ছাড়া পেছন থেকে শালদা নদীতে সরবরাহের আর কোনো রাস্তা ছিল না।

১৯ আগস্ট দুপুর ১২টার সময় পাকিস্তানি সেনাদের তিনটি নৌকা শালদা নদী থেকে ব্রাহ্মণপাড়ার দিকে এগোচ্ছিল। এ নৌকাগুলো যখন ছোট নাগাইশের কাছে পৌঁছায়, তখন আমাদের সেনারা নৌকাগুলোর ওপর আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা গুলি চালিয়ে আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের সেনাদের তীব্র আক্রমণের মুখে তাদের দুটি নৌকা ডুবে যায় এবং ২০ জন নিহত হয়। পেছনের নৌকাটি দ্রুত পাড়ে এসে পৌঁছায়। পাকিস্তানি সেনারা নৌকা থেকে নেমেই আমাদের ওপর আক্রমণের চেষ্টা করে। প্রায় চার ঘণ্টা উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলার পর পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে যায়। দুপুর একটার সময় আমাদের কামানের গোলায় শালদা নদী গুদামে অবস্থিত পাকিস্তানি সেনাদের একটি বাংকার ধ্বংস হয়। ফলে আটজন পাকিস্তানি ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

মন্দভাগেও চতুর্থ বেঙ্গলের 'চার্লি' কোম্পানি অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানিদের চারটি বাংকার ধ্বংস করে দেয়। ফলে ১১ জন নিহত ও

তিনজন আহত হয়। লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান পাকিস্তানি বাহিনীর হরিসর্দার হাটের অবস্থানের ওপর তার চাপ রেখে যাচ্ছিল। এই চাপের ফলে পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল দ্রুত ভেঙে পড়ছিল। অবস্থানটিতে বারবার অতর্কিত আক্রমণ এবং অ্যামবুশ চালানোর ফলে পাকিস্তানি সেনারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে সব সময় সজাগ থাকত।

শত্রুদের অবস্থানটি মুক্ত করার জন্য একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ভীতসন্ত্রস্ত পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়ার জন্য ওই অবস্থানের নিকটবর্তী এলাকায় গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে পাকিস্তানি সেনাদের এ অবস্থানের ওপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট আক্রমণ করার জন্য অতিসত্বর হরিসর্দার হাটের দিকে উত্তর থেকে অগ্রসর হচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুরাষ্ট্রের দেওয়া অনেক কামানও আছে। এ ছাড়া অনেক মুক্তিযোদ্ধা এ আক্রমণের জন্য একত্র হচ্ছে। এ ধরনের গুজব প্রায়ই পাকিস্তানি সেনাদের আমানগোন্ডা-অবস্থান এলাকায় প্রচার করা হচ্ছিল। এর ফলে পাকিস্তানি সেনাদের মনোবলে আরও ভাঙন ধরে। ১৪ আগস্ট আরও গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসেই এই আক্রমণ চালানো হবে। ১৪ আগস্ট রাত ১০টার সময় লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামানের কয়েকজন সেপাই আমানগোন্ডার কাছে গিয়ে ভেরি লাইট পিস্তল এবং ২ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে ইল্যুমিনেটিং প্যারাস্যুট বোমা ছোড়ে এবং কয়েকটি গুলি চালায়। এর পরদিন আমানগোন্ডা-অবস্থানের কাছে পৌঁছে দেখা গেল যে পাকিস্তানি সেনারা সমস্ত প্রতিরক্ষা-অবস্থান ছেড়ে রাতে ভয়ে পালিয়ে গেছে এবং এলাকাবাসী পাকিস্তানি সেনাদের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ করছে।

এ ছাড়া পরে আমরা আরও অনেক সূত্রে জানতে পারি, মুক্তিবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে পাকিস্তানিরা এত বেশি সন্দিহান ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল যে ১৩ আগস্ট ঢাকা থেকে এক ব্যাটালিয়ন সেনা ও চারটি লাইট ট্যাংক কুমিল্লায় আনা হয়। ব্যাটালিয়নটি বানাসিয়া থেকে গাজীপুর পর্যন্ত রেললাইনের পাশে প্রতিরক্ষা-অবস্থান তৈরি করে, দুটি ট্যাংক কুমিল্লা বিমানবন্দরের কাছে মোতায়েন করে এবং বাকিগুলো কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে রাখা হয়। কুমিল্লার সামরিক প্রশাসক ব্রিগেডিয়ার মাসুদ ঘোষণা করেন, যদি কোনো বাঙালি সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে যে মুক্তিবাহিনী তার বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাহলে তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এভাবে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের দোষ মুক্তিবাহিনীর ওপর

চাপানোর চেষ্টা চালায় এবং এসব অভিযোগ তাদের প্রচারকাজের জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

পাকিস্তানি সেনারা হোমনা থানায় আক্রান্ত হওয়ার পর আবার পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ এবং কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা মোতায়েন করে থানাটি শক্তিশালী করে তোলে। থানায় পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান শক্তিশালী হওয়ার পর হোমনা এলাকায় মুক্তিবাহিনীর পক্ষে তাদের কার্যকলাপ চালাতে সমস্যা হয়। এই এলাকা আবার মুক্ত করার জন্য হাবিলদার গিয়াস [গিয়াস উদ্দিন আহাম্মদ] থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে থানার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ খবর সংগ্রহ করে। হাবিলদার গিয়াস স্থানীয় গেরিলাদেরও তার প্লাটুনের সঙ্গে একত্র করে। ১৫ আগস্ট রাত ১২টার সময় আমাদের সম্মিলিত দলটি হোমনা থানার ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। থানার ভেতরে অবস্থিত পুলিশ ও পাকিস্তানি সেনারা যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু দুই ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে তাদের ১০ জন নিহত ও ১৪ জন বন্দী হয়।

আমাদের দলের দুজন আহত হয়। থানায় থাকা ২৪টি রাইফেল, দুটি বন্দুক, ১৬টি বেয়োনেট, একটি ওয়্যারলেস সেট, দুটি টেলিফোন সেট, ১০টি গ্রেনেড ও দেড় হাজার গুলি আমাদের হস্তগত হয়। বন্দীদের আমাদের হেডকোয়ার্টারসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হোমনা থানার বিস্তৃত এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এর দুই দিন পর হোমনা পতনের খবর পেয়ে পাকিস্তানি সেনাদের তিনটি দল মুরাদনগর থেকে হোমনার দিকে নৌকায় অগ্রসর হয়। মুরাদনগরে অবস্থিত আমাদের গেরিলারা এ সংবাদ পেয়ে যায়। স্থানীয় গেরিলা কমান্ডার মুসলেউদ্দিনের নেতৃত্বে বেলা দুইটার সময় নদীর পাড়ে অগ্রসরমাণ পাকিস্তানি সেনাদের জন্য অ্যামবুশ পাতে।

মুরাদনগর থেকে আট মাইল দূরে সন্ধ্যা ছয়টার সময় পাকিস্তানি সেনাদের নৌকাগুলো অ্যামবুশে পড়ে। আমাদের গেরিলাদের গুলিতে দুটি নৌকা ডুবে যায়। গোলাগুলিতে একজন ক্যাপ্টেনসহ ২৯ জন পাকিস্তানি সেনা এবং পাঁচজন রাজাকার নিহত হয়। আমাদের গেরিলারা তিনটি এলএমজি এবং দুটি বেল্ট বক্স (৫০০ গুলিসহ), ৫০০ চায়নিজ রাইফেলের গুলি এবং একটি ৩০৩ রাইফেল হস্তগত করে। অবশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র পানিতে ডুবে যাওয়ায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কুমিল্লা থেকে তিন মাইল উত্তর-পূর্বে কংসতলায় পাকিস্তানি সেনারা আগস্ট মাসে তাদের একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। এ ঘাঁটিতে পাকিস্তানি সেনাদের অন্তত এক কোম্পানি শক্তি ছিল। পাকিস্তানি সেনাদের এ নতুন

ঘাঁটির সংবাদ ক্যাপ্টেন মাহবুবের [মাহবুবুর রহমান বীর উত্তম] কাছে পৌঁছায়। তিনি একটি টহলদল পাঠিয়ে এ ঘাঁটি সম্পর্কে বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করেন। ১৬ আগস্ট সন্ধ্যা সাতটায় ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে দুটি প্লাটুন শত্রুঘাঁটির দিকে অগ্রসর হয়। রাত দুইটার সময় ক্যাপ্টেন মাহবুবের দলটি পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। মুক্তিবাহিনীর সেনারা পাকিস্তানি ঘাঁটির ভেতরে অনুপ্রবেশ করে পাকিস্তানি সেনাদের হকচকিত করে দেয়। তুমুল সংঘর্ষে কিংকর্তব্যবিমূঢ় পাকিস্তানি সেনাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাকিস্তানি সেনারা পর্যুদস্ত হয়ে তাদের ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। আমাদের দলটি পালাতে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের খায়েশবাজার ও লক্ষ্মীপুরের ঘাঁটি থেকেও হটে যেতে বাধ্য করে। সারা রাতের সংঘর্ষে পাকিস্তানি সেনাদের একজন অফিসারসহ ৩০ জন নিহত হয়। এরপর আমাদের দলটি নিরাপদে তাদের কেন্দ্রে ফিরে আসে।

এর তিন দিন পর কুমিল্লার এক মাইল উত্তরে আমাদের আরও একটি দল পাকিস্তানি সেনাদের জন্য একটি অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। ২০ আগস্ট রাত আটটায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি টহলরত প্লাটুন এই অ্যামবুশের আওতায় পড়ে যায়। পাকিস্তানি সেনাদের প্লাটুন যখন পুরোপুরি আমাদের অ্যামবুশ দলের সামনে এসে যায় তখন আমাদের দলে হালকা মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে তাদের ওপর গুলি বর্ষণ করে। পাকিস্তানি সেনারা অতর্কিত এই আক্রমণে হকচকিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায়। এই অ্যামবুশে ১১ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও তিনজন আহত হয়। আমাদের দল পাকিস্তানি সেনাদের একটি এমজি (মেশিনগান) ও কয়েকটি জি-৩ রাইফেল দখল করে।

পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল জগন্নাথদীঘিতে ঘাঁটি করেছিল। এই দল মাঝে মাঝে নিকটবর্তী চিয়ারা গ্রামে রাতে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে—এ খবর আমরা পেয়ে যাই। ২৩ আগস্ট মেজর জাফর ইমাম ওই দলকে আক্রমণ করার জন্য দুটি প্লাটুন নিয়ে চিয়ারা গ্রামের কাছে পাকিস্তানি সেনাদের অপেক্ষায় অবস্থান করে। রাত সাড়ে ১২টায় জগন্নাথদীঘি পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল আক্রমণ চালায়। একই সঙ্গে চিওরা গ্রামে অবস্থিত পাকিস্তানি সেনাদের ওপর ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণে চিয়ারা গ্রামে অবস্থিত পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং ২৪ জন পাকিস্তানি সেনা মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়। কিছু শত্রুসেনা আহত অবস্থায় পালিয়ে যেতে

সক্ষম হয়। নয়নপুর রেলস্টেশনে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর চতুর্থ বেঙ্গলের 'আলফা' ও 'চার্লি' কোম্পানি তাদের চাপ আরও জোরদার করে। ২৩ আগস্ট বেলা ১১টায় ওই কোম্পানি দুটি মিলিতভাবে স্টেশনের উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে মর্টার ও ১০৬ মি.মি. রিকয়েললেস রাইফেলের আঘাতে পাকিস্তানিদের বেশ কটি বাংকার ধ্বংস হয়। স্টেশনের কিছু দূরে একটি গুদাম ছিল। তার ভেতরে পাকিস্তানি সেনারা বাংকার বানিয়েছিল। গুদামটিতেও রকেট মারা হয়। ফলে গুদামে আগুন ধরে যায়। রকেটিংয়ের পর মর্টার ও মেশিনগানের সাহায্যে শত্রু-অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করা হয়। এই আক্রমণ এত সফল হয়েছিল যে শত্রু-অবস্থান থেকে ভীতসন্ত্রস্ত আর্তনাদ ও চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। পাকিস্তানিরা আমাদের আক্রমণের জবাব দেওয়ার সুযোগ পায়নি। শত্রুদের প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা সে সময় জানা যায়নি। পরে আমরা গ্রামবাসী সূত্রে খবর পেয়েছি, আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা যথেষ্ট হতাহত হয়েছে।

নোয়াখালী ও বেলুনিয়ায় আমাদের সেনারা এবং গেরিলাদল পাকিস্তানি সেনাদের নাজেহাল করে তুলেছিল। ২২ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল সোনাগাজীর দিকে ট্রাকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমাদের একটি দল রাস্তায় অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন পেতে ভোর পাঁচটায় পাকিস্তানি সেনাদের দলকে অ্যামবুশ করে। মাইনের আঘাতে পাকিস্তানি সেনাদের তিনটি ট্রাক ধ্বংস হয় এবং সেই সঙ্গে তাদের ২০ জন সেনা নিহত হয়। এ ছাড়া অ্যামবুশ দলের গুলিতে প্রায় ৪০ জন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার হতাহত হয়। প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের দলটি নিরাপদে ফিরে আসে। এ ঘটনার দুই দিন পর চৌদ্দগ্রাম এবং লাকসাম সড়কের ওপর আমাদের গেরিলারা মাইন পুঁতে রাখে। পাকিস্তানি সেনাদের একটি জিপ মাইনের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়। গাড়িতে অবস্থানরত একজন অফিসার এবং একজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। একই সময় ফেনী থেকে একটি ট্রাক পাকিস্তানি সেনাসহ চৌদ্দগ্রামের দিকে আসছিল। আমাদের একজন গেরিলা ট্রাকের ভেতর একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে প্রায় ২৫ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। অন্যদিকে, পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শাহজাহান শহীদ হয় এবং একজন আহত হয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনার হাতে ধরা পড়ে। গেরিলারা ফেনীর কাছে গুমদণ্ডী রেললাইন ডেমোলিশন দিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে ফেনী ও কুমিল্লার মধ্যে ট্রেন যোগাযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২১ আগস্ট সকাল সাড়ে সাতটায়

আমাদের একটি টহলদল পাকিস্তানি সেনাদের একটি দলকে কুমিল্লার উত্তরে গাজীপুর রেলসেতুর দিকে অগ্রসর হতে দেখে। আমাদের টহলদলটি পুলের কাছে অ্যামবুশ পেতে পাকিস্তানি সেনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা অ্যামবুশ-অবস্থানটির মধ্যে এসে যায় এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে একজন লেফটেন্যান্টসহ ছয়জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় এবং অবশিষ্ট পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে বাঁচে। বহু অস্ত্রশস্ত্র ও ম্যাপ আমাদের দখলে আসে। চতুর্থ বেঙ্গলের 'চার্লি' কোম্পানি আগস্ট মাসের শেষের দিকে কুমিল্লার উত্তরে মন্দভাগ ও সিঅ্যান্ডবি সড়কের ওপর তাদের কার্যকলাপ জোরদার করে তোলে। ২৩ আগস্ট রাত একটায় ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে দুটি প্লাটুন মন্দভাগ বাজারের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আক্রমণের সময় আমাদের সেনারা গ্রেনেড চার্জ করে পাকিস্তানি সেনাদের চারটি বাংকার ধ্বংস করে দেয়। এই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের অন্তত ২৫ জন নিহত এবং ১২ জন আহত হয়। আমাদের পক্ষে দুজন গুরুতর আহত এবং একজন শহীদ হয়। এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের যোদ্ধারা শত্রু-অবস্থান থেকে নিরাপদে ফিরে আসে। ২৫ আগস্ট আমাদের একটি ডেমোলিশন দল সিঅ্যান্ডবি সড়কের কালামোড়া [কলামুড়া] সেতুতে পাহারারত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে সাতজন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার অস্ত্রশস্ত্রসহ আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সেতুটি উড়িয়ে দেয় আমাদের দল। ওই দিন ভোর পাঁচটায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি জিপ দ্রুতগতিতে সেতু পার হতে গিয়ে বিধ্বংস হয় এবং জিপের আরোহী তিনজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। আমাদের আরেকটি দল সিঅ্যান্ডবি রাস্তার ওপর একটি অ্যামবুশ পেতে রাখে।

২৫ আগস্ট সকাল আটটার সময় পাকিস্তানি সেনাদের একটি জিপ অ্যামবুশের আওতায় এলে গাড়িটি ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং জিপের আরোহী চার পাকিস্তানি সেনাকে (একজন হাবিলদার ও তিনজন সেপাই) বন্দী করা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা এ যান থেকে ছয়টি রাইফেল, ২২৫টি গুলি, দুটি পিস্তল ও তিনটি গ্রেনেড হস্তগত করে। কুমিল্লার উত্তরে জামবাড়ী ও আম্রতলী এলাকায় পাকিস্তানি সেনারা প্রায়ই টহল দিতে আসত। তাদের এ দলকে অ্যামবুশ করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ২৫ আগস্ট তারিখে আমাদের একটি প্লাটুন লেফটেন্যান্ট দিদারুল আলমের নেতৃত্বে বিকেল চারটায় মর্টারসহ পাকিস্তানি সেনাদের টহল দেওয়া রাস্তার পাশে অ্যামবুশ

পেতে বসে থাকে। সন্ধ্যা ছয়টার সময় পাকিস্তানি সেনাদের একটি কোম্পানি গোমতী পার হয়ে জামবাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়। অ্যামবুশের কাছে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর প্রবলভাবে মর্টারের গুলি বর্ষণ করা হয়। পাকিস্তানি সেনারা এই আকস্মিক আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের অ্যামবুশ দল পলায়নপর শত্রুসেনাদের ওপর মেশিনগান ও হালকা মেশিনগানের সাহায্যে তাদের প্রতি আক্রমণ চালায়। এই অ্যামবুশে ৩০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয়। অবশিষ্ট পাকিস্তানি সেনারা রাতের আঁধারে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

পাকিস্তানি সেনারা শালদা নদী ও নয়নপুরে তাদের সরবরাহ নদীপথে পাঠাত। তাদের এ নদীপথ বন্ধ করার জন্য প্রায়ই পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের পেছনে আমাদের অ্যামবুশ দল পাঠানো হতো। ২৩ আগস্ট আমাদের অ্যামবুশ দল সেনেরবাজারে অবস্থান নিয়েছিল। বেলা ১১টায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি নৌকা সেনের বাজারের পশ্চিম পাড় ঘেঁষে আসতে থাকে। আমাদের অ্যামবুশ দল দ্রুত শত্রুর নৌকার ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে সাতজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়, অবশিষ্ট সেনারা নৌকাটিকে তাড়াতাড়ি পশ্চিম তীরে ভিড়িয়ে নৌকা থেকে নেমে গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। এ ঘটনার তিন দিন পর আমাদের আরেকটি টহলদল ব্রাক্ষ্মণপাড়া গ্রামের কাছে পাকিস্তানি সেনাদের ছয়টি নৌকা নয়নপুরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে। প্রতিটি নৌকায় ছয় থেকে আটজন করে পাকিস্তানি সেনা ছিল। টহলদলটি হাবিলদার সৈয়দ আলী আকবরের নেতৃত্বে সেনেরবাজারের কাছে নদীর পশ্চিম তীরে অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। নৌকাগুলো যখন অ্যামবুশের আওতায় আসে তখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা নৌকাগুলোর ওপর মেশিনগানের সাহায্যে গুলি শুরু করে। প্রথম নৌকাটি গুলির আঘাতে উল্টে যায় এবং তিনজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। অবশিষ্ট তিনজন পানিতে ঝাঁপ দিয়ে উল্টে যাওয়া নৌকার আড়ালে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। অপর পাঁচটি নৌকা দ্রুতগতিতে নাগাইশ গ্রামের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের আরেকটি দল সুবেদার নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে পলায়নপর পাকিস্তানি সেনাদের নাগাইশ গ্রামের কাছে আক্রমণ করে এবং তাদের তিনটি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এতে ১৮ জন পাকিস্তানি সেনা পানিতে ডুবে মারা যায়। শুধু দুটি নৌকা থেকে পাকিস্তানি সেনারা রক্ষা পায় এবং নয়নপুরের দিকে পালায়। এ সংঘর্ষে আমাদের ছাত্র গেরিলা আবদুল মতিন বুলেটবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করে।

২৭ আগস্ট সকালে পাকিস্তানি সেনারা নয়নপুরের পশ্চিম পাশে শশীদল গ্রামের কাছে তাদের সেনাসমাবেশ করে সেনেরবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। পাকিস্তানি সেনাদের দলটি মর্টারের গোলার সাহায্যে সেনেরবাজারের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। সারা দিন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রচণ্ড গুলিবিনিময় হয়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় আমাদের সেনারা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। পাকিস্তানি সেনারা অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটে যায়। পরে জানা যায়, এ সংঘর্ষে ১৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়।

২৮ আগস্ট পাকিস্তানি বাহিনী ব্রাহ্মণপাড়া থেকে পাঁচটি নৌকায় শালদা নদী দিয়ে অগ্রসর হওয়ার পথে আবার আমাদের অ্যামবুশ দলের হাতে আক্রান্ত হয়। এই অ্যামবুশে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুসেনাদের পাঁচটি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এখানে একজন ক্যাপ্টেনসহ প্রায় ৩০ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। এর ফলে পাকিস্তানি সেনাদের জন্য নদীপথে অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলোতে সরবরাহ পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'আলফা' কোম্পানির একটি টহলদল মাধবপুর এলাকার কাছে ২৭ আগস্ট তাদের গোপন বেস গড়ে তোলে। এখান থেকে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সিঅ্যান্ডবি সড়কে তাদের লোক পাঠায়। ২৮ আগস্ট তারিখে সকাল সাতটায় খবর আসে, পাকিস্তানি সেনারা একটি জিপ ও ট্রাকে সিঅ্যান্ডবি সড়ক থেকে কাঁচা রাস্তায় মাধবপুরের দিকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানোর জন্য এগিয়ে আসছে। আমাদের টহলদল এ সংবাদ পেয়ে মাধবপুর গ্রামের বাইরে কাঁচা রাস্তায় যে পথে পাকিস্তানি সেনারা অগ্রসর হচ্ছিল সেখানে অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। বেলা ১১টার সময় পাকিস্তানি সেনাদের জিপ ও ট্রাকটি অ্যামবুশের আওতায় আসে। আমাদের অ্যামবুশ দল আক্রমণ চালিয়ে গাড়ি দুটির চরম ক্ষতিসাধন করে। এই অ্যামবুশে নয়জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ছয়জন আহত হয়। কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে কুমিল্লার দক্ষিণে আমাদের গেরিলারা তাদের কার্যক্রম আরও জোরদার করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি দল বরুড়াতে তাদের বেইসে যাওয়ার পথে পাকিস্তানি সেনা এবং রাজাকার দ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হয়। এ সংঘর্ষে একজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও দুজন আহত হয়। আমাদের একজন গেরিলা গুরুতর আহত হয়। এ সময় ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, দাউদকান্দি প্রভৃতি জায়গায় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে গেরিলাদের সংঘর্ষে ১৬ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এসব সংঘর্ষে ২০টি রাইফেল এবং বিপুল

গোলাবারুদ আমাদের হস্তগত হয়। আগস্ট মাসের ২৯ তারিখে আমাদের মিয়াবাজার সাবসেক্টরে খবর আসে যে পাকিস্তানি সেনারা লাকসাম থানার বুটচি গ্রামে সন্ধ্যা সাতটায় শান্তি কমিটির এটি সভা করার প্রস্তুতি নিয়েছে। এ সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন ইমাম-উজ-জামান সভাটি পণ্ড করার জন্য এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে দেয়। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা সভা শুরু করলে আমাদের প্লাটুন তাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে আটজন পাকিস্তানি সেনা, নয়জন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ এবং ২০ জন রাজাকার হতাহত হয়। শান্তি কমিটির সভাটি আর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে নিজেদের আশ্রয়ে ফিরে আসে।

২৫ আগস্ট সকাল নয়টার সময় পাকিস্তানি সেনাদের একটি প্লাটুনকে ব্রাহ্মণপাড়া থেকে ধানদইল গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে দেখা যায়। আমাদের একটি টহলদল দূর থেকে পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রসর হতে দেখে ধানদইল গ্রামে অ্যামবুশ পাতে। পাকিস্তানিরা অ্যামবুশের ভেতর এসে গেলে তাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায় আমাদের দল। এতে একজন ক্যাপ্টেনসহ ১০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। অবশিষ্ট সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়।



অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে মেজর খালেদ   ছবি: *খালেদ'স ওয়ার* তথ্যচিত্র থেকে

পরদিন আমাদের টহলদলটি উত্তর নাগাইশ ও ছোট নাগাইশ গ্রামের মাঝে শালদা নদীর পাড়ে অ্যামবুশ পাতে। ভোর পাঁচটায় আমাদের অ্যামবুশ দল পাকিস্তানি সেনাদের একটি টহলদলকে শালদা নদীর পূর্ব তীর ঘেঁষে অগ্রসর হতে দেখে। পাকিস্তানি সেনাদের দলটি তাদের কয়েকটি সরবরাহবাহী নৌকাকে নয়নপুর থেকে মন্দভাগের দিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। দলটি আমাদের অ্যামবুশ দলের আওতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুটি নৌকা ধ্বংস এবং ১৪ জন নিহত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের অপর পাহারা দল আমাদের অ্যামবুশ দলের প্রতি পাল্টা গুলি চালায়। প্রায় এক ঘণ্টা উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাবিনিময় চলতে থাকে। নয়নপুর থেকে আরও দুই নৌকায় পাকিস্তানি সেনারা তাদের দলকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অগ্রসর হয়। প্রথম নৌকাটি আমাদের গুলিতে ডুবে যায় এবং পাঁচজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। অন্য উপায় না দেখে দ্বিতীয় নৌকার সেনারা তীরে নেমে পালিয়ে যায়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা সারা দিন ও রাত হরিমঙ্গল, শশীদল ও সেনেরবাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আমাদের সেনেরবাজার ও গৌরাঙ্গীলের অবস্থানের ওপর গোলা বর্ষণ করতে থাকে। পরদিন সকাল নয়টায় ৩০ জন পাকিস্তানি সেনা দুটি নৌকায় সেনেরবাজার-অবস্থানের দিকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। পথে আমাদের মেশিনগানের গুলিতে দুটি নৌকাই ডুবে যায় এবং সব পাকিস্তানি সেনাই নদীতে ডুবে মারা যায়।

আগস্ট মাসের শেষে ঢাকাতে আমাদের গেরিলাদের শক্তি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। তারা পাকিস্তানি সেনাদের ঢাকায় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। পাকিস্তানি সেনারা প্রায়ই রাতে ঢাকা শহরে ট্রাকে করে টহল দিতে বেরোত। টহল দেওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে শহরবাসীর ওপর জঘন্য অত্যাচার চালাত। পাকিস্তানি সেনাদের রাতের এ তৎপরতা সীমিত করার জন্য আমাদের গেরিলারা সিদ্ধান্ত নেয়। যেসব রাস্তায় সাধারণত পাকিস্তানি সেনারা টহল দিত, গেরিলারা সেসব রাস্তার ওপর বেশ কয়েক দিন লক্ষ রাখে। কোন রাস্তায় কয়টার সময় কতগুলো গাড়ি, কত গতিতে চলে, দুই গাড়ির মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান কতটুকু ইত্যাদি সংবাদ তারা সংগ্রহ করে। ২৭ আগস্ট রাত সাড়ে ১১টায় গ্রিন রোডের (স্টাফ কোয়ার্টারের বিপরীত দিকে) কতগুলো নির্মাণাধীন দোকানের ছাদে আমাদের গেরিলারা অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। গেরিলারা রাস্তার ওপর গাড়িবিধ্বংসী মাইন পেতে রাখে। এরপর অ্যামবুশ দল পাকিস্তানি সেনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। রাত প্রায় সাড়ে ১২টায়

পাকিস্তানি সেনাদের চার-পাঁচটি বেডফোর্ড গাড়ি ও জিপ তেজগাঁওয়ের দিকে থেকে গ্রিন রোড হয়ে অগ্রসর হয়। প্রথম গাড়িটি যখন অ্যামবুশের শেষ প্রান্তে পৌঁছায়, তখন একটি মাইনের আঘাতে গাড়িটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় গাড়িটির চালক এই অবস্থা দেখে হকচকিয়ে পাশ কাটতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী দালানের সঙ্গে ধাক্কা খায়, ফলে এ গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পেছন পেছন পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি জিপ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে মাইনের আঘাতে সেটিও উল্টে যায়। যেসব পাকিস্তানি সেনা ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িগুলোতে অক্ষত অবস্থায় ছিল, তারা গাড়ি থেকে বেরোনোর চেষ্টা করে এবং গুলি ছুড়তে থাকে। আমাদের অ্যামবুশ দলের গেরিলারা ছাদ থেকে তাদের ওপর গ্রেনেড আক্রমণ চালায় এবং গুলি ছুড়তে থাকে। ফলে অধিকাংশ পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। পেছন থেকে আরও একটি গাড়িতে পাকিস্তানি সেনারা ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হয় এবং গাড়ি থেকে নেমে আমাদের গেরিলাদের ওপর আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করে। আমাদের গেরিলারাও তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনাদের হতাহতের সংখ্যা যখন বাড়তে থাকে, তখন কোনো উপায় না দেখে তারা ক্যান্টনমেন্টের দিকে পালিয়ে যায়। গোলাগুলির শব্দে স্থানীয় জনসাধারণ তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। তারা ২৪ জন পাকিস্তানি সেনার মৃতদেহ এবং ৪১ জনকে আহত অবস্থায় দেখতে পায়। তারা দুটি বিধ্বস্ত ট্রাক ও একটি জিপ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। আমাদের দুজন সদস্য সামান্য আহত হয়। আমাদের গেরিলারা কিছুসংখ্যক অস্ত্র নিয়ে গ্রিন রোডের পেছন দিকের নিচু জায়গা দিয়ে নিরাপদে চলে আসতে সক্ষম হয়। পরদিন এ খণ্ডযুদ্ধ ও পাকিস্তানিদের দুরবস্থার কাহিনি হাজার হাজার মানুষ প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে জানতে পারে। এ সংবাদ সারা ঢাকায় মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঢাকা শহরের মুক্তিকামী জনগণের মনে আশার সঞ্চার হয়। দুই দিন পর ঢাকার গেরিলারা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজসহ আরও কয়েকটি কলেজে আক্রমণ চালায়। তারা পরীক্ষার খাতাপত্র জ্বালিয়ে দেয়। টঙ্গী ও জয়দেবপুরের মাঝে দুটি বিদ্যুতের পাইলনও তারা উড়িয়ে দেয়। ২ সেপ্টেম্বর রাতে পাকিস্তানিদের একটি জিপ যখন গ্রিন রোড দিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমাদের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা জিপটির ভেতর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে, এতে চার পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। গ্রেনেড নিক্ষেপে জিপটির আংশিক ক্ষতি হয়।

এ ছাড়া ঢাকার গেরিলাদল পশ্চিম পাকিস্তানি একটি পুলিশের দলের ওপর কলাবাগানের কাছে অতর্কিতে আক্রমণ চালালে ১০ জন নিহত হয়। তারা

কালীগঞ্জ-ডেমরা ও কালীগঞ্জ-টঙ্গীর মধ্যস্থিত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের চারটি পাইলন উড়িয়ে দেয়। আমাদের আরেকটি গেরিলাদল রূপগঞ্জের কাছে নদীর পাড়ে পাকিস্তানি সেনাদের যাতায়াতের রাস্তায় একটি অ্যামবুশ পেতে রাখে। ১ সেপ্টেম্বর বিকেল পাঁচটায় কালীগঞ্জ থানার দারোগা, ৭০ জন পাকিস্তানি সেনা এবং ৭০ জন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে তদন্তের জন্য ঢাকা থেকে কোনো দূরবর্তী গ্রামে নৌকাযোগে যাচ্ছিল। নৌকাটি যখন অ্যামবুশের আওতায় পৌঁছায়, তখন গেরিলারা নৌকার ওপর হালকা মেশিনগান দিয়ে গুলি চালায়। গুলিতে নৌকার আরোহী পাকিস্তানি সেনা, পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ ও দারোগা নিহত হয় এবং নৌকাটি ডুবে যায়। ঢাকার আজিমপুরে গেরিলারা একটি রাজাকার দলের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালালে চার রাজাকার নিহত হয় এবং চারটি রাইফেল ও ৫০টি গুলি দখল করে। টঙ্গীতেও একটি রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে গেরিলারা কয়েকজন রাজাকারকে হত্যা করে চারটি রাইফেল দখল করে নেয়। ডেমরার কাছে আমাদের একটি গেরিলাদল ১৩ আগস্ট বেলা তিনটার সময় পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর একটি জিপ অ্যামবুশ করে ধ্বংস করে দেয়। অ্যামবুশে চারজন বিমানবাহিনী ও সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সেনা নিহত হয়। তাদের কাছ থেকে অনেক কাগজপত্র, পরিচয়পত্র এবং কয়েকটি রিভলবার দখল করা হয়। দখল করা কাগজপত্র আমাদের হেডকোয়ার্টারসে গেরিলারা পাঠিয়ে দেয়।

আগস্ট মাসের শেষে পাকিস্তানি সেনাদের কোনো গুপ্তচর আমাদের ঢাকার গেরিলাদের ধোলাই খাল ঘাঁটি সম্পর্কে পাকিস্তানি সেনাদের অবহিত করে। সংবাদ পেয়ে পাকিস্তানি সেনারা ২০-২৫টি ট্রাকে ধোলাই খালে আমাদের ঘাঁটি আক্রমণের জন্য আসে। পাকিস্তানি সেনাদের অতর্কিত আক্রমণে আমাদের গেরিলারা কোনো উপায় না দেখে তাদের সঙ্গে সম্মুখসমরে লিপ্ত হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। সংঘর্ষে পাকিস্তানি সেনাদের ৩০ থেকে ৪৫ জন হতাহত হয় বলে খবর পাওয়া যায়। অন্যদিকে, আমাদের দুজন গেরিলা গুরুতর আহত হয়। প্রবল চাপের মুখে টিকতে না পেরে আমাদের গেরিলারা সাঁতরে খাল পার হয়ে ধোলাইখাল-অবস্থান ত্যাগ করে। পিছু হটার সময় একটি ২ ইঞ্চি মর্টার ও তিনটি ম্যাগাজিন খালে ফেলে আসতে বাধ্য হয়। পরদিন পাকিস্তানি সেনারা সেগুলো উদ্ধার করে এবং তাদের প্রচারের কাজে ব্যবহার করে। এর পরদিন আমাদের গেরিলারা সূত্রাপুর থানার আক্রমণ চালায়। এতে দুজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। সূত্রাপুরের সার্কেল ইন্সপেক্টর ও ওসি গুরুতর আহত হয়।

আগস্টের শেষের দিকে আমাদের দু-তিনজন গেরিলা পাকিস্তানি একজন মেজর ও দুজন ক্যাপ্টেনকে (পাকিস্তানি গোলন্দাজ বাহিনীর) একটি জিপে করে আজিমপুরের কাছে এসে জিপ থেকে নেমে দূরে কোনো একটি বাড়িতে ঢুকতে দেখে। কিছুক্ষণ পর সে বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ শুনে আমাদের গেরিলারাও সেই বাড়িতে ঢোকে। তারা বুঝতে পারে যে অফিসাররা ওই বাড়ির মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করছে। তৎক্ষণাৎ গেরিলারা পাকিস্তানি অফিসারদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। গেরিলারা পাকিস্তানিদের মৃতদেহ দূরে অপেক্ষমাণ পাকিস্তানি জিপের মধ্যে রেখে দেয় এবং নিরাপদে সেই স্থান ত্যাগ করে। পাকিস্তানি পুলিশের একটি টহলদলকে আমাদের ধানমন্ডির গেরিলারা ধানমন্ডি সাতমসজিদ রোড ও নিকটবর্তী রাস্তায় প্রতিদিন টহল নিতে দেখে। আমাদের গেরিলারা ২৫ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ১৮ নম্বর রোডের মোড়ে একটি চলন্ত গাড়ি থেকে নয় পুলিশ সদস্যকে স্টেনগান দিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এ সংবাদ পেয়ে নিকটবর্তী টহলরত পাকিস্তানি সেনারা জিপ নিয়ে গেরিলাদের পিছু ধাওয়া করে। গেরিলারা গাড়ি থেকে গুলি ছুড়ে জিপের ড্রাইভারকে হত্যা করে। এ সময় দ্রুতগতিসম্পন্ন চলন্ত জিপটি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং পার্শ্ববর্তী দেয়ালে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়। ফলে গাড়ির আরোহী দুজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও তিনজন আহত হয়। এ গেরিলাদের নেতৃত্ব দেয় রুমী [শহীদ সাফী ইমাম রুমী বীর বিক্রম]। পাকিস্তানি সেনারা পরে রুমীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় এবং তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আগস্টের ২৯ তারিখে ছয়জনের একটি গেরিলাদল ঢাকার সায়দাবাদ সেতুটি এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে ওই সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ই গেরিলারা একটি বাসে ২০০ মণ পাটসহ লতিফ বাওয়ানী জুট মিলে যাওয়ার পথে বাসটিকে ধ্বংস করে দেয়। বরাইদের [বেরাইদ] কাছে আরও ৩০০ মণ পাট ফসফরাস বোমা ফেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। গেরিলারা নারায়ণগঞ্জের জিএমসি ঘাটে ৫ হাজার বেল বহনকারী কামচাম ফ্ল্যাটটি [বিশেষ একধরনের জলযান] ডুবিয়ে দেয়। আরসিএম জুট মিলের শ্রমিক (আমাদের একজন গেরিলা) ফসফরাস ৮০ গ্রেনেড নিক্ষেপ করে আরসিএম মিলের গুদামে রাখা প্রায় ১ লাখ মণ পাট জ্বালিয়ে দেয়। পরে জানা যায়, দমকল বাহিনীর সাতটি গাড়ি তিন-চার ঘণ্টা চেষ্টা করেও সেই পাটের আগুন নেভাতে ব্যর্থ হয়। ফলে সব পাট পুড়ে যায়।

৩০ আগস্ট আমাদের গেরিলারা আড়াইহাজার থানা অতর্কিতে আক্রমণ করে দারোগাকে হত্যা করে। গেরিলারা থানার সব অস্ত্র নিয়ে আসে। এর

পরদিন গেরিলারা একজন পাকিস্তানি দালালের ২ লাখ টাকা মূল্যের সুতাবাহী নৌকা ডুবিয়ে দেয়। আমাদের আরেকটি গেরিলাদল শিবপুরে আক্রমণ করে থানা ও রাজস্ব অফিস জ্বালিয়ে দেয়। তারা থানা থেকে আটটি রাইফেল, পাঁচটি শর্টগান ও ৪০টি গুলি দখল করে। এ খবর পেয়ে নরসিংদী থেকে পাকিস্তানি সেনাদের একটি কোম্পানি ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের গেরিলারা আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুত ছিল। এক স্থানে আমাদের একটি গেরিলাদল পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের জন্য অ্যামবুশ পাতে। পাকিস্তানি সেনারা অ্যামবুশের ফাঁদে পড়লে গেরিলারা গুলি চালায়। চার ঘণ্টা সংঘর্ষের পর ৩৩টি মৃতদেহ ফেলে পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে নরসিংদীর দিকে পালিয়ে যায়। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সেলিমও নিহত হয়। মৃত সেনাদের পরিচয়পত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের গেরিলারা হস্তগত করে। গেরিলারা নরসিংদীর বিভিন্ন মিলে গ্রেনেড ও মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে মিলের ভেতর সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। ফলে পাকিস্তানি সেনারা একে একে সব মিল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল ঝিনারদিতে (ঘোড়াশালের কাছে) তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। আগস্ট মাসের ১৩ তারিখে বেলা আড়াইটায় আমাদের একটি গেরিলাদল পাকিস্তানি সেনাদের ওই ক্যাম্পে অতর্কিতে আক্রমণ করে। আড়াই ঘণ্টা যুদ্ধের পর একজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় এবং ১৫ সেনা গেরিলাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সাতজন পাকিস্তানি সেনা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। গেরিলারা ঝিনারদি রেলস্টেশনটিকে ধ্বংস করে দেয়। স্টেশনে টেলিফোন যোগাযোগের সেটটিও তারা ধ্বংস করে দেয়। টিকিট ও অন্যান্য কাগজপত্র তারা জ্বালিয়ে দেয়। ক্যাম্প থেকে আমাদের গেরিলারা একটি হালকা মেশিনগান, ১১টি রাইফেল, হালকা মেশিনগানের ৪ হাজার ৫০০ গুলি, একটি স্টেনগান, স্টেনগানের ১০০ গুলি, ১৪টি বেল্ট, ২৬ জোড়া বুট, ১৭ ব্যাগ আটা, ১১ পেটি দুধের টিনসহ আরও জিনিসপত্র দখল করে।

এর কয়েক দিন পর পাকিস্তানি সেনারা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমাদের গেরিলা ইউনিট হেডকোয়ার্টারসে দুদিক থেকে আক্রমণ করে। আমাদের গেরিলারা দুর্জয় সাহসের সঙ্গে তাদের সে আক্রমণের মোকাবিলা করে এবং আক্রমণ প্রতিহত করে। দুই ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। ১৪ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল ঝিনারদি স্টেশনে কাছে একটি গ্রামে লুটতরাজের উদ্দেশ্যে আসে। এ খবর পেয়ে আমাদের

একটি গেরিলাদল পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর দুটি মৃতদেহ ও কয়েকজন আহত সেনাকে ফেলে নরসিংদীর দিকে পালিয়ে যায়। আমাদের গেরিলারা আহত পাকিস্তানি সেনাদের পিছু ধাওয়া করে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এর দুই দিন পর ১৬ আগস্ট আমাদের আরেকটি গেরিলাদল নরসিংদী-তারাবো সড়কে পাঁচদোনার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুতে পাহারারত পাকিস্তানি সেনাদের একটি দলের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ প্রায় এক ঘণ্টা চলে। আমাদের আক্রমণ প্রবল হওয়ায় আহত পাকিস্তানি সেনাদের 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার শোনা যায়। এমন সময় চার ট্রাক পাকিস্তানি সেনা তাদের সাহায্য করতে সেখানে উপস্থিত হয়। তারা ভারী অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের গেরিলাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। ভারী অস্ত্রের মোকাবিলা করতে না পেরে আমাদের গেরিলারা বাধ্য হয়ে পিছু হটে আসে। পাকিস্তানি সেনাদের পাঁচটি মৃতদেহ উঠিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। পাকিস্তানিরা নরসিংদীর নিকটস্থ আমাদের গেরিলা-অবস্থানের খবর পেয়ে আগস্টের ২১ তারিখে প্রায় এক কোম্পানি শক্তি নিয়ে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে আমাদের একটি গেরিলাদল তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে। প্রায় এক ঘণ্টা গোলাগুলির পর পাকিস্তানি সেনারা তাদের গোলাগুলি বন্ধ করে আমাদের অবস্থানের দু-তিন মাইল দূরে থাকতেই আর অগ্রসর না হয়ে পিছু হটে যায়।

আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চলতেই থাকে। কিন্তু পাকিস্তানি সেনারাও বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইনগুলো খুব দ্রুত মেরামত করে ফেলে। এর ফলে কিছুদিন বন্ধ থাকার পর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো সীমিত পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ পায়। পাকিস্তানি সেনাদের বিদ্যুৎ সরবরাহে আরও বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য নতুন করে আরেকটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিতাস গ্যাসের পাইপলাইনের নকশা জোগাড় করি এবং পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, গ্যাসের পাইপ কেটে দিলে দিলে সিদ্ধিরগঞ্জ ও ঘোড়াশালের বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রগুলো গ্যাসের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। হানাদার কর্তৃপক্ষ এসব বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র চালানোর ব্যবস্থা করলে তাদের তেলের সংকট দেখা দেবে। পাইপলাইন উড়িয়ে দেওয়ার জন্য নরসিংদী ও রূপগঞ্জের গেরিলাদের নির্দেশ দিই। আমার নির্দেশ অনুযায়ী ২০ আগস্ট রাত একটায় নরসিংদী গেরিলা ইউনিটের ডেমোলিশন দল তিতাস গ্যাসলাইন বারুদ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। এই অপারেশন পুরোপুরি সফল হয়। বিস্ফোরণের ফলে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা প্রায় ১০ মাইল দূর থেকে দেখা যায়

এবং ছয়-সাত মাইল দূর থেকে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শোনা যায়। ঘোড়াশালের উত্তরে সমস্ত এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। নরসিংদী, ঘোড়াশাল ও পাঁচদোনাতে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা এ বিস্ফোরণের বিকট শব্দে ভীষণভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অনেকেই তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং জিনিসপত্র ফেলে ঢাকার দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। পরে স্থানীয় লোকজনের মুখে শোনা যায়, পাকিস্তানি সেনারা ধারণা করছিল, ভারতীয় বিমান বোমা ফেলেছে। এর পরদিন আশুগঞ্জের কাছেও কয়েক জায়গাতে পাইপলাইন উড়িয়ে দেওয়া হয়। গ্যাসের এ পাইপলাইন মেরামত করতে বেশ কদিন সময় লাগে। তত দিন শিল্পকারখানাগুলো বন্ধ থাকে।

রূপগঞ্জের একটি গেরিলাদল ২২ আগস্ট রাতে নরসিংদী ও ঝিনারদি রেলস্টেশনের মাঝে রেললাইনের নিচে মাইন পুঁতে রাখে। রাতে একটি ট্রেন দুটি বগিসহ সেখান দিয়ে যায়। ট্রেন ও বগি দুটি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাইনটি বিস্ফোরিত হয়। এতে ট্রেনটির ক্ষতি না হলেও রেললাইনের অনেকখানি ধ্বংস হয়ে যায়। আমাদের বৈদ্যেরবাজার থানার গেরিলাদল সোনারগাঁ ও সিঅ্যান্ডবি রোডের অনেক জায়গায় মাইন পুঁতে রাখে। ১৬ আগস্ট রাতে পাকিস্তানি সেনাদের একটি ট্রাক মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ১১ জন পাকিস্তানি সেনা ও তিনজন রাজাকার নিহত হয়। ঢাকা-কুমিল্লা রাস্তার বাতেরচরের নিকটস্থ সড়কসেতুতে অবস্থানরত পাকিস্তানিদের ওপর আমাদের গেরিলারা ৩১ আগস্ট অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। সংঘর্ষে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার নিহত হয়। গেরিলারা সেতুটির ৬০ ফুট লম্বা স্প্যান উড়িয়ে দেয়। তার পরদিন রাতে ঢাকা-দাউদকান্দি সড়কে বারুনিয়া ও ভবেরচরের সেতু দুটিও বিস্ফোরক লাগিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে ঢাকা-কুমিল্লা রাস্তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনারা ভবেরচর সেতুর যোগাযোগব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করার জন্য ফেরির বন্দোবস্ত করে। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে আমাদের গেরিলারা ফেরিঘাট আক্রমণ করে এবং ফেরিটি ধ্বংস করে। এই আক্রমণে ফেরি থেকে চারটি ব্যাটারি মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেয়।

নারায়ণগঞ্জ-দাউদকান্দি সড়কে গজারিয়ায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি চৌকি ছিল। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ রাত আটটায় আমাদের গেরিলাদের একটি দল সেই চৌকি আক্রমণ করে। এক ঘণ্টা যুদ্ধে তিনজন ইপকাফ [ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স] নিহত ও একজন বন্দী হয়। এখান থেকে পাঁচটি রাইফেল এবং ১৫০টি গুলি আমাদের গেরিলারা দখল করে। পরদিন

১০টা রাইফেল ও ২০০ গুলিসহ ১১ জন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ঢাকার মুন্সিগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ মহকুমার গেরিলারাও তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। গেরিলাদের একটি দল হরিরামপুর থানার কাছে পাকিস্তানি সেনাদের একটি লঞ্চ আক্রমণ করে। লঞ্চে পাকিস্তানি সেনারা হরিরামপুর-অবস্থান থেকে তাদের সেনাদের জন্য রসদ নিয়ে যাচ্ছিল। এক ঘণ্টা গোলাগুলির পর ১১ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা আর অগ্রসর হতে না পেরে লঞ্চ নিয়ে ঢাকার দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এর পরদিন হরিরামপুর থানার সেকেন্ড অফিসার এবং কয়েকজন পাকিস্তানি পুলিশ আমাদের গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুলিশ সদস্যদের হত্যা করে আমাদের গেরিলারা তিনটি রাইফেল দখল করে নেয়। ঘিওর থানাতেও পাকিস্তানি সেনাদের একটি টহলদলের ওপর আমাদের গেরিলারা আক্রমণ চালালে আটজন নিহত হয় এবং গেরিলারা আটটি রাইফেল দখল করে। সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখে আমাদের গেরিলারা নওয়াবগঞ্জ [নবাবগঞ্জ] থানা আক্রমণ করে। এই আক্রমণে সেখানকার সব অস্ত্র গেরিলাদের হস্তগত হয়। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের গেরিলারা লৌহজং, সিরাজদিখান, শ্রীনগর ও শিবালয় থানায় অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি পুলিশ সদস্যদের হত্যা করে এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দখল করে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শিবালয় থানার গেরিলাদল পাকিস্তানি সেনাদের একটি প্লাটুনকে টহল দেওয়ার সময় অ্যামবুশ করে। এই অ্যামবুশে ১৩ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়। পাকিস্তানিরা ঢাকা থেকে আরও সেনা এনে শিবালয়ে আমাদের গেরিলাদলের ঘাঁটিতে ১৭ সেপ্টেম্বর আক্রমণ চালায়। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের গেরিলারা পাকিস্তানি সেনাদের পিছু হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধে ১০ জন পাকিস্তানি সেনা ও ১১ রাজাকার নিহত হয়।

১৯ সেপ্টেম্বর আমাদের গেরিলারা মালোচিন বাজারে অবস্থানরত পাকিস্তানি পুলিশের একটি দলের ওপর আক্রমণ চালালে ১৯ জন পাকিস্তানি পুলিশ নিহত হয় এবং তিনজন আহত হয়। ঘোড়াশালের গেরিলাদল একদিন রাতে আড়াইহাজার থানার কাছে পুরিন্দা বিদ্যুৎ সরবরাহ সাবস্টেশনে আক্রমণ চালায়। এ ঘটনার দুই দিন পর সিদ্ধেশ্বরী-ঘোড়াশালের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের ক্ষতিসাধন করে। গেরিলাদল মাশরেকী জুট মিলস লিমিটেডের বিদ্যুৎ সরবরাহ সাবস্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়। এতে ওই এলাকার বিদ্যুৎ

সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কলকারখানাগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের গেরিলারা রূপগঞ্জের কাছে যে গ্যাসলাইন ধ্বংস করে দিয়েছিল, পাকিস্তানি সেনারা পশ্চিম পাকিস্তানি প্রকৌশলীদের দিয়ে মেরামত করিয়ে নেয়। এ সংবাদ আমার হেডকোয়ার্টারসে যথাসময়ে পৌঁছায়। এ গ্যাসলাইন আবার ধ্বংস করার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করি। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘোড়াশালের গেরিলাদের গ্যাসলাইনটি নদীর মাঝখানে ক্ষতি করার জন্য নির্দেশ দিই। ঘোড়াশালের কাছে গ্যাসলাইনটি মেঘনা নদীর মাঝ দিয়ে গেছে। নির্দেশ অনুযায়ী গেরিলারা লাইনটির পথ গোপনে অনুসন্ধান করে। ৯ সেপ্টেম্বর রাতে নৌকার সাহায্যে নদীর মাঝামাঝি জায়গায় যায় এবং ১৫-২০ ফুট পানির নিচে অবস্থিত গ্যাসপাইপে ডেমোলিশন দ্বারা 'ডিলে সুইচ' (বিলম্বে কার্যকরী সুইচ)-এর সাহায্যে পাইপটি উড়িয়ে দেয়। ফলে গ্যাস পাইপের ভেতর পানি ঢুকে যায়। এতে গ্যাস সরবরাহ অনেক দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আড়াইহাজার থানার গেরিলারা জানতে পারে যে, পাকিস্তানি সেনারা কামানদিচরে তাদের একটি ঘাঁটি স্থাপন করেছে এবং স্থানীয় লোকদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আরও জানতে পারে, পাকিস্তানি সেনারা নিকটস্থ গ্রাম থেকে মেয়েদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে ২৯ জন গেরিলার একটি দল ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটি আক্রমণ করে। তিন-চার ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাঁচজন পাকিস্তানি সেনা ও ছয়জন রাজাকার নিহত হয়। অবশিষ্ট পাকিস্তানি সেনারা ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যায়। গেরিলারা ক্যাম্প থেকে মেয়েদের উদ্ধার করে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

পাকিস্তানি সেনারা সিরাজদিখান থানার আবদুস সালাম নামের আমাদের একজন গেরিলাকে গ্রেপ্তার করে তালতলা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। স্থানীয় প্রায় ৫০ জন গেরিলার একটি দল পরদিন রাত সাড়ে আটটায় ক্যাম্পটির ওপর আক্রমণ চালায়। তারা প্রায় তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর একজন পাকিস্তানি সুবেদার মেজরসহ কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা, পাকিস্তানি পুলিশ ও রাজাকারকে হতাহত করে আবদুস সালামকে উদ্ধার করে আনে। এ ঘটনার এক দিন পর নওয়াবগঞ্জ [নবাবগঞ্জ] থানার গেরিলারা দেখে যে একটি লঞ্চ (এমএল পয়েন্টার) পাকিস্তানি সেনা বহন করে নওয়াবগঞ্জের [নবাবগঞ্জ] দিকে অগ্রসর হচ্ছে । ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছয়টার সময় লঞ্চটি যখন গালিমপুরের কাছে পৌঁছায়, তখন আমাদের গেরিলারা লঞ্চটির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। এ আক্রমণে প্রথমেই পাকিস্তানি সেনাদের কিছু লোক হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা

লঞ্চটিকে পিছু হটিয়ে পাড়ে নামার চেষ্টা করে। আমাদের গেরিলারা আবার তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। যুদ্ধ ২৩ তারিখ দুপুর পর্যন্ত চলে। শেষ পর্যন্ত আমাদের গেরিলারা পাকিস্তানি সেনাদের সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধে ক্যাপ্টেন জাফর আলী খান (পিএসএস ৯১৩৩), সুবেদার আবদুল্লাহ, ৪৪ জন পাকিস্তানি সেনা ও একজন বাঙালি পথপ্রদর্শক পুলিশ নিহত হয়। লঞ্চটি পরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দুজন গেরিলা আবদুর রহিম ও মুহম্মদ আলী শহীদ হয়। এ খবর পেয়ে পাকিস্তানি সেনারা আরেকটি লঞ্চে করে বড় খাল দিয়ে নবাবগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের গেরিলাদের ৪০ জনের আরেকটি দল পাকিস্তানি সেনাদের ওই লঞ্চে ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে সাতটায় অতর্কিতে আক্রমণ করে। আক্রমণে তিনজন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং আটজন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা লঞ্চটির দিক পরিবর্তন করে দ্রুত নাগালের বাইরে চলে যায়। ২৭ সেপ্টেম্বর দুপুর একটায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল নওয়াবগঞ্জের [নবাবগঞ্জ] দিকে আবার অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। এ সংবাদ নওয়াবগঞ্জের [নবাবগঞ্জ] গেরিলা হেডকোয়ার্টারসে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ৫০ জনের একটি শক্তিশালী দল গালিমপুরের কাছে পাকিস্তানি সেনাদের জন্য একটি অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা গালিমপুরে অ্যামবুশের আওতায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গেরিলারা তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণে একজন ক্যাপ্টেনসহ ৩৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং অনেকে আহত হয়। অবশিষ্ট পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে তাদের কিছু আহত লোককে নিয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের গেরিলারা একটি এলএমজি, তিনটি স্টেনগান, প্রচুর গুলি ও বেশকিছু রাইফেল দখল করে। এর দুই দিন পর পাকিস্তানি সেনারা আরও শক্তিশালী হয়ে বড় খাল ও আড়িয়ল বিল দিয়ে আবার অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চালালে আমাদের গেরিলারা অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের এ চেষ্টাও ব্যর্থ করে দেয়। প্রায় তিন দিন পাকিস্তানি সেনারা অগ্রসরের চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের গেরিলারা তাদের প্রতিবারের চেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দেয়। তিন দিনের যুদ্ধে ২০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ১ অক্টোবরের মধ্যে নওয়াবগঞ্জ [নবাবগঞ্জ] শত্রুমুক্ত হয় এবং মুক্তিবাহিনীর সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে। দোহার থানার পাকিস্তানি সেনারাও আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের চাপে দুর্বল হয়ে পড়ে। ২৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল মাগুলা বাজার থেকে তাদের রসদ নিয়ে দোহার থানার ক্যাম্পে যাওয়ার পথে আমাদের গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রমণে ১৪ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং আটজন আহত হয়।

পাকিস্তানি সেনাদের সব রসদ মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। এরপর দোহার থানার পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পের সেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ক্যাম্পের বাইরে আসা বন্ধ করে দেয়।

২৪ সেপ্টেম্বর লৌহজং থেকে নারায়ণগঞ্জগামী ১৮ হাজার মণ পাটবাহী একটি জাহাজ পদ্মা নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। অক্টোবর মাসে পাকিস্তানিরা আবার ঢাকায় শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে এবং ঢাকা শহরের নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করে তোলে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা একই সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রকে উৎসাহিত করে তোলার চেষ্টা করে। এ সময় আমরা ভবিষ্যতে ব্যাপক আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ফলে ঢাকা শহরে আমাদের গেরিলাদের কার্যকলাপও কিছুটা শিথিল করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হানাদার বাহিনীর পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণের চেষ্টার খবর পেয়ে আমরা আমাদের হেডকোয়ার্টারস থেকে একটি গেরিলাদলকে একটি বিশেষ মিশনে পাঠাই। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গেরিলাদল একটি গাড়ির পেছনে ২৫ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ নিয়ে গাড়িটিকে তদানীন্তন ইপিআইডিসি [ইস্ট পাকিস্তান ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন] ও হাবিব ব্যাংকের সামনে পার্ক করে রাখে।

সে সময় এই ব্যাংকে যথেষ্ট পরিমাণ পাকিস্তানি ব্যবসায়ীর আনাগোনা ছিল। এ ছাড়া ব্যাংকটি পাকিস্তানিদের বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে অর্থ পাচারে সাহায্য করছিল। গেরিলারা বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গাড়িভর্তি বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে এ গাড়ির পার্শ্ববর্তী পার্ক করা ১০-১২টি গাড়ি ধ্বংস হয় এবং হাবিব ব্যাংকের বেশ ক্ষতি হয়। বিস্ফোরণে প্রায় ২৫ জন পাকিস্তানি ব্যবসায়ী আহত হয়। বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শুনে এবং ধ্বংসযজ্ঞ দেখে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার জনতা ছুটে পালায় এবং সব ব্যবসাকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি ব্যবসায়ী মহলের মধ্যেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র থেকে এই বিস্ফোরণের ঘটনা স্বীকার করা হয়। হেডকোয়ার্টারস থেকে দুটি ৮১ এমএম মর্টারসহ একটি ডিটাচমেন্ট ঢাকায় পাঠানো হয়। এই ডিটাচমেন্টকে ঢাকা বিমানবন্দর ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের ওপর এবং পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর ঘাঁটির ওপর রকেট নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়। আমাদের এ দল হেডকোয়ার্টারস থেকে ঢাকার পূর্ব দিকে এসে তাদের বেইস স্থাপন করে। এরপর একটি ছোট

রেকি (অনুসন্ধানী) দল বিমানবন্দর ও ক্যান্টনমেন্টের চারদিকে তিন-চার দিন অনুসন্ধান চালায়। এই সময় পাকিস্তানি সেনারা বিমানবন্দর ও ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাংকার তৈরি করে এবং টহল দিয়ে আমাদের দূরে রাখার চেষ্টা করে। যেহেতু মর্টারের রকেট ৪ হাজার গজ দূরত্বের বেশি নিক্ষেপ করা যায় না এবং মর্টার ফায়ার করার সময় ফ্লাশ দেখে এবং মর্টার পজিশন থেকে শব্দ শুনে পাকিস্তানি টহল সেনারা এর অবস্থান খুঁজে বের করতে পারে, সেহেতু অনুসন্ধান চালানোর পর আমাদের দলটি বাড্ডার কাছে থেকে ৯ অক্টোবর রাত একটা ৪০ মিনিটের সময় মর্টারের গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। ছয়টি গোলা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের একটি লাইনের মধ্যে পড়ে। এতে ১৪ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। কয়েকটি গোলা বিমানবন্দরের কাছে পড়ে কিন্তু কোনো এয়ারক্রাফটের ক্ষতি হয়নি। আরও কয়েকটি গোলা পাক টোব্যাকো কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে পড়ে। এতে ফ্যাক্টরির বেশ ক্ষতি হয়। কয়েকটি গোলা মহাখালী হাসপাতালের কাছে রাস্তায় পড়ে। এই অতর্কিত মর্টার আক্রমণের ফলে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পরে আমাদের কাছে খবর পৌঁছায় যে পাকিস্তানিরা ভেবেছিল, মুক্তিবাহিনী ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের পাকিস্তানি সেনারা চতুর্দিকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে। তারা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, ট্যাংকসহ গুলশান ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সারা রাত পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে থাকে এবং সারা রাত গোলাগুলি চালায়। আমাদের দলটি আরও কয়েকটি গোলা নিক্ষেপ করে পাকিস্তানি সেনাদের আরও ব্যতিব্যস্ত করে সেখান থেকে সরে পড়ে।

১১ অক্টোবর দুপুর ১২টার সময় আমাদের গেরিলারা তিতাস গ্যাসের পাইপলাইন বিস্ফোরক দিয়ে আবার উড়িয়ে দেয়। ফলে ঢাকার গ্যাস সরবরাহ আবার বন্ধ হয়ে যায়।

পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল পিলখানায় অবস্থান করছিল। পিলখানার পাশের রাস্তা দিয়ে নিউ মার্কেটের দিকে পাকিস্তানি সেনাদের অনেক গাড়ি যাতায়াত করত। আমাদের আজিমপুরের গেরিলাদল সেই রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখে। ১৬ অক্টোবর রাত সাড়ে নয়টায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি জিপ এ রাস্তায় টহল দেওয়ার সময় মাইনের আঘাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চারজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও দুজন গুরুতর আহত হয়। এর এক দিন পর দুজন পাকিস্তানি পুলিশ মিরপুর রোডে টহল দেওয়ার সময় ধানমন্ডির কাছে আমাদের গেরিলাদের হাতে নিহত হয়।

ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা এবং পাকিস্তানি সেনাদের নাজুক অবস্থা বিদেশি সংবাদ সংস্থাগুলো থেকেও ব্যাপক প্রচার করা হয়। এ ছাড়া এসব খবর ভয়েস অব অমেরিকা ও বিবিসি থেকেও প্রচারিত হয়। ফলে হানাদার অধিকৃত এলাকার জনগণের মনেও মুক্তিসংগ্রামের সাফল্য সম্পর্কে নতুন আশার সৃষ্টি হয়।

এ দিকে ৩০ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল শালদা নদীর দক্ষিণ প্রান্তে সমবেত হয় এবং বিধ্বস্ত রেলসেতুর ওপর বাংকার তৈরি করার প্রস্তুতি নেয়। আমাদের একটি টহলদল তাদের ওপর গুলি চালায় এবং এতে বেশকিছু পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে যায়। পরদিন সকাল আটটায় পাকিস্তানি সেনারা অগ্রসর হয়ে আবার বাংকার তৈরি করার চেষ্টা করে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর আবার আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ছয়জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং আরও অনেক হতাহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। ব্রাহ্মণপাড়ায় অবস্থিত পাকিস্তানি সেনাদের কামানগুলো এরপর চতুর্থ বেঙ্গলের 'আলফা' কোম্পানির অবস্থানের ওপর ব্যাপকভাবে গোলা বর্ষণ করতে থাকে। এতে আমাদের একজন সেনা শহীদ এবং দু-তিন জন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য কোনাবন থেকে ক্যাপ্টেন গাফফার চতুর্থ বেঙ্গলের 'চার্লি' কোম্পানিকে চাঁদলায় পাঠান। এই কোম্পানিটি ৩০ আগস্ট বিকেল চারটায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি দলের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে একজন ক্যাপ্টেনসহ ১৯ জন পাকিস্তানি সেনা ও ২৪ জন রাজাকারকে হত্যা করে। সংঘর্ষে অনেক পাকিস্তানি সেনা আহত হয়। পরে পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ব্রাহ্মণপাড়ার দিকে পালিয়ে যায়। ফলে একটি হালকা মেশিনগান, তিনটি রাইফেলসহ অনেক গোলাবারুদ আমাদের সেনারা দখল করে। এর পরদিন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের একটি দলকে মন্দভাগ বাজারের পূর্ব পাশে শালদা নদীতে আক্রমণ করে। পাকিস্তানি সেনাদের এই দলটি নৌকাযোগে মন্দভাগ বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আক্রমণে একটি নৌকা ডুবে যায় এবং ২০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও বেশ কিছু আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনারা মন্দভাগ, সেনেরহাট, চাঁদলা প্রভৃতি এলাকায় অবস্থিত আমাদের অবস্থানের ওপর তাদের চাপ ক্রমান্বয়ে বাড়াতে থাকে। ৩০ আগস্ট বিকেল চারটার সময় পাকিস্তানি সেনারা চারটি নৌকা বোঝাই করে ছোট চাঁদলার কাছে এগোনোর চেষ্টা করে। আমাদের সেনারা তাদের ওপর

আক্রমণ চালায়। এতে ১৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা আমাদের অবস্থানের ওপর ব্রাহ্মণপাড়া ও শাকুটিতে অবস্থিত মর্টার ও কামানের সহায়তায় চড়াও হওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের সেনারাও সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের এই আক্রমণ প্রতিহত করে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানি সেনারা প্রায় তিন কোম্পানি সেনাশক্তি নিয়ে এই আক্রমণ পরিচালনা করে। সারা রাত এই আক্রমণ অব্যাহত থাকে। এই আক্রমণে একজন অফিসারসহ ৩০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং বেশকিছু সেনা আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা পরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পশ্চাদপসরণ করে। আমাদের দুজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতরভাবে এবং ছয়জন সামান্য আহত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি সেনারা আমাদের চালনা [চাঁদলা] ও সিতলার অবস্থানের ওপর দুই দিক থেকে আক্রমণ চালায়। সারা দিন যুদ্ধের পর আমাদের সেনারা পাকিস্তানি সেনাদের এই আক্রমণকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। পাকিস্তানি সেনাদের পক্ষে অনেক হতাহত হয়—তবে সঠিক ক্ষতির পরিমাণ জানা সম্ভব হয়নি। পরাজয়ের গ্লানিতে পশ্চাদপসরণকারী পাকিস্তানি সেনারা মনের আক্রোশে ব্রাহ্মণপাড়া, ছোট চাঁদলা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয় এবং নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে।

দু-তিন দিন বিরতির পর পাকিস্তানি সেনারা আবার আমাদের সেনেরহাট-অবস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। সেনেরহাট-অবস্থানটি দখল করে নেওয়ার জন্য পাকিস্তানি সেনারা সেনেরহাটের পশ্চিমে ও শালদা নদী স্টেশনের পশ্চিমে বিপুলসংখ্যক সেনার সমাবেশ ঘটায়। তারা দুই দিক থেকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। পাকিস্তানি সেনাদের সমাবেশের কৌশল দেখে আমরা বুঝতে পারি, তারা মন্দভাগের পশ্চিমে আশাবাড়ী পর্যন্ত আমাদের দখল করা সব এলাকা পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে তাদের পক্ষে কসবা ও মন্দভাগ পুনর্দখল করা সম্ভব হবে। পাকিস্তানি সেনাদের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে আমরা সেনেরহাট-অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করি। ৮ সেপ্টেম্বর সকালে পাকিস্তানি সেনারা তাদের নয়ঘরে অবস্থিত ১২০ এমএম মর্টার, ব্রাহ্মণপাড়ায় অবস্থিত কামান এবং শশীদলে অবস্থিত ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে আমাদের সেনেরহাট-অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। সেই সঙ্গে তারা সেনেরহাট-অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাকিস্তানি সেনাদের কামানের গোলায় আমাদের বেশ কিছু লোক শহীদ ও আহত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের রকেট লঞ্চারের গোলায় আমাদের চারটি বাংকার ধ্বংস হয়ে যায়। পাকিস্তানিরা আমাদের অবস্থানের ১৫০ গজ পর্যন্ত অগ্রসর হতে

সক্ষম হয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আমাদের সেনারা এতটুকু মনোবল না হারিয়ে বরং দৃঢ়তার সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। আমাদের সেনাদের গুলিতে অগ্রসরমাণ অনেক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। আমাদের মুজিব ব্যাটারি গোলন্দাজ বাহিনী গোলা বর্ষণ করে অনেক পাকিস্তানি সেনাকে হতাহত করে। পাকিস্তানি সেনারা সারা দিন আক্রমণ চালিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে না পেরে এবং তাদের হতাহত সেনার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সন্ধ্যায় তাদের আক্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য হয় এবং পিছু হটতে বাধ্য হয়। এর পরদিন তারা আমাদের মন্দভাগ ও মইনপুর-অবস্থানের ওপরও আক্রমণ চালায়। সেই আক্রমণও একইভাবে প্রতিহত করা হয়। যাওয়ার পথে পরাজয়ের আক্রোশে সকাল সাতটার সময় পাকিস্তানি সেনাদের প্রায় দুই কোম্পানি সেনা কামানের প্রবল গোলার সহায়তায় আমাদের মইনপুরের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। প্রায় দুই ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুদের প্রায় ৪০ জন হতাহত হয়। আমাদের সেনারা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সেই আক্রমণও প্রতিহত করে। আমাদের পক্ষে নয়জন সেনা আহত হয়। পাকিস্তানি গোলন্দাজ বাহিনীর প্রবল গোলাবর্ষণের জন্য আমাদের সেনাদের পক্ষে আমাদের অবস্থানে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে, ফলে বাধ্য হয়ে আমাদের সেনারা সে অবস্থান ছেড়ে ৬০০ গজ পেছনে বায়েকের কাছে জেলা বোর্ডের রাস্তায় নতুন অবস্থান গড়ে তোলে। পাকিস্তানি সেনারা এই অবস্থানের ওপরও আক্রমণ চালায়। তাদের সেই আক্রমণকে আমাদের সেনারা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করে। পাকিস্তানি সেনারা আর অগ্রসর হতে না পেরে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানিরা মনরা, বাগরা, নাগাইশ, দুশিয়া, আরাদুশিরা, ধান্দুইল, সিঙ্গলাইসহ প্রায় ২১টি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে।

৯ সেপ্টেম্বর রাতে ক্যাপ্টেন গাফফার একটি শক্তিশালী রেইডিং দল ৩ ইঞ্চি মর্টার ও ৬৫ এমএম আরআরসহ পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের দিকে পাঠিয়ে দেয়। দলটি শালদা নদীর উত্তর তীর দিয়ে লক্ষ্মীপুরে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের পেছনে অনুপ্রবেশ করে এবং দুই দিন রেকি করার পর ১১ সেপ্টেম্বর বিকেল পাঁচটায় পাকিস্তানি অবস্থানের অতি কাছে পৌঁছে গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। এতে শত্রুদের দুটি বাংকার রকেটের গোলায় ধ্বংস হয়। গোলার আঘাতে ১১ জন শত্রুসেনা নিহত ও সাতজন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয় এবং বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামের মধ্যে কামানের গোলা ছোড়ে। এরপর আমাদের রেইডিং দল ১৪ সেপ্টেম্বর সকাল

আটটায় কায়েসপুরে পাকিস্তানি সেনাদের আরও দুটি বাংকার রকেটের সাহায্যে ধ্বংস করে। এতে আটজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও তিনজন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের দুটি নৌকাও অ্যামবুশ করে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এতে ১৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং আটজন আহত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টার সময় আমাদের আরেকটি রেইডিং দল লক্ষ্মীপুরের কাছে পাকিস্তানিদের দুটি বাংকার অতর্কিতে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। এতে তিন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং আটজন আহত হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল ছয়টায় লক্ষ্মীপুরের পাকিস্তানি সেনাদের আরও দুটি বাংকার রকেটের গুলিতে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে দুজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও একজন আহত হয়।

ফরিদপুরেও আমাদের মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। ৩ আগস্ট বিকেল চারটায় আমাদের গেরিলারা মাদারীপুরের ভাঙ্গা এবং মুতাফিজ সেতুগুলোতে পাহারারত শত্রুসেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। সে আক্রমণে তারা সেতুগুলো ধ্বংস করে দেয় এবং সাতটি রাইফেল দখল করে। ১০ তারিখে মিঠাপুরের ডাকঘর এবং ইউসুফপুরের তহসিল অফিস জ্বালিয়ে দেয়। ১৪ তারিখ সকাল ছয়টায় আমগ্রামের সমাদ্দার সেতু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। ওই দিনই গেরিলাদের আরেকটি দল পাকিস্তানি সেনাদের একটি গাড়ি মাদারীপুর-টেকেরহাট রাস্তায় গাটমাকির কাছে অ্যামবুশ করে। গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে নয়জন পাকিস্তানি সেনা আহত হয়।

২৭ আগস্ট আমাদের একটি টহলদল পরশুরাম থানার কাছে পাকিস্তানি সেনাদের একটি টহলদলকে অ্যামবুশ করে সাতজন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করে। দুই ঘণ্টা সংঘর্ষের পর পাকিস্তানি সেনারা মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে আমাদের গেরিলাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পালাতে সক্ষম হয়। আরেকটি দল ফেনী-বেলুনিয়া সড়কের ওপর হাসানপুর সেতুটি ধ্বংস করে দেয়। শালদা নদীর কাছে আমাদের একটি টহলদল দুজন পাকিস্তানি সেনাকে রাতে টহল দিতে দেখে অ্যামবুশ করে। অ্যামবুশে দুজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। নিহত পাকিস্তানি সেনাদের পকেট থেকে পাওয়া কাগজপত্রে তাদের নাম পাওয়া যায়। এদের একজন হাবিলদার আবদুল আজিজ এবং অপরজনের নাম ছিল হাবিলদার রহমান গুল। ২০ সেপ্টেম্বর বিকেল চারটায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল আমাদের শালদা নদী-অবস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। ছোট পাহাড়ের ওপর অবস্থিত আমাদের অবস্থানের দিকে

অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের সেনাদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন গাফফার একটি শক্তিশালী রেইডিং দল নিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর কাইমপুর পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের পেছনে অনুপ্রবেশ করে। পরদিন ভোরে রেকি করার পর আমাদের সেনারা সকাল ১০টায় পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের পেছন দিকে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে পাকিস্তানিরা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। আমাদের রেইডিং দলের গুলিতে ৩২ পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং সাতজন আহত হয়। এরপর আমাদের দল আক্রমণ প্রত্যাহার করে শত্রু-অবস্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে আসে। পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল কায়েমপুরে [কাইমপুর] তাদের অবস্থানের দিকে নৌকাযোগে অগ্রসর হওয়ার পথে আমাদের অ্যামবুশ দল তাদের ওপরও অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে দুটি নৌকা ধ্বংস হয়ে যায় এবং এতে ১৫ জন পাকিস্তানি নিহত হয়।

আমাদের সেনারা পাকিস্তানিদের ওপর তাদের হামলা চালিয়ে যেতে থাকে। পাকিস্তানি সেনাদের চাপও আমাদের ওপর থেকে ধীরে ধীরে কমে যায়। পাকিস্তানিরা তাদের বিপর্যস্ত অবস্থানগুলো বাঁচানোর জন্য ভারী তোপের সাহায্যে আমাদের মন্দভাগ, কোনাবন ও শালদা নদীর অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করে। এতে আমাদের দুজন নন-কমিশনন্ড অফিসার ও একজন গোলন্দাজ বাহিনীর ওপি শহীদ হয়। পাকিস্তানি সেনাদের একটি জঙ্গি বিমান ২৮ সেপ্টেম্বর তাদের সেনাদের সাহায্যের জন্য বেলা দুইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত আমাদের অবস্থানগুলোর ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানগুলো আমাদের আক্রমণে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে আমরা বুঝতে পারি এবং তাদের সম্পূর্ণভাবে এই এলাকা থেকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য ২৭ তারিখে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৮ তারিখ সাড়ে ১০টার সময় চতুর্থ বেঙ্গলের একটি শক্তিশালী দল উত্তর দিক থেকে কাইমপুর শত্রু-অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। চার ঘণ্টা স্থায়ী যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনাদের ১৫ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়। আমাদের কিছুসংখ্যক যোদ্ধাও শহীদ ও আহত হয়। আমাদের সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি সেনারা তাদের কাইমপুর ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আমাদের সেনারা তাদের পরিত্যক্ত অবস্থান থেকে মেশিনগান, মর্টার ও অন্য অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রচুর গোলাবারুদ দখল করে নেয়। উল্লেখ্য, ৯ সেপ্টেম্বর শত্রুর প্রবল চাপের মুখে পর্যাপ্ত পরিমাণ

অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে আমাদের সেনারা এসব অবস্থান থেকে পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। ফলে শত্রুরা এসব জায়গা দখল করে নেয়। এর এক সপ্তাহ পরই আমরা আবার পাল্টা আক্রমণ চালাই। এতে প্রায় ২০১ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত [সহযোগী রাজাকারসহ] এবং ৮৩ জন আহত হয়, ৭০টি বাংকার ধ্বংস হয় এবং অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দখলে আসে। আমাদের ক্ষয়ক্ষতি সে তুলনায় ছিল অতি অল্প—১০ জন শহীদ এবং ছয়জন আহত হয়। আমাদের সেনারা পাকিস্তানি সেনাদের দখল করা কায়েমপুর [কাইমপুর], শ্রীপুর, মইনপুর, কামালপুর, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি জায়গা পুনরুদ্ধার করে। এরপর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে মন্দভাগের পশ্চিমের বিস্তীর্ণ এলাকা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করা হয়। এর ফলে পাকিস্তানি সেনাদের মন্দভাগ রেলস্টেশন এবং তার পশ্চিমে আশাবাড়ী পর্যন্ত আমাদের দখলে থাকা এলাকা পুনরুদ্ধারের সব আশা ও পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে পড়ে এবং তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

কসবার পশ্চিমে টি আলীর বাড়ির কাছে অবস্থিত পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানগুলোর ওপর আমাদের সেনারা ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে যাচ্ছিল। ২৬ আগস্ট ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন চতুর্থ বেঙ্গলের 'ডেলটা' কোম্পানি থেকে একটি প্লাটুন পাকিস্তানি অবস্থানের পেছনে পাঠিয়ে দেয়। আমাদের কাছে খবর ছিল, পাকিস্তানি সেনারা তাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলোতে নৌকার সাহায্যে রসদ সরবরাহ কাজ চালাচ্ছে। আমাদের এ প্লাটুনকে পাকিস্তানি সেনাদের সরবরাহকারী নৌকাগুলো অ্যামবুশ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্লাটুনটি ২৯ তারিখ সকালে পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশ করার জন্য জলপথের এক স্থানে অ্যামবুশ লাগিয়ে বসে থাকে। বেলা দুইটা ৪০ মিনিটে পাকিস্তানি সেনাদের দুটি নৌকা সেদিকে অগ্রসর হয়। অ্যামবুশের আওতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেনারা তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড গোলাগুলির পর তাদের দুটি নৌকাই ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে ৩০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। আমাদের একজন সেনা শহীদ হয়। চতুর্থ বেঙ্গলের 'ডেলটা' কোম্পানির আরও দুটি প্লাটুন সেপ্টেম্বর মাসের ৫ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত লাতুমুড়া, তাজিপুর, ফতেহপুর, চারনল, বগাবাড়ী প্রভৃতি স্থানে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে ৩৬ পাকিস্তানি সেনা ও ১৭ জন রাজাকার হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা এই এলাকায় আমাদের সেনাদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে ১১ সেপ্টেম্বর একটি শক্তিশালী দল নিয়ে তাজিশ্বর ও বগাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়। পাকিস্তানিদের এ দলের অগ্রসর হওয়ার খবর আমাদের কাছে আগেই পৌঁছে যায়। 'ডেলটা'

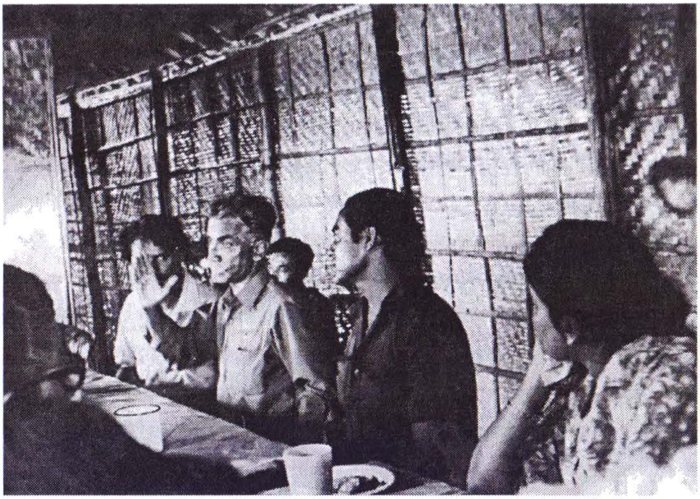
কোম্পানির দুটি প্লাটুন বগাবাড়ীর কাছে পাকিস্তানি সেনাদের পথে অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। ১১ তারিখ সকাল ছয়টায় অগ্রগামী পাকিস্তানি সেনাদলটি আমাদের অ্যামবুশের আওতায় পড়ে যায়। আমাদের সেনারা তাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। প্রবল আক্রমণের মুখে পাকিস্তানিরা টিকতে না পেরে আবার পশ্চাদপসরণ করে। এ যুদ্ধের ফলে ১৫ পাকিস্তানি সেনা নিহত ও দুজন আহত হয়। এই এলাকায় বিপর্যস্ত পাকিস্তানি সেনাদের সাহায্যের জন্য ১৩ তারিখে তাদের পাঁচটি জঙ্গি বিমান বিকেল পাঁচটার সময় আমাদের অবস্থানগুলোর ওপর ঘণ্টাব্যাপী বোমা বর্ষণ করে। তাদের বিমান হামলা আমাদের সেনাদের মনোবল ভাঙতে পারেনি। আমাদের সেনারা তাদের অবস্থানে শত্রুর চাপের মুখেও অটল থাকে। উল্লিখিত এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ এর পরও অব্যাহত থাকে।

পাকিস্তানি সেনারা এই সেক্টরে আরও সেনাসমাবেশ করতে থাকে। তাদের অবস্থানগুলোর দিকে পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা দেওয়ার জন্য চতুর্থ বেঙ্গলের 'ডেলটা' কোম্পানি ১৬ সেপ্টেম্বর শত্রু-অবস্থানের পেছন দিকে মেহায়ী গ্রামে একটি অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। ১৭ তারিখ সকাল সাতটায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হয়ে আমাদের অবস্থানে আক্রমণের জন্য মেহায়ীতে আমাদের অ্যামবুশের কাছে অবস্থান নেয়। তারা অবস্থান নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অ্যামবুশ দল তাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। নিজেদের অবস্থানের এত কাছে তারা আক্রান্ত হবে, তা তারা ভাবতেও পারেনি। ফলে এই আকস্মিক আক্রমণে তারা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি গোলন্দাজ বাহিনী কামানের গোলা ছুড়ে তাদের পালাতে সহায়তা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তাদের নিজেদের কামানের গোলাতেও তাদের অনেক সেনা হতাহত হয়। এই অ্যামবুশে পাকিস্তানি সেনাদের ২১ জন নিহত ও ৪৩ জন আহত হয়। আমাদের সেনারা নিরাপদে পিছু হটে আসতে সক্ষম হয়। ওই দিন রাতে আমাদের এই দলটি সায়েদাবাদের কাছে পাকিস্তানি সেনাদের একটি ঘাঁটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে দুটি জিপ ও একটি তিন-টনি গাড়ি ধ্বংস করে দেয়। এর পরদিন আমাদের রেইডিং দল চারগাছা [চারগাছ] বাজারের কাছে পাকিস্তানি সেনাদের একটি টহলদলকে অ্যামবুশ করে ২০ জন পাকিস্তানি সেনাকে হতাহত করে। পাকিস্তানি সেনারা এই সংবাদ পেয়ে তাদের টহলদলের সাহায্যার্থে একটি শক্তিশালী দল তিনটি নৌকায় করে চারগাছার [চারগাছ] দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু পৌঁছার আগেই

আমাদের সেনারা তাদের শিমরাইলের কাছে অ্যামবুশ করে দুটি নৌকা ডুবিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই নৌকা ভর্তি পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এই সংঘর্ষে আমাদের একজন সেনা শহীদ হয়। আমাদের সেনাদের আক্রমণে এই এলাকার পাকিস্তানি সেনাদের এ ধরনের বিপর্যয়ে তারা আবার আরও ব্যাপকভাবে এই এলাকায় সেনাসমাবেশ ঘটায় এবং চাপ বাড়াতে থাকে। এতে আমরা আরেক অসুবিধার সম্মুখীন হই। ঢাকায় ও ফরিদপুরে যেসব গেরিলাকে পাঠানো হতো, তারা এই এলাকার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করত। পাকিস্তানি সেনাদের তৎপরতার জন্য অনুপ্রবেশ-পথগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

২২ সেপ্টেম্বর আমাদের ৬০ জন গেরিলার একটি দল চারটি নৌকায় অনুপ্রবেশের পথে পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে দুটি নৌকা ডুবে যায়। চারজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয় এবং একজন আহত হয়। তিনটি স্টেনগান, চারটি রাইফেলসহ কিছু টাকা ও ১ হাজার গুলি পানিতে পড়ে হারিয়ে যায়। গেরিলারা আহত ও শহীদদের নিয়ে আমাদের অবস্থানে ফিরে আসে। এই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমার পক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আমি ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনকে যেকোনো উপায়ে এই এলাকাকে পুনর্মুক্ত করার জন্য নির্দেশ দিই। তাকে আরেকটি অতিরিক্ত দল দিয়ে তার শক্তি বাড়িয়ে কসবা থেকে নবীনগর পর্যন্ত আমাদের তৎপরতা বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিই। পাকিস্তানি সেনাদের বিভিন্ন ঘাঁটির ওপর বারবার আক্রমণ করে তাদের এই এলাকা থেকে বিতাড়িত করার জন্য সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন তার তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। সে ১০-১২টি শক্তিশালী রেইডিং দল কসবা, সায়েদাবাদ, চারগাছা প্রভৃতি এলাকায় পাঠিয়ে দেয়। এই রেইডিং দলগুলো বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালালে ২৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ৩০ জন আহত হয় এবং একটি গাড়িও ধ্বংস হয়। আমাদের পুনঃপুন আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি সেনারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে পুরো এলাকায় আমাদের সেনারা পাকিস্তানি সেনাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে।

২৪ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে সাতটায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল ১৭টি নৌকায় আমাদের একটি রেইডিং দলকে আক্রমণ করার জন্য নবীনগরের দিকে অগ্রসর হয়। পাকিস্তানি সেনাদের নৌকাগুলো যখন বিদ্যাকোট গ্রামের কাছে পৌঁছায়, তখন আমাদের সেনারা তাদের অতর্কিতে



সৌজন্যে : সালমা খালেদ

২ নম্বর সেক্টরের বাংলাদেশ হাসপাতালে কর্নেল ওসমানী ও মেজর খালেদ

আক্রমণ করে। আক্রমণে পাঁচটি নৌকা ডুবে যায় এবং অন্তত ২৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ৩৫ জন আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের এসব আক্রমণে সে এলাকার জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং বিপুল আনন্দে মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দিত করে। এর কয়েক দিন পর ৩ অক্টোবর পাকিস্তানি সেনাদের একটি লঞ্চ গোলাবারুদ ও রসদ নিয়ে সায়েদাবাদ যাওয়ার পথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা মলুগ্রামে আক্রান্ত হয়। আক্রমণের ফলে লঞ্চটির গোলাবারুদে আগুন লেগে ডুবে যায়। সেই সঙ্গে ১০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও আহত হয়। আমাদের চারজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয় এবং দুজন আহত হয়। এ খবর পেয়ে পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল আরেকটি লঞ্চযোগে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়ার পথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পরগাছার কাছে আক্রমণ করে। দু-তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর অনেক পাকিস্তানি সেনা লঞ্চ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালানোর চেষ্টা করে এবং ডুবে যায়। পাকিস্তানি সেনাদের ৭০-৮০ জন নিহত ও আরও অনেক আহত হয়। লঞ্চটিরও বেশ ক্ষতি হয় এবং বহু কষ্টে বাকি সেনাদের নিয়ে লঞ্চটি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। ওই দিনই বিকেল পাঁচটার সময় পাকিস্তানি সেনাদের ২০টি নৌকা ও তিনটি স্পিডবোট আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা কসবার কাছে আক্রান্ত হয়। ফলে তৃতীয়

পাঞ্জাবি রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জামান ও একজন ক্যাপ্টেনসহ ১২ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় এবং তিনটি স্পিডবোট ও কয়েকটি নৌকা ডুবে যায়।

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই এলাকায় ছোট ছোট অ্যামবুশ ও ছোট ছোট আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি সেনারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ৩ ও ৪ অক্টোবরে চারগাছা [চারগাছ], মলুগ্রাম, কসবা প্রভৃতি জায়গায় পাকিস্তানি সেনাদের অন্তত ২৫০ থেকে ৩০০ সেনা নিহত হয়। তাদের একটি লঞ্চ, তিনটি স্পিডবোট, ১০টি নৌকা ডুবে যায় এবং অন্য আরেকটি লঞ্চ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লক্ষাধিক পরিমাণ গোলাবারুদ পানিতে ডুবে যায় কিংবা আমাদের দখলে আসে। একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেলসহ বেশ কজন অফিসার নিহত হয়। এর ফলে এই এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের তৎপরতা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা অনেক পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়।

কুমিল্লার দক্ষিণে ও নোয়াখালী এলাকায়ও আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের তৎপরতা আরও জোরদার করে তোলে। ৩০ আগস্ট সকাল ১০টায় লাকসাম থেকে পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল চৌদ্দগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। দলটি আমাদের অবস্থানের ২০০ গজের মধ্যে পৌঁছলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষের মধ্যে সারা দিন ধরে গোলাগুলি চলতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা আক্রোশে রাস্তার আশপাশের সব গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। প্রচণ্ড আক্রমণ সত্ত্বেও আমাদের সেনারা নিজেদের অবস্থানে অটল থাকে। সারা দিনের যুদ্ধে তাদের প্রায় ২০ জন সেনা নিহত এবং অনেক আহত হয়। তারা অগ্রসর হতে সক্ষম না হয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। পরদিন ল্যান্স নায়েক লোকমান আলী ও মুক্তিযোদ্ধারা আহসানউল্লাহর নেতৃত্বে একটি ডেমোলিশন দলকে চৌদ্দগ্রাম-বাঙ্গড়া-লাকসাম রাস্তা দিয়ে শত্রুসেনাদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য রাস্তার মাঝে মাঝে ডেমোলিশন দিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়। দলটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর পর তাদের ডেমোলিশন কাজ শুরু করে। কিন্তু স্থানীয় শান্তি কমিটি ও তাদের লোকেরা পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক প্রতিশোধের ভয়ে রাস্তায় ডেমোলিশন লাগাতে বাধা দেয়। ল্যান্স নায়েক স্থানীয় লোকদের দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বুঝিয়ে বলেন। বোঝানোর পর শান্তি কমিটির লোকেরা তাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে। তারা নিজেরাই রাস্তা খুঁড়ে তিন জায়গাতে ৫০ পাউন্ডের জিলোটিন এক্সপ্লোসিভের ব্যাগ লাগায় এবং ৮০ ফুট রাস্তা উড়িয়ে

দেয়। এতে পার্শ্ববর্তী রাস্তায় দুই পাশের পানি রাস্তার খাদে ঢুকে পড়ে। ফলে চৌদ্দগ্রাম-লাকসাম যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ওই দিন রাতে আমাদের আরেকটি টহলদল কুমিল্লার দক্ষিণ-পূর্বের বাজারের কাছে রাস্তায় মাইন লাগিয়ে একজন ক্যাপ্টেন ও তিনজন পাকিস্তানি সেনাসহ একটি জিপ উড়িয়ে দেয়। আরেকটি দল নাঙ্গলকোট ও লাকসামের মাঝামাঝি রেললাইনের ওপর মাইন পুঁতে একটি ইঞ্জিনসহ রেলের তিনটি বগি ধ্বংস করে। কাজলপুরের কাছে আরেকটি মালবাহী ট্রেন আমাদের পোঁতা মাইনের কারণে লাইনচ্যুত হয়। ফেনী ও লাকসামের মাঝে নাওতি স্টেশনের কাছে ডেমোলিশন লাগিয়ে রেললাইনের পাশে টেলিফোনের তার কয়েক জায়গায় কেটে দেয়। ৩ সেপ্টেম্বর আমাদের আরেকটি ডেমোলিশন দল লালমাই ও জাঙ্গালিয়া স্টেশন থেকে রেললাইনের ওপর ডেমোলিশন লাগিয়ে রেললাইনের খানিকটা উড়িয়ে দেয় এবং জমুয়া ও বেতুরার রেভিনিউ অফিস পুড়িয়ে দেয়।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বেলুনিয়াতে পাকিস্তানি সেনারা তাদের তৎপরতা আরও বাড়িয়ে দেয়। ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নয়নপুরের কাছে বিপুল পরিমাণ সেনার সমাবেশ করতে থাকে। ওই দিন রাত প্রায় তিনটার সময় পাকিস্তানি সেনাদের প্লাটুন বেলুনিয়া নদী অতিক্রম করে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। পাকিস্তানি সেনাদের দলটি নৌকাযোগে যখন নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে তখন আমাদের অগ্রবর্তী দল তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে ১৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং বেশ কিছুসংখ্যক আহত হয়। অবশিষ্ট সেনারা মর্টারের গোলার সহায়তায় পশ্চাদপসরণ করে। পরদিন বিকেল চারটায় পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি শক্তিশালী দল আরও পশ্চিমে মুহুরী নদী অতিক্রম করার চেষ্টা করে। এখানেও আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। গোলাগুলিতে পাকিস্তানি সেনাদের একজন অফিসারসহ ১৫ জন নিহত এবং প্রায় ২০ জন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখে এবং আমাদের অবস্থানগুলোর ওপর প্রচণ্ডভাবে কামানের গোলা বর্ষণ করতে থাকে। আমাদের সেনারা টিকতে না পেরে অগ্রবর্তী অবস্থান ত্যাগ করে স্থায়ী অবস্থানে ফিরে আসে। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের আক্রমণের চাপ অব্যাহত রাখে। সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত এই আক্রমণ চলতে থাকে। আমাদের বীর সেনারা তাদের অবস্থানে থেকে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণকে দেড় ঘণ্টার যুদ্ধে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানি সেনাদের অনেক হতাহত হয় এবং পরে তারা আমাদের

পাল্টা আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা পরশুরামের কাছে সেনাসমাবেশ করতে থাকে। তারা প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সেনা পরশুরামে মোতায়েন করে। ৯ সেপ্টেম্বর আমাদের তথ্য সংগ্রহকারী লোকেরা জানতে পারে যে পাকিস্তানি সেনারা বেশ কয়েকটি ১০৫এমএম কামানসহ সালিয়ার কাছে অবস্থান নিচ্ছে। পাকিস্তানি সেনাদের তৎপরতা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে মুহুরী নদীর পূর্ব পাড়ে তাদের অবস্থান পাকা করে নদী পার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ছাড়া বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা আরও জানতে পারি, যেকোনো উপায়ে বেলুনিয়া এলাকা নিজেদের দখলে আনার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে পাকিস্তানি সেনারা মুহুরী নদী পার হয়ে কামানের প্রচণ্ড গোলার সাহায্যে আমাদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। সারা দিন যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনাদের এই আক্রমণকে আমাদের যোদ্ধারা প্রতিহত করে। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পর আমাদের সেনারা পাকিস্তানি সেনাদের আবার পশ্চিম তীরে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। আমাদের সেনারা যখন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর সম্মুখসমরে প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় গেরিলাদের বেশ কয়েকটি দল পাকিস্তানি বাহিনীর পেছনে আঘাত হেনে তাদের বিপর্যস্ত করে তোলে।

মতিগঞ্জে গেরিলারা পাকিস্তানি সেনাদের একটি ক্যাম্পে অতর্কিতে আক্রমণ করে একজন অফিসারসহ ১১ জন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করে। এতে আরও ২০ জন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দুটি মোটরসাইকেল, তিনটি রেডিও এবং তিন বাক্স ওষুধ দখল করা হয়। আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা এ সংঘর্ষে শহীদ হয়। আরেকটি দল ১০ সেপ্টেম্বর রাত ১০টায় নয়াপাড়ার শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করে তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করে। এখানেও আমাদের গেরিলারা বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়। অপর আরেকটি গেরিলাদল ফেনীর কাছে ফতেহপুর রেলসেতু ডেমোলিশন লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে ৫০ ফুটের একটি খাদের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে লাকসাম-ফেনীর মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া ফেনী শহরেও আমাদের গেরিলারা গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পাকিস্তানি সেনাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। গেরিলারা ফেনী থেকে ফুলগাজী পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাদের টেলিফোন লাইন কেটে তাদের টেলিফোন যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পাকিস্তানি সেনারা তাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলোতে ফেনী থেকে ট্রলির সাহায্যে রসদ সরবরাহ করত। তাদের এই সরবরাহ বন্ধ করার জন্য চিথলিয়ার কাছে ঘানিমোড় রেলসেতুটি উড়িয়ে

দেওয়ার জন্য আমাদের পাইওনিয়ার প্লাটুনকে পাঠানো হয়। প্লাটুনটি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে রাতে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের পেছনে অনুপ্রবেশ করে। পরদিন সকালে তারা সেতুটি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারে, পাকিস্তানি সেনারা সেতুতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছে। অতিকষ্টে তারা মুহুরী নদী সাঁতরে রাতের অন্ধকারে সেতুর নিচে ডেমোলিশন লাগিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি উড়িয়ে দেয়। ফলে ফেনী ও বেলুনিয়াতে পাকিস্তানি সেনাদের ট্রলির সাহায্যে সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। শত্রুদের ওপর আমাদের আক্রমণের চাপ অব্যাহত রাখা হচ্ছিল।

১১ সেপ্টেম্বর আমাদের একটি শক্তিশালী দল কামানের সহায়তায় সন্ধ্যা সাতটায় পরশুরামের কাছে পাকিস্তানি ঘাঁটিতে অতর্কিতে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে সাত সেনা নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়। এর পরদিন আমাদের দুটি শক্তিশালী দল সালদা, সালধর ও জগন্নাথদীঘির শত্রুঘাঁটির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আক্রমণে চার পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং অনেকে আহত হয়। আমাদের এই পুনঃপুন আঘাতের ফলে পাকিস্তানি সেনারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ফেনীর দক্ষিণে তাদের কামানের অবস্থান গড়ে তোলে। সেখান থেকে আমাদের অবস্থানের ওপর কামানের প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে আমাদের অবস্থান বেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। পাকিস্তানি সেনারা তাদের কামানের আক্রমণ অব্যাহত রাখে। তাদের এই কামানের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ১৪ সেপ্টেম্বর সকালে আমাদের একটি কোম্পানিকে তিনটি মর্টারসহ পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের পেছনে পাঠানো হয়। গোপন পথে অনুপ্রবেশ করে দলটি ফেনী বিমানবন্দরের পশ্চিমে বিকেলে পৌঁছায় এবং পাকিস্তানি সেনাদের কামানঘাঁটি সম্পর্কে বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করে। রাত দেড়টায় পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর মর্টারের সাহায্যে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা এ ধরনের আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। আক্রমণের চাপে উপায়ান্তর না দেখে তারা ফেনীতে অবস্থিত তাদের অন্য গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে সাহায্যের আহ্বান জানায়। ফেনী থেকে পাকিস্তানি সেনাদের কামানগুলো আমাদের অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের দুর্ধর্ষ গোলন্দাজ বাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের ফেনী-অবস্থানের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। দুই ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের রেইডিং দল পাকিস্তানি সেনাদের ১০ জনকে হত্যা, ১৬ জনকে আহত এবং তাদের আরও বহু ক্ষতি সাধন করে নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসে। আমাদের কামানের আক্রমণ পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটির যথেষ্ট ক্ষতি

সাধন করে এবং তারা গোলাবর্ষণ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। পরে আমরা জানতে পারি, আমাদের এই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের গোলন্দাজ ঘাঁটিতে ১১ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং ২৩ জন আহত হয়। তাদের তিনটি জিপ ধ্বংস, একটি কামানেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফেনীতে পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল অনেকটা ভেঙে পড়ে। বিশেষ করে, পাকিস্তানি সেনাদের সহায়তাকারী শান্তি কমিটির সদস্য দালালেরা ভয়ে ফেনী শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। অন্যদিকে এই আক্রমণের ফলে আমাদের মুক্তিবাহিনী ও স্বাধীনতাকামী জনগণের মনোবল আরও বৃদ্ধি পায়।

এর পরদিন আমাদের আরও একটি কোম্পানি সালদার [সালধর] শত্রুঘাঁটি রেইড করার জন্য পাঠানো হয়। সারা দিন রেকি করার পর রাত সাড়ে আটটায় আমাদের কোম্পানি গোলন্দাজ বাহিনী ও ৪ ইঞ্চি মর্টারের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায় এবং প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের সেনারা পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলো দখল করে নেয়। পাকিস্তানি সেনারা তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের অগ্রসরের পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের সেনারা ক্ষিপ্রতা ও বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের ওপর তাদের হামলা অব্যাহত রাখে। পাকিস্তানি সেনাদের গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণের ফলে আমাদের অগ্রসরের পথে কিছুটা বাধার সৃষ্টি হয়। তবু আমাদের সেনারা ডান দিক থেকে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। সকাল পর্যন্ত সংঘর্ষে পাকিস্তানি সেনারা তাদের অবস্থান থেকে কিছুটা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। আমাদের সেনারাও এই অবস্থানের পেছনে অবস্থিত একটি পেট্রল ডাম্প ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। এতে ২০-২৫ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। সালধর অবস্থান থেকে সেনাদের বিতাড়িত করার পর আমরা পরশুরামের কাছে অনন্তপুর গ্রামে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের ওপর চাপ বাড়িয়ে তুলি। প্রথম দিন এই অবস্থানে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী আক্রমণ চালায়। ফলে ১০ জন নিহত এবং আরও বেশ কিছু পাকিস্তানি সেনা আহত হয়। এর এক দিন পর আবার অনন্তপুর গ্রামের অবস্থানের ওপর আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী আক্রমণ চালায়। ফলে ১৩ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও দুজন আহত হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাতটার সময় চতুর্থ বেঙ্গলের 'ব্রাভো' কোম্পানি পাকিস্তানি সেনাদের নয়নপুর অবস্থানের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীও সহায়তা করে। যুদ্ধ প্রায় ৩০ তারিখ রাত দুইটা পর্যন্ত চলতে থাকে। ছয় ঘণ্টার যুদ্ধে ১০ জন পাকিস্তানি

সেনা নিহত, ১৫ জন আহত হয় এবং ছয়জনকে বন্দী করে আমাদের সেনারা। এ ছাড়া অনেক অস্ত্রশস্ত্রও দখল করা হয়। পাকিস্তানি সেনারা মাসীরহাট থেকে আরও সেনা এনে শক্তি বৃদ্ধি করে আমাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। আমাদের সেনারা সাহসিকতার সঙ্গে আক্রমণের মোকাবিলা করে। কিন্তু গোলাবারুদ ফুরিয়ে এলে শেষ পর্যন্ত আমাদের বাহিনী অবস্থান ত্যাগ করে নিরাপদে মূল অবস্থানে ফিরে আসে। এ সংঘর্ষে আমাদের পক্ষে একজন শহীদ ও ১১ জন আহত হয়। যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাদের একটি সরবরাহকারী ট্রলি মুন্সিরহাট থেকে বেলুনিয়ার দিকে যাওয়ার পথে আমাদের সেনাদের পুঁতে রাখা মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয়। এতে তিনজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ছয়জন আহত হয়। এতে ট্রলিবোঝাই গোলাবারুদ ও রেশনও ধ্বংস হয়ে যায়।

এ ঘটনার দুই দিন পর ১ অক্টোবর রাত ১১টার সময় আমাদের একটি শক্তিশালী দল পাকিস্তানি সেনাদের মুন্সিরহাট-অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। মুন্সিরহাট পাকিস্তানি সেনাদের জন্য বেলুনিয়া সেক্টরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল। কারণ এই ঘাঁটির মাধ্যমে বেলুনিয়ার পশ্চিম দিকে তাদের অবস্থানগুলোতে সরবরাহ অব্যাহত রেখেছিল। বস্তুত, সে জন্যই তারা আমাদের আক্রমণকে প্রতিহত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে তারা অবস্থান ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। এর পরদিন ২ অক্টোবর পরশুরাম শত্রুঘাঁটির ওপর আমাদের সেনারা আক্রমণের চাপ বাড়াতে শুরু করে। পাকিস্তানিরা বিপুলসংখ্যক সেনার সমাবেশ করে তাদের এই অবস্থানকে রক্ষা করার জন্য আমাদের ওপরও পাল্টা আক্রমণ চালায়। আমাদের সেনারা পাকিস্তানি সেনাদের পরশুরামের দিক থেকে এই পাল্টা আক্রমণ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করে। এতে পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্যান্য অবস্থান থেকে দু-তিন কোম্পানি সেনা একত্র করে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আবার পাল্টা আক্রমণ চালানোর জন্য নির্দেশ দিই। আমাদের সেনারা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের পিছু হটিয়ে দেয় এবং মুহুরী নদী অতিক্রম করে পরশুরামের পাকিস্তানি সেনাদের অনেকগুলো অবস্থান দখল করে নেয়। পাকিস্তানিদের অবস্থানের ওপর এই আক্রমণ হওয়ায় তারা তাদের গোলন্দাজ বাহিনীকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানায়। আমজাদনগরে অবস্থিত পাকিস্তানি গোলন্দাজ বাহিনী পরশুরামের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। কিন্তু

সৌভাগ্যবশত আমাদের আক্রমণের চাপ শত্রুঘাঁটির অতি নিকটবর্তী থাকায় ওই গোলাগুলি বেশির ভাগই তাদের নিজেদের অবস্থানের ওপর আঘাত হানতে থাকে। আমাদের আক্রমণের চাপ ও তাদের নিজেদের গোলার আঘাতে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানটি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩০-৪০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও বিপুলসংখ্যক আহত হয়। তারা উপায়ান্তর না দেখে তাদের পরশুরামের অবস্থান ত্যাগ করে অনেক পেছনে নতুন করে অবস্থান নেয়। কয়েক দিনের যুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সেনাদের কাছে বিপর্যস্ত হয়ে অনেক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে বেলুনিয়া ও পরশুরামের পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়। পাকিস্তানি সেনাদের এরকম শোচনীয় অবস্থা দেখে আমরা তাদের ওপর আমাদের চাপ অব্যাহত রাখি।

২ অক্টোবর সন্ধ্যায় আমাদের একটি দল পাকিস্তানিদের শালদার [শালধর] অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালালে তাদের নয়জন সেনা নিহত হয় এবং অনেক রসদ বিনষ্ট হয়। পাকিস্তানি সেনারা তাদের অবস্থানগুলো রক্ষা করার জন্য ২ ও ৩ অক্টোবরের মধ্যবর্তী রাতে ফেনী থেকে মুন্সিরহাট ও চিথলিয়ায় আরও ১ ব্যাটালিয়ন সেনার সমাবেশ ঘটায়। ৩ তারিখ সকাল ছয়টার সময় তাদের একটি শক্তিশালী দল আমাদের অনন্তপুর ও ধানীকুন্ডার অগ্রবর্তী অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। ভারী কামান ও মর্টারের সাহায্যে তারা আমাদের অবস্থানগুলোতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে এবং সেই সঙ্গে তাদের পদাতিক বাহিনীও আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা হামলা চালিয়ে আমাদের অনন্তপুরের অবস্থানের দক্ষিণাংশের ট্রেঞ্চগুলো দখল করে নেয়। দক্ষিণাংশে একটি হালকা মেশিনগান বাংকারের ওপর কামানের গুলি লেগে সেটি ধ্বংস হয়। এই আঘাতে আমাদের কয়েকজন সেনা শহীদ হয়। পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের এই প্রবল চাপ ও কামানের গুলির মুখে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ ও অস্ত্রের অভাবে টিকতে না পেরে আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটির সেনারা পিছু হটে মুখ্য অবস্থানে ফিরে আসে। পাকিস্তানি সেনারা তাদের আক্রমণ আমাদের মুখ্য অবস্থানের ওপরও চালাতে থাকে। এ সময় আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণে ও মর্টারের গোলায় তাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়ে যায়। মুখ্য অবস্থানের সামনে টিকতে না পেরে তারা ধীরে ধীরে পিছু হটতে চেষ্টা করে। আমাদের মুখ্য অবস্থান থেকে একটি শক্তিশালী দল তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের পাল্টা আক্রমণকারী দলটি আরও অগ্রসর হয়ে অনন্তপুর ও ধানীকুন্ডা পুনর্দখল করে। এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের ৪০-৫০

জন হতাহত হয়। আমাদের একজন শহীদ ও পাঁচজন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা মজুমদারঘাট এবং চিথলিয়ায় তাদের অবস্থানগুলোতে আরও সেনাসমাবেশ করতে থাকে। আমরাও আমাদের চাপ অব্যাহত রাখি।

৪ অক্টোবর রাতে আমাদের একটি শক্তিশালী রেইডিং দল পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে অনুপ্রবেশ করে সকাল ছয়টা পর্যন্ত চিথলিয়ার কাছে পৌঁছায়। সকাল ছয়টায় ৩ ইঞ্চি মর্টারের সহায়তায় চিথলিয়ায় পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের দক্ষিণে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আধঘণ্টা পর্যন্ত আক্রমণের ফলে প্রায় ৩০ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয় এবং একটি আরআর ধ্বংস হয়। এরপর পাকিস্তানি অবস্থান থেকে সরে পড়ে নিরাপদে ফিরে আসে। ৬ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পরশুরাম, মজুমদারহাট, চিথলিয়া ও নোয়াপাড়ার ওপর বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ১০ জন পাকিস্তানি সেনাকে হতাহত করে। ১১ তারিখ সন্ধ্যা সাতটায় পাকিস্তানি সেনারা পরশুরাম ও মজুমদারহাটের দিক থেকে এক ব্যাটালিয়ন শক্তিসহ গোলন্দাজ বাহিনী ও ৩ ইঞ্চি মর্টারে সহায়তায় আমাদের অনন্তপুর-অবস্থানের ওপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা আমাদের অবস্থানের অতি কাছে পৌঁছাতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদের সেনারা বীরবিক্রমে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। সারা রাত আক্রমণ চালানোর পর পাকিস্তানি সেনাদের প্রায় ৩৫ জন সেনা নিহত হয়। শক্ত প্রতিরোধ ব্যর্থ হওয়ায় এবং বিপুল ক্ষয়ক্ষতি দেখে পাকিস্তানি সেনারা তাদের মৃতদেহ ফেলে ভোরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যায়। এই সাফল্যের ফলে আমাদের সেনাদের মনোবল আরও বেড়ে যায়।

১৩ ও ১৪ অক্টোবর পাকিস্তানি সেনারা আমাদের অবস্থানের সামনের এলাকায় তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে চলে। ১৪ অক্টোবর শালধরের কাছে পাকিস্তানি সেনাদের দুটি প্লাটুন আমাদের প্রতিরক্ষা মাইনের শিকার হয়, ফলে ১৮ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ১৩ তারিখ সকাল ১০টায় আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পাকিস্তানিদের পরশুরাম-অবস্থানের ওপর গোলা বর্ষণ করে একটি মেশিনগানসহ পাঁচ পাকিস্তানি সেনাকে ধ্বংস করে। পাকিস্তানি সেনারা দু-তিন দিন নীরব থাকার পর আবার তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। ১৬ অক্টোবর আমাদের দুটি প্লাটুন বিকেল সাড়ে তিনটায় পাকিস্তানি সেনাদের শালদার [শালধর] অবস্থানের ওপর আবার অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ২০ মিনিটের এই আক্রমণে পাঁচজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে ফিরে আসে। ওই দিনই বিকেল সাড়ে চারটার

সময় আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের পরশুরাম-অবস্থানে হামলা চালিয়ে ১০ জনকে হতাহত করে এবং একটি বাংকার উড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানি সেনারা ১৫ তারিখ সন্ধ্যা সাতটায় প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সেনাশক্তি নিয়ে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আমাদের সাহেবনগর, চন্দনা ও জঙ্গলখোলার অবস্থানগুলোর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী এই অবস্থানগুলোর সাহায্যার্থে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। প্রায় তিন ঘণ্টা যুদ্ধে আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে যায়। তাদের হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি।

কুমিল্লার দক্ষিণে জুলাই মাসের শেষের দিকে আমরা শত শত গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিই। এসব গেরিলা কুমিল্লা, চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ প্রভৃতি জায়গাতে প্রবেশ করে নিজ নিজ এলাকায় বেইস গড়ে তোলে। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ফরিদগঞ্জে অবস্থিত আমাদের গেরিলাদের একটি প্লাটুন পাকিস্তানি সেনাদের একটি টহলদলকে বোয়াল নামক স্থানে অ্যামবুশ করে। এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর ১২ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ১৫ জন আহত হয়। বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের গেরিলারা দখল করে নেয়। লাকসাম থানার সাহাপুর গ্রামে পাকিস্তানি সেনাদের একটি ছোট ঘাঁটি ছিল। লাকসামের গেরিলারা ৫ আগস্ট সন্ধ্যা সাতটার সময় এই ঘাঁটির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ১০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও দুজন আহত হয়। আমাদের আরেকটি গেরিলাদলের দুটি প্লাটুন মিয়াবাজারে কাছে পাকিস্তানি সেনাদের একটি ঘাঁটির বিস্তারিত সংবাদ পায়। তিনটি প্লাটুনের এই দলটি ৭ তারিখ রাত পৌনে তিনটার সময় সেই ঘাঁটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। প্রায় আধঘণ্টা যুদ্ধের পর ২৮ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং একজন অফিসার ও জেসিওসহ ১২ জন আহত হয়। আমাদের সেনারা বেশ কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি বাংকার উড়িয়ে দেয়।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে চৌদ্দগ্রাম এবং কুমিল্লার দক্ষিণে কৃষ্ণনগর, কলাতলা, আমজাদহাট প্রভৃতি জায়গায় আমাদের গেরিলারা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর বিভিন্ন সময়ে আঘাত হেনে প্রায় ২০ জনকে হত্যা ও ১৬ জনকে জখম করে। এসব সংঘর্ষে আমাদের ৩৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং তিন জন আহত হয়। সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখে আমাদের একটি গেরিলাদল চট্টগ্রাম-কুমিল্লার রাস্তায় জগন্নাথদীঘির কাছে বাজানকরা সেতুটি উড়িয়ে দিয়ে সেতু থেকে কিছু উত্তরে ১০ জন গেরিলা ও একটি নিয়মিত বাহিনীর পাকিস্তানি

সেনাদের অপেক্ষায় অ্যামবুশ পেতে বসে। সেতুটি ধ্বংসের সংবাদ পেয়ে ফেনী থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি শক্তিশালী দল সেতুর দিকে অগ্রসর হয়। সেতুতে পৌঁছার আগেই পাকিস্তানি সেনারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অ্যামবুশে পড়ে যায়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এতে একজন অফিসারসহ ২৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ফেনীর দিকে পালিয়ে যায়।

পাকিস্তানি সেনারা লাকসামের কাছে হাসনাবাদ নামক এক জায়গায় তাদের একটি ঘাঁটি তৈরি করে। তাদের সঙ্গে বেশ কিছুসংখ্যক রাজাকারও ছিল। এই ক্যাম্প থেকে তারা চাঁদপুর-লাকসাম-কুমিল্লা রাস্তায় অনবরত টহল দিয়ে বেড়াত। ফলে চাঁদপুরে এবং দক্ষিণ ঢাকা ও ফরিদপুরে অনুপ্রবেশকারী আমাদের গেরিলাদের জন্য মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। ঘাঁটিটি ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য লেফটেন্যান্ট মেহবুবকে নির্দেশ দেওয়া হয়। লেফটেন্যান্ট মেহবুব এ ঘাঁটি সম্পর্কে পুরোপুরি সংবাদ সংগ্রহ করে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে চতুর্থ বেঙ্গলের 'ব্রাভো' কোম্পানি ও গেরিলা সমন্বিত একটি শক্তিশালী দল লাকসাম এলাকায় অনুপ্রবেশ করে এবং পরদিন পাকিস্তানি সেনাদের হাসনাবাদ ঘাঁটির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। ফলে প্রায় ২৫ জন পাকিস্তানি সেনা ও ৩০ জন রাজাকার নিহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা ক্যাম্প ছেড়ে কুমিল্লার দিকে পালিয়ে যায়। হাসনাবাদ-অবস্থান থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দখলে আসে। এই সংঘর্ষের এক দিন পর আমাদের দলটি হাজীগঞ্জে অবস্থিত রাজাকারদের একটি বিরাট প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে ৩০ জন রাজাকারকে হত্যা করে। ফলে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রবেশপথটি আবার বিপদমুক্ত হয়। পাকিস্তানি সেনারা এই অঞ্চলে আমাদের ধ্বংস করার জন্য আরও সেনাসমাবেশ ঘটায়। তাদের একটি ব্যাটালিয়ন চৌদ্দগ্রামে মোতায়েন হয়। পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারস একটি মাদ্রাসা বিল্ডিংয়ে স্থাপন করে। এসব সংবাদ আমাদের কাছে স্থানীয় গেরিলাদের মারফতে পৌঁছায়। পাকিস্তানি সেনাদের এ নতুন ব্যাটালিয়নকে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যতিব্যস্ত করে তোলার জন্য লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে আমাদের মর্টার প্লাটুন ও একটি গেরিলাদল চৌদ্দগ্রামে পাঠায়। আমাদের দলটি বিকেল পাঁচটায় চৌদ্দগ্রামের কাছে উপস্থিত হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের হেডকোয়ার্টারসের ওপর মর্টারের গোলা ছোড়ে। বেশ কটি গোলা মাদ্রাসাঘরের মধ্যে পড়ে। এর ফলে পাকিস্তানি সেনাদের ৩০-

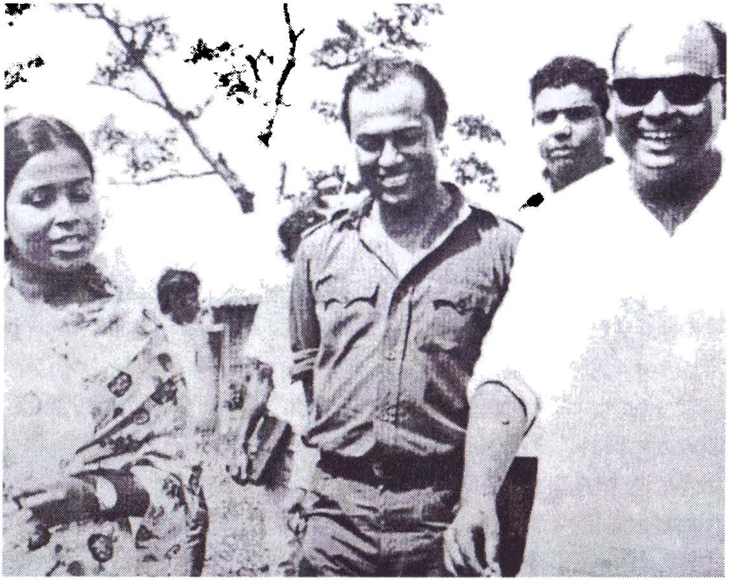
৪০ জন হতাহত হয়। আমাদের একজন প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় গেরিলা সদস্য আহতদের লাকসামের দিকে নিয়ে যেতে দেখে। পাকিস্তানি সেনারা কামানের সাহায্যে আমাদের অবস্থানের ওপর গোলাগুলি চালায়। এতে কিছু বেসামরিক লোক নিহত হয়।

এর দুই দিন পর পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল হরিসর্দার বাজারের কাছে স্থানীয় দালাল, শান্তি কমিটির লোকদের দিয়ে এক সভায় মিলিত হয়। এই সভা পণ্ড করে দেওয়ার জন্য আমাদের একটি টহলদল পাকিস্তানি সেনাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ফলে একজন জেসিওসহ তিনজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। শান্তি কমিটির লোকেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনারা সেপ্টেম্বর মাসেই চৌদ্দগ্রামের উত্তরে হরিসর্দার বাজারের কাছে আবার নতুন করে তাদের ঘাঁটি তৈরি করার চেষ্টা চালায়। এ সংবাদ পেয়ে লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান পাকিস্তানি সেনাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ খবর সংগ্রহ করার জন্য রেকি দল পাঠায়। রেকি দলটি রাত নয়টার সময় খবর সংগ্রহ করে ফেরত আসে। তারা দেখতে পায়, পাকিস্তানি সেনাদের প্রায় এক কোম্পানি শক্তি হরিসর্দার বাজারের উত্তরে ঘাঁটি তৈরি করার জন্য ট্রেঞ্চ খোঁড়ায় ব্যস্ত। সংবাদ পেয়ে লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান চতুর্থ বেঙ্গলের 'ব্রাভো' কোম্পানি এবং দুটি গেরিলা কোম্পানি নিয়ে মর্টারের সহায়তায় রাত সাড়ে চারটার সময় পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আমাদের তীব্র আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি সেনাদের দুটি হালকা মেশিনগান পোস্ট ছাড়া বাকি অবস্থানগুলো পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সেনারা তাদের বাংকার থেকে আক্রমণের চাপে পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় আমাদের সেনাদের আক্রমণে প্রায় ২৫ জন পাকিস্তানি সেনা (রেঞ্জারসহ) নিহত হয় এবং অনেকে আহত হয়। দুই ঘণ্টা আক্রমণ চালানোর পর আমাদের সেনারা নিরাপদে তাদের অবস্থানে ফিরে আসে। পরে পাকিস্তানিরা আহত ও নিহত সেনাদের নিয়ে জিপে করে লাকসামের দিকে পালিয়ে যায়। সকাল প্রায় আটটার সময় পাঁচটি হেলিকপ্টারে করে পাকিস্তানিদের আরেকটি দল ওই অবস্থানের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আসে। শক্তি বৃদ্ধির পর পাকিস্তানি সেনারা প্রায় ১০টার দিকে আমাদের অবস্থানে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। আমাদের অবস্থানটি পাকিস্তানি সেনাদের এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণকে আমাদের সেনারা প্রতিহত করতে থাকে। আমাদের প্রচণ্ড গোলাগুলির

মধ্যেও পাকিস্তানি সেনারা আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের কাছে অগ্রসর হতে সমর্থ হয়। এ সময় আমাদের ৬ ইঞ্চি ও ২ ইঞ্চি মর্টার তাদের ওপর মারাত্মক আঘাত হানে। ফলে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শুধু ক্ষুদ্র একটি পাকিস্তানি সেনাদল আমাদের ডান দিক দিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামানের সময়মতো পাল্টা আক্রমণের ফলে তারাও নিহত হয়। পাঁচ-ছয় ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের বীর সেনারা সাফল্যের সঙ্গে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধে একজন মেজরসহ ৩৮ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। মর্টারের গোলার আঘাতে পাকিস্তানি সেনাদের অফিসার নিহত হওয়ার পর পাকিস্তানি সেনারা মনোবল হারিয়ে পশ্চিম দিকে পিছু হটে যায়।

এর দুই দিন পর ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় আমাদের একটি গেরিলাদল ফতেহপুরের কাছে একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। এতে ৫০ ফুট খাদ সৃষ্টি হয়। ফলে লাকসাম-ফেনীর মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাড়িসা [বাতিসা ও গোবিন্দ মানিক্যর দীঘিতে পাকিস্তানি সেনাদের দুটি ঘাঁটি ছিল। লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় এই দুটি পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর একযোগে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ৮১ এমএম মর্টার, ১৫ এমএম আরআর এবং মেশিনগান ব্যবহার করা হয়। গোবিন্দ মানিক্যর দীঘিতে অবস্থিত পাকিস্তানি সেনারা আমাদের আক্রমণের পূর্বাভাস পেয়ে সতর্ক হয়েছিল। ফলে সাতসা অবস্থানে দুটি বাংকার ধ্বংস ও ছয়জন পাকিস্তানি সেনা আমাদের আক্রমণে নিহত হয়। আমাদের দুজন সেনা আহত হয়। বাতিসা ঘাঁটির ওপর আমাদের আক্রমণ সম্পূর্ণ সফল হয়। আরআর-এর গুলির আঘাতে প্রায় ছয়টি বাংকার ধ্বংস হয়। পাকিস্তানি সেনাদের ২০ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়। আমাদের আক্রমণকারী দলটি দুই ঘণ্টা পর নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসে। এ সংঘর্ষের চার দিন পর ২৩ সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটার সময় একটি প্লাটুন ও ১৬ জন গেরিলা লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামানের] নেতৃত্বে মর্টার এবং আরআর-এর সাহায্যে আবার গোবিন্দ মানিক্য দীঘিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের সময় আমাদের সেনারা শত্রুর বেশ কিছু বাংকার আরআর-এর সাহায্যে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। ফলে প্রায় ১৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয়। এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের সেনারা তাদের অবস্থানে নিরাপদে ফিরে আসে।

পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল কুমিল্লার দক্ষিণে পায়েলগাছা থেকে নারায়ণপুরের দিকে অগ্রসর হয়। তারা নারায়ণপুরের অনেকগুলো বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং নারী ধর্ষণ করে। দু-তিন ঘণ্টা ধরে তাদের অত্যাচার চলে। নারায়ণপুরের দিকে অবস্থিত আমাদের মাত্র ১৩ সদস্যের একটি ছোট গেরিলাদল পাকিস্তানি সেনাদের নারায়ণপুরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে। পরে এই দল পায়েলগাছার রাস্তায় অ্যামবুশ পাতে। পাকিস্তানি সেনারা নারায়ণপুরে অত্যাচার চালানোর পর ফেরার পথে আমাদের অ্যামবুশের আওতায় পড়লে গেরিলারা আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ১৪ জন পাকিস্তানি সেনা ও ২৮ জন রাজাকার নিহত হয় এবং ১৩ জন পাকিস্তানি সেনা ও ১৬ জন রাজাকার আহত হয়। আমাদের বীর যোদ্ধারা তাদের গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাণপণে আক্রমণ চালিয়ে যায়। এই অ্যামবুশে শেষ পর্যন্ত পাঁচজন গেরিলা শহীদ হয় এবং বাকি আটজন ফিরে আসতে সমর্থ হয়। শক্তিশালী পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে ক্ষুদ্র এই গেরিলা বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ এবং আত্মত্যাগ কোনোদিন ভুলবার নয়।



বিশ্রামগঞ্জে বাংলাদেশ হাসপাতালে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে মেজর খালেদ ও ক্যাপ্টেন সিতারা ছবি : *মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র থেকে*

চাঁদপুরের নিকটবর্তী আকন্দহাট বাজারের কাছে আমাদের একটি কোম্পানি তাদের বেইস স্থাপন করে। স্থানীয় দালাল ও রাজাকাররা পাকিস্তানি সেনাদের এ বেইস সম্পর্কে খবর দেয়। বাজারটির তিন দিকে পানি থাকায় আমাদের সেনারা বেইসটিকে যথেষ্ট নিরাপদ মনে করত। ৬ সেপ্টেম্বর সকাল ছয়টার সময় পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল স্থানীয় দালালের সহযোগিতায় আমাদের এই বেইসটি আক্রমণের জন্য আসে। আক্রমণের সময় তারা নৌকার সাহায্যে খাল পার হয়ে বেইসের দিকে এগোনোর চেষ্টা করে। পাকিস্তানি সেনারা কাছে এলে আমাদের সেনারা তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। দুই ঘণ্টার যুদ্ধে একজন মেজরসহ ৩৭ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। খাল পার হতে না পেরে এবং অনেক হতাহতের ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমাদের কোম্পানি পরে সেখান থেকে নিরাপদে অন্য বেইসে চলে আসে।

কুমিল্লার দক্ষিণে পাকিস্তানি সেনাদের কংসতলা ঘাঁটিটি আমাদের গেরিলা বাহিনীর যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করছিল। এই ঘাঁটি থেকে পাকিস্তানি সেনাদের টহলদল আমাদের যাতায়াতের পথে বিশেষ তৎপরতা চালাত। এই ঘাঁটি ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য লেফটেন্যান্ট মেহবুবকে নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করে ৫০ জনের একটি দল লেফটেন্যান্ট মেহবুবের নেতৃত্বে ৩০ সেপ্টেম্বর রাত একটায় এই ঘাঁটিতে অনুপ্রবেশ করে আক্রমণ চালায়। তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর সুবেদার শাহজামানসহ ১৬ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং আটজন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা এই আক্রমণের ফলে এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে, সেখান থেকে তারা তাদের অবস্থান ত্যাগ করে কুমিল্লায় চলে যেতে বাধ্য হয়। এর দুই দিন পর আমাদের ডেমোলিশন দল পেপুলিয়া [নিপুলিয়া] বাজারের কাছে লালমাই-সোনাগাজী সড়কের একটি সেতু বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানি সেনারা রাস্তাটি ট্যাংক ও ভারী গাড়ি চলাচলের জন্য পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করছিল। সেতুটি ধ্বংস করে দেওয়ার পর তারা রাস্তা মেরামতের কাজ বন্ধ করে দেয়। আমাদের আরেকটি গেরিলাদল চান্দিনার কাছে এক স্থানে রাস্তায় মাইন পুঁতে পাকিস্তানি সেনাদের একটি গাড়ি ধ্বংস করে দেয়। এ ছাড়া কুমিল্লার দক্ষিণে ও উত্তরে ১ থেকে ৩ অক্টোবর আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন সংঘর্ষে প্রাণছড়া, কোটেশ্বর, আজনাপুর, বিবিরবাজার, আম্রতলী প্রভৃতি জায়গায় ২৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং আটজন আহত হয়।

আমাদের ৪১ জনের একটি গেরিলাদল ১ অক্টোবর তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করে রাত আটটায় ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়। কসবার দক্ষিণ দিক দিয়ে এই দুটি নৌকায় উজানের শাহ সেতুর কাছে পৌঁছায়। পাকিস্তানি সেনাদের একটি টহলদল রাত ১১টায় আমাদের দ্বিতীয় নৌকাটিকে দেখতে পায় এবং আক্রমণ করে। আক্রমণের ফলে আমাদের পাঁচজন গেরিলা শহীদ ও তিনজন আহত হয়। ১৫টি রাইফেল ও পাঁচটি স্টেনগান পানিতে পড়ে হারিয়ে যায়। বাকি গেরিলারা অতিকষ্টে শত্রুদের নাগালের বাইরে চলে আসতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার তিন দিন পর লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান ৪ অক্টোবর সকাল পাঁচটায় চৌদ্দগ্রামের পাঁচ মাইল উত্তরে হরিসর্দার বাজারে পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর ১০৬ এমএম আরআর ও ৮১ এমএম মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর সাতটি বাংকার ধ্বংস করে ২৫ জন পাকিস্তানি সেনা ও সাতজন রাজাকারকে হতাহত করে। মুক্তিযোদ্ধারা চৌদ্দগ্রামের তিন মাইল দক্ষিণে একটি সেতুও ধ্বংস করে দেয়। ৪ ও ৫ অক্টোবর কুমিল্লার উত্তরে আজনাপুর ও জামবাড়ী এলাকায় আমাদের গেরিলারা পাকিস্তানি সেনাদের বেশ কটি টহলদলকে আক্রমণ করে। এতে ১৫ জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়। আমাদের একজন শহীদ ও একজন আহত হয়। কুমিল্লাতে গোমতী বাঁধে মাইন পুঁতে পাকিস্তানি সেনাদের একটি জিপ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে একজন অফিসারসহ তিনজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এ ছাড়া রামচন্দ্রপুর এবং বাঙ্গড়া ডাকঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হোমনা থানায় অবস্থিত পাকিস্তানি সেনাদের একটি দলের সঙ্গে ৩ [অক্টোবর] তারিখ রাত সাড়ে তিনটার সময় আমাদের একটি গেরিলাদলের সংঘর্ষ হয়। ছয় ঘণ্টার যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনারা সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের গেরিলারা পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দী ১৯ জনকে মুক্ত করে দেয় এবং নয়টি রাইফেল দখল করে। এরপর হোমনা এলাকা সম্পূর্ণরূপে আমাদের কর্তৃত্বে আসে।

৬ অক্টোবর রাত তিনটার সময় পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল দুর্লভপুরের কাছে আমাদের অ্যামবুশে পড়ে যায়। এই অ্যামবুশে একজন ইঞ্জিনিয়ার কোরের অফিসারসহ ১২ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এ সময় পাকিস্তানি সেনারা গোমতীর উত্তরে আবার তাদের আধিপত্য পুনরুদ্ধারের জন্য তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানি সেনাদের এ তৎপরতাকে বাধা দেওয়ার জন্য লেফটেন্যান্ট দিদারুল আলম দুটি প্লাটুন পানছড়া ও মোহনপুরে পাঠায়। এ প্লাটুনগুলো পাকিস্তানি সেনাদের

চলাচলের রাস্তায় অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। ৮ তারিখ রাতে পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল গোমতী পার হয়ে পানছড়ার দিকে অগ্রসর হয়। সকাল ছয়টার সময় এই দলটি আমাদের অ্যামবুশের আওতায় আসে। ফলে ২০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয়। পরদিন পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি ছোট দল মনোহরপুরে আমাদের অ্যামবুশের আওতায় আসে এবং অ্যামবুশে ছয়জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ওই দিনই আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি দলকে বুড়িচংয়ের কাছে সাদেকপুরে জেরুইনে অ্যামবুশ করে। অ্যামবুশে একজন মেজর ও একজন ক্যাপ্টেনসহ ২০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও সাতজন [ইপিকাফ] নিহত হয়। নিহত একজন ক্যাপ্টেনের নাম সৈয়দ জাভেদ শাহ বলে পরে আমরা জানতে পারি। একজন পাকিস্তানি সেনা আমাদের হাতে বন্দীও হয়। এ সংঘর্ষে আমাদের একজন শহীদ এবং তিনজন আহত হয়। সাতটি রাইফেল আমরা দখল করে নেই।

এর দুই দিন পর ১১ অক্টোবর বেলা সাড়ে ১১টার সময় আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লার সার্কিট হাউস এবং গোমতীর চাঁদপুর ফেরিতে মর্টারের গোলা ছোড়ে। কুমিল্লা সার্কিট হাউসে পাকিস্তানি সেনাদের মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারস ছিল। এই গোলাবর্ষণের ফলে প্রায় ৩৯ জন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার হতাহত হয়। শহরের ভেতরে বসে মর্টারের গোলা ছোড়ায় পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পরে আমরা জানতে পারি যে শহরে অবস্থিত অনেক টহলরত পাকিস্তানি সেনা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের দিকে পালিয়ে যায়। আমরা আরও জানতে পারি, সার্কিট হাউসে গোলাবর্ষণের সময় সেখানে পাকিস্তানি নবম পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং উপস্থিত ছিলেন। অল্পের জন্য তিনি আমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান। পাকিস্তানি সেনারা কুমিল্লা শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে মুক্তিযোদ্ধাদের এই আক্রমণের খবর পাকিস্তানি রেডিও থেকেও প্রচার করে। তারা পাঁচজন সেনা নিহত ও ৩৯ জন আহত হওয়ার কথা স্বীকার করে। আমাদের গেরিলারা কালীরবাজার গ্রামে পাকিস্তানি সেনাদের একটি হেডকোয়ার্টারসের সন্ধান পায়। এ সংবাদ পেয়ে লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান একটি ৭৫ এমএম আরআর, মেশিনগান ও হালকা মেশিনগানসহ একটি প্লাটুন পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি পথপ্রদর্শকের সহায়তায় রাতে পাকিস্তানি সেনাদের হেডকোয়ার্টারসের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ১২ অক্টোবর ভোর পাঁচটায় আমাদের এই দলটি রকেট এবং

মেশিনগানের সাহায্যে পাকিস্তানি সেনাদের এই হেডকোয়ার্টারসে আক্রমণ করে একটি বিল্ডিংয়ে অবস্থিত দুটি বাংকার সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেয়। রকেট হামলায় ওই অবস্থানের আরও পাকিস্তানি সেনা ইতস্তত পালানোর চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় তাদের ওপর মেশিনগানের গুলি ছুড়ে ১২ জনকে হত্যা ও চারজনকে জখম করে। এরপর আমাদের দলটি নিরাপদে আমাদের অবস্থানে ফিরে আসে। এই ঘটনার এক দিন পর বগাবাড়ী ও জাজিশ্বরে [জাতিশ্বর] আরেকটা আক্রমণে সাতজন পাকিস্তানি সেনা ও পাঁচজন রাজাকার নিহত হয়।

বুড়ীচং থানার রামনগর গ্রামে আমাদের গেরিলাদের একটি অবস্থান ছিল। পাকিস্তানি সেনারা স্থানীয় দালালদের কাছে সংবাদ পেয়ে ৮ অক্টোবর দুপুরে একটি শক্তিশালী দল নিয়ে সেই অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে সেই আক্রমণের মোকাবিলা করে। দুপুর একটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের প্রায় ১৬ জন সেনা ও ১৪ জন রাজাকার নিহত হয়। পাকিস্তানি আক্রমণের চাপ বাড়তে থাকলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অবস্থান ত্যাগ করে জাগলপুরে নতুন করে অবস্থান নেয়। পরদিন পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি শক্তিশালী দল সেই অবস্থানের ওপরও আক্রমণ চালায়। প্রায় চার ঘণ্টা যুদ্ধ করে আমাদের যোদ্ধারা ৩৫ জন পাকিস্তানি সেনাকে হতাহত করে। এরপর সেই অবস্থান থেকে প্রধান ঘাঁটিতে ফিরে আসে। আসার পথে পাঁচজন পাকিস্তানি সেনা আমাদের হাতে বন্দী হয়। আমাদের একজন শহীদ, দুজন আহত এবং একজন বন্দী হয়।

আমাদের একটি প্লাটুন ১৫ [অক্টোবর] তারিখ সকাল আটটায় কুমিল্লার দক্ষিণে পাকিস্তানি সেনাদের একটি অবস্থানের আধমাইল দূরে বারচর গ্রামে অ্যামবুশ পাতে। এক ঘণ্টা অবস্থানের পর পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল তাদের ঘাঁটিতে ফেরার পথে এই অ্যামবুশের আওতায় পড়ে। অ্যামবুশে ১২ জন নিহত ও তিনজন আহত হয়। ওই দিনই বিকেলে মনোহরের কাছে পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি দলের ওপর আমাদের সেনারা আক্রমণ করে। পাকিস্তানি সেনাদের এ দল নিকটবর্তী একটি গ্রাম জ্বালিয়ে তাদের ঘাঁটিতে ফেরত যাচ্ছিল। দুই দিন পর ১৮ অক্টোবর রমজানপুরে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা একটি অ্যামবুশ পাতে। রাত প্রায় সাড়ে তিনটার সময় একটি টহলদল এই অ্যামবুশে পড়ে যায়। উভয় পক্ষে প্রায় আধঘণ্টা গোলাগুলি চলে। এতে ১০ জন পাকিস্তানি সেনা ও ১৮ জন রাজাকার হতাহত হয়।

আমাদের একজন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে মৃতদেহ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পাকিস্তানি সেনারা অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মিয়াবাজারের কাছে তাদের একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। আগস্ট মাসে এই অবস্থান থেকে আমরা পাকিস্তানি সেনাদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। পুনরায় এ ঘাঁটি স্থাপন করায় আমরা বুঝতে পারি যে পাকিস্তানি সেনারা আবার চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রাস্তা খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্য প্রথম অবস্থাতেই মিয়াবাজারের শত্রুঘাঁটিটি ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য লেফটেন্যান্ট মেহবুব একটি পরিকল্পনা নেয়। অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখ রাত সাতটার সময় আমাদের একটি কোম্পানি পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটি রেইড করার উদ্দেশ্যে তাদের নিজেদের বেইস থেকে রওনা হয়। রাত প্রায় ১১টার সময় শত্রুঘাঁটির কাছে পৌঁছে তারা অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা হয়। এতে দুজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও পাঁচজন আহত হয়। এরপর আমাদের দল অবস্থান ত্যাগ করে। এর তিন দিন পর ২০ অক্টোবর ভোররাত চারটার সময় মিয়াবাজারের আরেকটি শত্রুঘাঁটির ওপর আমাদের সেনারা আক্রমণ চালায়। অকস্মাৎ এই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দুই ঘণ্টা যুদ্ধের ফলে প্রায় ২১ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং অনেক আহত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের নিহত ও আহত সেনাদের পরের দিন গাড়িতে করে কুমিল্লার দিকে নিয়ে যেতে দেখা যায়। আমাদের দলটি যে রাস্তায় ফিরে আসে, সেই রাস্তার ওপর পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটির কিছু দূরে মাইনের সাহায্যে বুবিট্র্যাপ লাগিয়ে আসে। পরদিন সকালে পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল সে রাস্তায় খবরাখবর নেওয়ার জন্য অগ্রসর হওয়ার পথে বুবিট্র্যাপের কাছে পড়ে যায় এবং মাইন বিস্ফোরণের ফলে ১৬ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও পাঁচজন আহত হয়।

আমাদের আরেকটি দল ইমাম-উজ-জামানের নেতৃত্বে ২২ অক্টোবর ভোর চারটার সময় মর্টার ও ১০৬ আরআর-এর সহায়তায় হরিসর্দার বাজারে পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি নতুন ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। প্রায় ১২ ঘণ্টার যুদ্ধে আমাদের মর্টার, মেশিনগান ও আরআর-এর রকেট পাকিস্তানি সেনাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করে। আরআর-এর সাহায্যে বেশ কটি বাংকার আমাদের সেনারা উড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়। তাদের প্রায় ৩৫ জন হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা কুমিল্লা বিমানবন্দরে অবস্থিত কামানের সাহায্যে আমাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। কামানের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে সন্ধ্যা ছয়টার

সময় আমাদের সেনারা গোলার অভাবে পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। আসার সময় পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের কাছে রাস্তায় মাইন লাগিয়ে আসে। পরদিন সকালে মাইন বিস্ফোরণের ফলে সাত-আটজন পাকিস্তানি সেনা আহত হয়। এর এক দিন পর আমাদের আরেকটি দল সকাল সাতটার সময় চৌদ্দগ্রামের এক মাইল উত্তরে পাকিস্তানি সেনাদের কালীরবাজার ঘাঁটির ওপর মর্টার এবং আরআর-এর সহায়তায় আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে প্রায় ১২ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। এর কয়েক দিন পর পাকিস্তানি সেনাদের একটি টহলদল চৌদ্দগ্রাম থেকে সাড়ে চার মাইল দক্ষিণে আমাদের বাজারের কাছে আমাদের সেনাদের অ্যামবুশে পড়ে। এতে আটজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ১৮ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় আমাদের একটি শক্তিশালী দল মর্টার ও আরআর-এর সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাদের বাড়িসা [বাতিসা] ঘাটের ওপর আক্রমণ চালায়। প্রায় দেড় ঘণ্টার এ যুদ্ধে ২০ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। বাড়িসা [বাতিসা] ঘাটের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের রাজাসার দীঘির অবস্থানের ওপরও আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণের ফলেও প্রায় ছয়জন নিহত হয় এবং বেশ কটি বাংকার আমাদের সেনারা ধ্বংস করে দিতে সমর্থ হয়। আমাদের একটি ছোট দল আড়াইউড়ার কাছে রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখে। পাকিস্তানি সেনারা বাড়িসা [বাতিসা] ও রাজাসার দীঘি আক্রমণের সংবাদ পেয়ে চার-পাঁচটি গাড়িভর্তি সেনা নিয়ে সাহায্যের জন্য সেদিকে অগ্রসর হয়। পথে পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে একটি ট্রাক ও একটি জিপ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে ১৮ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং দুজন অফিসারসহ পাঁচজন আহত হয়। এই এলাকায় সর্বত্র আমাদের আক্রমণের তীব্রতার দরুন পাকিস্তানি সেনারা নাজেহাল হয়ে যায়। ফলে এই এলাকায় আবার প্রাধান্য ফিরে পাওয়ার আশায় ২০ অক্টোবর বিকেল চারটার সময় তাদের একটি শক্তিশালী দল হরিসর্দার ঘাঁটি থেকে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। দলটি কামানের সহায়তায় প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে আমাদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। আমাদের সেনারা ৩ ইঞ্চি মর্টার ও হালকা মেশিনগানের সাহায্যে পাকিস্তানি সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করে। আমাদের গোলাগুলিতে অনেক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। সেই সঙ্গে এই এলাকা থেকে আমাদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যায়।

আগস্ট মাসের প্রথম দিকে নোয়াখালী এলাকায় আমাদের গেরিলাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। অনেক গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ নিজ এলাকাতে পাঠানো হয়। সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য নোয়াখালী জেলাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে বেঙ্গল রেজিমেন্টের চারজন সুবেদারকে এসব এলাকার গেরিলা এবং নিয়মিত বাহিনীর সেনাদের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়। সোনাইমুড়ী, ফরিদগঞ্জ এলাকার ভার সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারী, নোয়াখালী সদরের ভার সুবেদার লুৎফর রহমান, দক্ষিণ ফেনীর ভার সুবেদার জব্বার এবং লক্ষ্মীপুর ও রামগতির ভার অন্য আরেকজন সুবেদারের ওপর আরোপিত হয়। এলাকা বিভক্তের পর স্থানীয় কমান্ডাররা সম্মিলিত গেরিলা ও নিয়মিত বাহিনীর পূর্ণ সহযোগিতায় তাদের তৎপরতা বাড়ায়। সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর নেতৃত্বে আগস্ট মাসের শেষের দিকে ফরিদগঞ্জ থানার রাওয়াল নামক গ্রামে পাকিস্তানি সেনাদের একটি দলকে অতর্কিতে আক্রমণ করলে ১২ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং ১০ জন আহত হয়। আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধাও শহীদ হয়। সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে আমাদের আরেকটি গেরিলাদল গুণবতী ও সরিষাদী রেলস্টেশনে আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ৩২ জন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারকে হতাহত করে। সোনাইমুড়ীর উত্তরে কাদেরবাজারের কাছে পাকিস্তানি সেনাদের ১০টি দলকে অ্যামবুশ করে তিনজনকে হত্যা ও ১০ জনকে জখম করে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয় আমাদের দল। পাকিস্তানি রেঞ্জার ও রাজাকাররা রায়পুরের কাছে এলএম হাইস্কুলে একটি শিবির স্থাপন করে। ৬ আগস্ট সন্ধ্যার সময় আমাদের একটি গেরিলাদল শত্রুদের এই ঘাঁটির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। ফলে নয়জন রেঞ্জার হতাহত হয়। আমাদের একজন আহত হয়। এর দুই দিন পর আমাদের আরেকটি গেরিলাদল পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের একটি দলকে লক্ষ্মীপুর থানার দালাল বাজারে অ্যামবুশ করে ১৫ জন শত্রুসেনাকে হতাহত করে। ১৪ আগস্ট কোম্পানীগঞ্জ থানার বসুরহাটের কাছে পাকিস্তানি মিলিশিয়াদের অ্যামবুশ করে প্রায় ৩০ জনকে হতাহত করে। তারা একটি টয়োটা জিপও ধ্বংস করে দেয়। সংঘর্ষে আমাদের একজন সেপাই নুরুন্নবী গুরুতর আহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা ৩০টি অটোমেটিক এমজির সাহায্যে গোলাগুলি চালায়। ১৮ আগস্ট রামগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এবং কয়েকজন দালালকে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে যাওয়ার পথে হত্যা করা হয়।

পাকিস্তানি পুলিশ এবং রাজাকাররা লক্ষ্মীপুর থানার চন্দ্রগঞ্জ প্রতাপ হাইস্কুলে একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৫ তারিখ রাত ১১টার সময়

আমাদের সেনারা এই ঘাঁটি আক্রমণ করে। এতে প্রায় ৪০ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। আমাদের সেনারা সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়। ১৬ আগস্ট সোনাইমুড়ী রেলস্টেশনের কাছে বগাদিয়া রেলসেতু গেরিলারা উড়িয়ে দেয়। আমাদের গেরিলাদের এসব তৎপরতায় পাকিস্তানি সেনারা আরও ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল বেগমগঞ্জ থানার সোনাপুর ও গোপালপুরের কাছে দালালদের মাধ্যমে আমাদের ঘাঁটির খবর জেনে ৩০ আগস্ট সকালে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। পাকিস্তানি সেনাদের এই আক্রমণকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে প্রতিহত করে। তিন-চার ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনাদের ৪০ জন নিহত হয়। আমাদের সেনাদের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকিস্তানিরা তাদের সেনাদের মৃতদেহগুলো ফেলেই পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধে আমাদের সেনারা ২০টি অস্ত্র দখল করে। আমাদের একজন সেপাই শহীদ হয়। এই ঘটনার দুই দিন পর আমাদের সেনারা মাইন পুঁতে সোনাইমুড়ীর কাছে বানোয়াইতে পাকিস্তানি সেনাদের একটি গাড়ি ধ্বংস করে। ফলে একজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও আটজন গুরুতর আহত হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের একটি দল রামগঞ্জের কাছে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর নেতৃত্বাধীনে ২০ সেপ্টেম্বর আমাদের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল এই ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। প্রায় দুই ঘণ্টা যুদ্ধে ১৪ পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ১৭ জন আহত হয়। এর তিন দিন পর ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে ২৫০ সদস্যবিশিষ্ট পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের একটি দল রামগঞ্জ বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ৫০ সদস্যের একটি দল এ খবর পেয়ে রামগঞ্জ বাজারের পূর্ব দিকে পাকিস্তানি সেনাদের জন্য একটি অ্যামবুশ পেতে রাখে। পাকিস্তানি সেনারা অগ্রসর হওয়ার পথে এই অ্যামবুশে পড়ে যায়। ফলে ২০ জন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার নিহত ও ২৭ জন আহত হয়। আহত পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের বাইজদী [মাইজদী] বেসামরিক হাসপাতালে ভর্তি করে। ২৫ সেপ্টেম্বর আরও দুজন আহত পাকিস্তানি সেনা হাসপাতালে মারা যায়।

আমাদের অপর একটি গেরিলাদল লৌহজং থানার কাছে পদ্মা নদীতে ১৮ হাজার মণ পাটসহ কয়েকটি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এ পাটগুলো নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন পাটকলে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ফেনীর কাছে বারদিন

সেতুটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ফলে ফেনী ও কুমিল্লার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

রাজাকারসহ পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল রামগঞ্জ থেকে লক্ষ্মীপুরের রাস্তার ১০টি গাড়িতে ১৯ সেপ্টেম্বর অগ্রসর হচ্ছিল। এ সংবাদ পেয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর নেতৃত্বে মীরগঞ্জ ও ফজলচাঁদ হাটের কাছে পাকিস্তানি সেনাদের গাড়ির বহরটিকে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আকস্মিক আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি সেনারা সাংঘাতিক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি সেনারাও গাড়ি থেকে নিচে নেমে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। উভয় পক্ষের মধ্যে সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। এই যুদ্ধের ফলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় জনসাধারণের মনোবল আরও সুদৃঢ় হয়। অপর পক্ষে পাকিস্তানি সেনাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আমাদের ৬০ সদস্যের একটি গেরিলাদল ১ অক্টোবর রায়পুরে অবস্থিত রাজাকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ৪০ জন রাজাকরকে হত্যা করে। ১০ অক্টোবর পাকিস্তানিদের একটি রেঞ্জার দলে লক্ষ্মীপুর থেকে রামগঞ্জ যাওয়ার পথে আমাদের গেরিলারা অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে রেঞ্জারদের একটি গাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। এতে একজন রেঞ্জার নিহত ও ১২ জন আহত হয়। এর এক দিন পর পাকিস্তানিদের একটি দল সোনাইমুড়ীতে তাদের গাড়িতে ওঠার সময় সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে আমাদের একটি গেরিলাদল তাদের ওপর আক্রমণ চলায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা গোলাগুলির পর ছয়জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও তিনজন আহত হয়। অবশিষ্ট পাকিস্তানি সেনারা সোনাইমুড়ী থেকে পালিয়ে যায়। ১২ অক্টোবর আমাদের গেরিলারা ফেনী থানার অন্তর্গত লেমুয়ার একজন কুখ্যাত দালালকে হত্যা করে। এ সংবাদ পেয়ে পরদিন সকালে পাকিস্তানিদের একটি শক্তিশালী দল ওই এলাকায় আসে। এবং স্থানীয় জনসাধারণের ওপর নৃশংস অত্যাচার শুরু করে। আমাদের ওই এলাকার গেরিলারা পাকিস্তানি সেনাদের এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য প্রায় ৫০ জন একত্র হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। চার ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। প্রায় সাতজন পাকিস্তানি সেনা ওই যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়। বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দখলে আসে।

জুলাই ও আগস্ট মাসে আমাদের হেডকোয়ার্টারস থেকে কয়েক শ গেরিলা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে অপারেশনের জন্য তৈরি হয়। এসব গেরিলাকে বিভিন্ন দলে

বিভক্ত করে ফরিদপুর সদর ও মাদারীপুর মহকুমার [বর্তমানে জেলা] বিভিন্ন থানার অপারেশনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই দলগুলোকে নবীনগর, দাউদকান্দি হয়ে নদীপথে তাদের নিজস্ব এলাকায় পাঠানো হয়। ৩-৪ হাজার গেরিলা ছোট ছোট দলে গ্রাম্য পথে এবং নদীপথে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষাব্যূহে অনুপ্রবেশ করে তাদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হয়। শুধু একটি দল যাওয়ার পথে হোমনার কাছে পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে একটি নৌকা ডুবে যায়। ফলে চারজন গেরিলা শহীদ হয় এবং চারজন আহত হয়। তিনটি স্টেনগান ও পাঁচটি রাইফেল পানিতে পড়ে ডুবে যায়। নিজ নিজ এলাকায় পৌঁছে গেরিলাদলগুলো তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। এ সময় পাকিস্তানি সেনারা ফরিদপুর হয়ে বরিশালের রাস্তায় যাতায়াত করত। সেপ্টেম্বরে মাদারীপুরের একটি গেরিলাদল ভুরঘাটার কাছে একটি সড়কসেতুতে আক্রমণ চালিয়ে সেতুটি উড়িয়ে দেয়। ফলে পাকিস্তানি সেনাদের বরিশালে যাতায়াতের রাস্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এরপর গেরিলাদের আরেকটি দল নড়িয়া থানা আক্রমণ করে। সেই সঙ্গে ডাকঘর ও রেজিস্ট্রি অফিস জ্বালিয়ে দেয়। ১ হাজার ৫০০ মণ পাটও তারা পুড়িয়ে দেয়।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে গেরিলারা ভেদরগঞ্জ থানা আক্রমণ করে সব পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশকে হত্যা করে। সেখানকার রেজিস্ট্রি অফিস, পোস্ট অফিস কালেক্টরেট অফিস ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়। এরপর কিছুদিনের মধ্যেই গেরিলার পালং থানার রাজগঞ্জ ও কোটালীপাড়ার আক্রমণ চালিয়ে সব সরকারি অফিস ধ্বংস করে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ৪ হাজার মণ পাট জ্বালিয়ে দেয়। পরের সপ্তাহে গেরিলাদের একটি শক্তিশালী দল জাজিরা থানার রাজস্ব অফিস ও রেজিস্ট্রি অফিস বন্ধ করে দেয়। মাদারীপুরের অন্যান্য থানা আক্রমণ হওয়ার ফলে পাকিস্তানি সেনারা মড়িয়া [নড়িয়া] থানায় তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এ থানার পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশ সদস্যরা আশপাশের গ্রামে অকথ্য অত্যাচার চালায়। স্থানীয় গেরিলারা এই থানাটির শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ খবরাখবর সংগ্রহ করে। ৬ সেপ্টেম্বর ৫০ জনের একটি গেরিলাদল রাত আটটার সময় এই থানার [নড়িয়া] ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশ সদস্যরা সর্বশক্তি দিয়ে থানা রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। প্রায় তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের গেরিলারা থানাটি দখল করে নিতে সমর্থ হয়। প্রায় ১৭ জন পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশ নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। থানার দারোগাও এতে নিহত হয়। থানা

থেকে ৩০টি রাইফেল এবং একটি বেতারযন্ত্র গেরিলাদের হস্তগত হয়। গেরিলারা থানাটি ধ্বংস করে দেয়।

গেরিলাদের আরেকটি দল ঝিকরকাঠির কাছে বরিশাল-ফরিদপুর টেলিফোন লাইনের ৬০০ গজ তার নষ্ট করে দেয়। টেলিগ্রাফ বিভাগের টেকনিশিয়ানরা পাকিস্তানি সেনাদের পাহারায় টেলিফোন লাইন মেরামত করতে আসার পথে গেরিলাদের বসানো বিস্ফোরক বিস্ফোরণে তাদের জিপটি ধ্বংস হয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি টহলদল মাদারীপুরের হাওলাদার জুট মিলের কাছে গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় চারজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। গেরিলারা মাদারীপুরের কাছে ঘাটমাঝিতে ৩০-৪০ গজ রাস্তা কেটে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মাদারীপুরের চর মুগরিয়ায় সরকারি পাটগুদামে আগুন লাগিয়ে প্রায় ৫০ হাজার মণ পাট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মাদারীপুর-ফরিদপুর রাস্তায় সমাদ্দার ফেরিঘাটে একটি ফেরি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। একটি মোটর লঞ্চও ধ্বংস করা হয়। এই মোটর লঞ্চটি পাকিস্তানি সেনারা টহল দেওয়ার কাজে ব্যবহার করত। আমাদের গেরিলাদের এসব ব্যাপক তৎপরতায় পাকিস্তানি সেনারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল লঞ্চে মাদারীপুরের দিকে তৎপরতা আরও জোরদার করার জন্য অগ্রসর হয়। এই খবর আমাদের গেরিলারা আগেই পেয়ে যায়। ২০ জনের একটি গেরিলাদল পালং থানার রাজগঞ্জের কাছে নদীর তীরে পাকিস্তানি সেনাদের জন্য অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। সকাল ১০টার সময় লঞ্চটি আমাদের গেরিলাদলের অ্যামবুশের আওতায় এলে তৎক্ষণাৎ গেরিলারা তাদের ওপর আক্রামণ চালায়। এতে ১০-১২ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং বেশকিছু আহত হয়। উপায়ান্তর না দেখে পাকিস্তানি সেনাদের লঞ্চটি শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যায়। এর কয়েক দিন পর পাকিস্তানি সেনারা আরও বেশিসংখ্যক সেনা ফরিদপুর থেকে পালং থানায় মোতায়েন করে। ওই এলাকার গেরিলারা পাকিস্তানি সেনাদের পালং থানার ঘাঁটি পুনর্দখলের পরিকল্পনা নেয়। গেরিলারা সঠিক সংবাদ নেওয়ার পর জানতে পায় যে, থানাতে প্রায় এক প্লাটুন পাকিস্তানি সেনা ও ৫০-৬০ জন পাকিস্তানি পুলিশ সদস্য ও রাজাকার রয়েছে। ২০০-৩০০ জন গেরিলা একত্র হয়ে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ২১ সেপ্টেম্বর রাত ১১টায় পালং থানার ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। প্রায় চার ঘণ্টা সম্মুখযুদ্ধের পর ওই ঘাঁটি থেকে অনেক পাকিস্তানি সেনা উপায়ান্তর না দেখে পালিয়ে যায়। গেরিলারা যুদ্ধে ৫০ জন পাকিস্তানি সেনা, রাজাকার

ও পাকিস্তানি পুলিশ সদস্যকে হত্যা করে। এর পর থেকে সম্পূর্ণ এলাকাটি আমাদের গেরিলাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

কুমিল্লার উত্তরে চতুর্থ বেঙ্গলের 'চার্লি' কোম্পানি ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে এবং 'আলফা' কোম্পানি মেজর সালেক ও ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনের নেতৃত্বে মন্দভাগ ও শালদা নদী এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের ওপর তাদের চাপ অব্যাহত রাখে। ফলে পাকিস্তানি সেনারা মন্দভাগ বাজার, লক্ষ্মীপুর, সাইতসালা প্রভৃতি জায়গা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে চান্দুলা [চান্দলা], পানছড়া ও সেনেরহাট ইত্যাদি জায়গায় তাদের ঘাঁটি পিছিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানি সেনারা পুনরায় তাদের পূর্বোক্ত অবস্থানগুলো দখল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের সেনাদের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষার সামনে তাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তাদের সঙ্গে যখন আমাদের সেনাদের সম্মুখযুদ্ধ তীব্রভাবে চলছিল সেই সময় আমাদের গেরিলারাও পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের পেছনে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাছে বিদ্যাকোটে আমাদের গেরিলাদের একটি দল পাকিস্তানি সেনাদের একটি টহলরত কোম্পানিকে অ্যামবুশ করে। এতে একজন অফিসারসহ ৫০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। তাদের চারটি নৌকাও ডুবিয়ে দেয়। গোঁসাইরহাট রেলস্টেশনের কাছে একটি রেলইঞ্জিন মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলসড়কে গেরিলারা একটি টহলরত পাকিস্তানি সেনাদলকে অ্যামবুশ করলে সাতজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এসব সংঘর্ষে আমাদের গেরিলারা অনেক অস্ত্রশস্ত্র দখল করে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানি সেনারা কসবার পশ্চিমে প্রায় দুই কোম্পানি সেনার সমাবেশ করে। পাকিস্তানি সমাবেশে আমরা বুঝতে পারি যে কসবাকে পুনর্দখল করার জন্য তারা পরিকল্পনা নিয়েছে। আমরা তাদের সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নিই। আমি আমাদের কসবা অবস্থানের সাহায্যার্থে আমাদের প্রথম গোলন্দাজ ব্যাটারিকে [মুজিব ব্যাটারি] মোতায়েন করি।

১৩ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় পাকিস্তানি সেনারা গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আমাদের অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। চতুর্থ বেঙ্গলের 'ডেলটা' কোম্পানি বিপুল সাহস ও দৃঢ় আস্থার সঙ্গে এই আক্রমণের মোকাবিলা করে। প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় তীব্র পাল্টা-আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সেনারা টিকতে না পেরে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে প্রায় ৪৫ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। ১৫টি জি-৩ রাইফেল, একটি ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং সাড়ে ৩ হাজার ৭.৬২ গুলি ও আটটি

৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা আমাদের হস্তগত হয়। এ ছাড়া নয়টি বাংকার ধ্বংস করা হয়। এ প্রচণ্ড সংঘর্ষে আমাদের দুজন শহীদ হয় এবং একজন আহত হয়। পরে জানা যায়, পাকিস্তানি সেনারা এই আক্রমণে পঞ্চম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সেনা নিয়োগ করেছিল। পরদিন পাকিস্তানি সেনারা যখন কসবার পশ্চিম দিক থেকে আরও পিছু হটে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় আমাদের একটি প্লাটুন তাদের একটি দলকে অ্যামবুশ করে। অ্যামবুশে প্রায় ১৫ জন পাকিস্তানি সেনা ও ১৫ জন রাজাকার নিহত হয়। আমাদের দুজন সেনা শহীদ এবং একজন আহত হয়। আমাদের একটি হালকা মেশিনগান বিনষ্ট হয়।

এ সময় পাকিস্তানি সেনারা তাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলোতে লঞ্চ ও নৌকার সাহায্যে রসদ সরবরাহ করত। নদীপথে জলযান বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আমি একটি গেরিলাদলকে বাঞ্ছারামপুর থানার উজানচরের কাছে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী পাইলনগুলো কেটে নদীতে ফেলে নদীপথে বাধা সৃষ্টি করার নির্দেশ দিই। নির্দেশমতো আমাদের গেরিলাদল বৈদ্যুতিক পাইলনগুলো কেটে নদীতে ফেলে দিয়ে একটু দূরে অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। পাইলন কাটার সংবাদ পেয়ে তিন-চারটি লঞ্চভর্তি পাকিস্তানি সেনা, মুজাহিদ ও রাজাকার নদীপথের এই বাধাগুলো পরিষ্কার করার জন্য আসে। পাকিস্তানি সেনারা যখন কাজে লেগে যায়, ঠিক এমন সময় অদূরেই অ্যামবুশ পেতে অবস্থানরত আমাদের গেরিলারা তাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ফলে ৭০-৮০ জন পাকিস্তানি সেনা, মুজাহিদ ও রাজাকার নিহত হয়। গেরিলাদের প্রচণ্ড গোলার মুখে অবশিষ্ট পাকিস্তানি সেনা লঞ্চ নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।

এই বিপর্যয়ের কয়েক দিন পর পাকিস্তানি সেনারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাঁচ-ছয়টি লঞ্চে বিপুলসংখ্যক সেনা বিমানবাহিনীর সহায়তায় আমাদের উজানচরের ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। আমাদের সেনারা শুধু হালকা মেশিনগান, রাইফেল ও এসএলআর নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের এই বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ চালায়। কিন্তু বিমান হামলার বিরুদ্ধে টিকতে না পেরে অবশেষে অবস্থানটি ছাড়তে বাধ্য হয়। এর তিন দিন পর ১১ অক্টোবর বিকেল চারটায় আমাদের এই দলটি জানতে পারে, পাকিস্তানি সেনাদের একটি প্লাটুন লঞ্চযোগে বাঞ্ছারামপুর থানার আসাদনগর এলাকা লুট করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এ খবর পেয়ে আমাদের গেরিলাদল পাকিস্তানি সেনাদের লঞ্চটিকে আসাদনগরের কাছে অ্যামবুশ করে। অ্যামবুশে আটজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় এবং অন্যরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। আমাদের

আরেকটি দল হোমনায় তাদের বেইস তৈরি করে। এ সময় হোমনা থানায় পাকিস্তানি সেনারা পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ মোতায়েন করে। আমাদের গেরিলাদলটি হোমনা থানায় অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এতে সাতজন পাকিস্তানি পুলিশ সদস্য নিহত হয় এবং সাতটি রাইফেল ও কয়েক শ গুলি আমাদের দখলে আসে।

পাকিস্তানি সেনারা কসবায় বিপর্যস্ত হওয়ার পর কুমিল্লা থেকে চান্দলার কাছে সেনাসমাবেশ ঘটায়। পাকিস্তানি সেনাদের এ সমাবেশের মূল কারণ ছিল মন্দভাগকে পুনর্দখল করা। চতুর্থ বেঙ্গলের 'চার্লি' কোম্পানি এ সময় মন্দভাগের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। ১৮ তারিখ রাত সাড়ে তিনটায় পাকিস্তানি সেনারা প্রায় এক কোম্পানি শক্তি নিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষার ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। প্রায় তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর সকাল সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত আমাদের সেনারা এই আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানি সেনারা প্রতিহত হয়ে আমাদের রক্ষাব্যূহের সামনে থেকে গোলাগুলি চালাতে থাকে। বেলা ১০টার সময় পাকিস্তানি সেনারা আরও দুই কোম্পানি সেনা নিয়ে দুবার আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনাদের এ শক্তিশালী দলগুলো গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় প্রবল বাধার মাঝেও সামনে অগ্রসর হতে থাকে। অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের সেনাদের গুলিতে তাদের অনেক হতাহত হয়। অবশেষে পাকিস্তানি সেনারা প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে হাতাহাতি যুদ্ধে আমাদের দুর্ধর্ষ সেনারা আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহে অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানি সেনাদের সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানি সেনারা তাদের মৃতদেহ ফেলে রেখেই পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের চারদিকের কর্দমাক্ত নিম্ন জলাভূমি দিয়ে পালানোর পথে তারা আরও বেশি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আমাদের সেনারা এ যুদ্ধে ৩৩তম বালুচ রেজিমেন্টের সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পারভেজ খানসহ আটজন পাকিস্তানি সেনাকে বন্দী করে। এ ছাড়া একজন অফিসারসহ ৫০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ছয়টি এমজিআইএ৩, ২০টি ৭.৬২ চায়না রাইফেল, চারটি জি-৩ রাইফেল, ১১টি মর্টার, একটি হালকা পিস্তল, পাঁচটি সাবমেশিনগান, ১৫ বাক্স মেশিনগানের গুলি, ৩১টি ৯৪-এনার্গা গ্রেনেড, ২০টি ৩৬এইচই গ্রেনেড, ১০টি অনেকগুলো বেয়োনেট, বেশ কিছু জি-৩ রাইফেল ম্যাগাজিন, ১৫টি বিভিন্ন দলিলপত্রসহ বেশকিছু ফাইল আমাদের সেনারা দখল করে নেয়। এই প্রচণ্ড যুদ্ধে আমাদের পাঁচজন সেনা

গুরুতরভাবে আহত হয়, কেউ শহীদ হয়নি। তাদের এই বিপুল বিপর্যয়ের ফলে পর্যুদস্ত দিশেহারা পাকিস্তানি বাহিনী এফ-৮৬ জঙ্গি বিমান দিয়ে আমাদের অবস্থানে প্রায় ৪৫ মিনিটকাল ধরে মারাত্মকভাবে হামলা চালায়। পাকিস্তানিরা গোলন্দাজ ইউনিট ও ভারী কামানের সাহায্যে শত শত গোলা ছুড়তে থাকে। আমাদের এই অবস্থান দখল করতে না পেরে পাকিস্তানি সেনারা কিছুটা পেছনে গিয়ে পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

২০ অক্টোবর পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল সকাল থেকে কামালপুরের কাছে আমাদের আরেকটি অবস্থানের ওপর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণেও তারা আমাদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে না পেরে বিফল হয়। পাকিস্তানিদের একজন অফিসারসহ ৩০ জন সেনা নিহত হয়। বারবার ব্যর্থ হওয়ায় পাকিস্তানি বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সেনারা তিন-চার দিন ধরে আমাদের অবস্থানগুলোর দুর্বলতা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালায়। ২৫ তারিখ বিকেল তিনটা ২৫ মিনিট থেকে চারটা ১০ মিনিট পর্যন্ত মন্দভাগ, মঙ্গলপুর ও শ্রীপুরে আমাদের অবস্থানগুলোর ওপর চারটি এফ-৮৬ জঙ্গি বিমান হামলা চালায় এবং একই সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানি সেনারাও এসব অবস্থানগুলোর ওপর প্রবল আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত চলতে থাকে। আমাদের সেনারাও মনোবল না হারিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের এ সম্মিলিত আক্রমণকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করে। সংঘর্ষে পাকিস্তানি সেনাদের প্রায় ৫৮ জন হতাহত হয়। ফলে তাদের আক্রমণ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বাধ্য হয়ে পিছু হটে যায়। যুদ্ধে আমাদের দুজন সেনা শহীদ এবং নয়জন আহত হয়।

আমরা যখন মন্দভাগে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত এবং পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করার জন্য কসবার অবস্থান থেকে কিছুসংখ্যক সেনা মন্দভাগে নিয়ে মন্দভাগ-অবস্থানকে শক্তিশালী করছিলাম, ঠিক তখনই আমাদের কসবার অবস্থানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানি সেনারা অগ্রসর হয়ে কসবার পুরান বাজার পর্যন্ত পুনর্দখল করে নেয়।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমার সেক্টরের সেনাদের পুনর্গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশ আসে 'কে-ফোর্স' গঠনের, আমি আগে থেকেই মনস্থ করেছিলাম, পাকিস্তানি সেনাদের ওপর পুনরাক্রমণের আগে আমার অধীনস্থ সেনাদের পুনর্গঠনের দরকার। আমাদের সেনারা চার-পাঁচ মাস ধরে অবিরাম যুদ্ধ এবং জীবনধারণের নিম্নতম প্রয়োজন আহার-নিদ্রা থেকে বঞ্চিত

ও যুদ্ধসামগ্রীর অপর্যাপ্ততা ইত্যাদি প্রবল প্রতিকূলতার দরুন স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে শত্রুপক্ষকে আক্রমণের আগে আমাদের সেনাদের কিছু বিশ্রাম ও পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ছাড়া নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাদের নিয়ে এবং চতুর্থ বেঙ্গলের পুরোনো ও অভিজ্ঞ সেনাদের নিয়ে আরও কয়েকটি ব্যাটালিয়ন গঠন করার ইচ্ছা ছিল। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি আমার সাবসেক্টর কমান্ডারদের নিয়ে আমার হেডকোয়ার্টারস মেঘালয়ে একটি কনফারেন্স করি। সে কনফারেন্সে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয় :

ক) চতুর্থ বেঙ্গল থেকে পুরোনো ও অভিজ্ঞ সেনা নিয়ে আরও দুটি ব্যাটালিয়ন গঠন করা হবে।

খ) চতুর্থ বেঙ্গলের 'চার্লি' কোম্পানি এবং হেডকোয়ার্টারসের কিছু সেনা চতুর্থ বেঙ্গলেই থাকবে এবং তাদের নিয়ে চতুর্থ বেঙ্গলকে পুনর্গঠন করা হবে। এই ব্যাটালিয়ন পরিচালনার জন্য ক্যাপ্টেন গাফফারকে নিযুক্ত করা হয়। ব্যাটালিয়নটি পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের জন্য কোনাবন বেইসে একত্র করা হবে।

গ) চতুর্থ বেঙ্গলের 'ডেলটা' ও 'ব্রাভো' কোম্পানির কিছু সেনা নিয়ে নতুন করে নবম বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হবে। ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনকে এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। এই ব্যাটালিয়নকে কসবা বেইসে পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করা হবে।

ঘ) চতুর্থ বেঙ্গলের 'আলফা' ও 'ব্রাভো' কোম্পানির অবশিষ্ট সেনাদের নিয়ে দশম বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হবে। মেজর সালেককে এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। মেজর সালেক এবং চতুর্থ বেঙ্গলের 'আলফা' কোম্পানি শালদা নদীতে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তাকে তার সেনাসহ বেলুনিয়াতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে বেলুনিয়া-রাজনগর বেইসে পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করা হবে।

ঙ) ২ নম্বর সেক্টরের অধীনস্থ সব যোদ্ধাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হবে। নবগঠিত চতুর্থ, নবম ও দশম রেজিমেন্টকে নিয়ে 'কে-ফোর্স' নামে ব্রিগেড গঠন করা হবে।

চ) নবগঠিত 'কে' ব্রিগেডের আলাদা হেডকোয়ার্টারস স্থাপন করে সেখানে স্টাফ অফিসার হিসেবে ক্যাপ্টেন মতিন ও লেফটেন্যান্ট আনোয়ারুল আলমকে নিযুক্ত করা হয়।

ছ) গেরিলা হেডকোয়ার্টারস মেলাঘরেই রাখা হবে। মেজর হায়দার আমার অধীনে গেরিলা স্টাফ অফিসার নিযুক্ত হয়।

জ) ১৮টি সেক্টর কোম্পানি কোম্পানি হিসেবেই থাকবে এবং তারা 'কে-ফোর্স' হেডকোয়ার্টারসের নির্দেশ মেনে চলবে। তাদের সাধারণত কমান্ডো হিসেবে শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে (গভীর অভ্যন্তরে) ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালানোর কাজে নিয়োগ করা হবে।

ঝ) গেরিলারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের নির্মূল করে নিজ নিজ এলাকা শত্রুমুক্ত করবে। পাকিস্তানি সেনাদের ছোট ছোট দলে বিচ্ছিন্ন করে তাদের ঘাঁটিগুলোকে অনুরোধ করে আত্মসমর্পণ করাতে বাধ্য করবে।

ঞ) 'কে-ফোর্স' ব্রিগেডকে পাকিস্তানি সেনাদের শক্তিশালী ঘাঁটিগুলো দখল করার কাজে নিয়োগ করা হবে এবং উদ্ধারকৃত মুক্ত এলাকার প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

ট) অক্টোবর মাসের ১৪ তারিখের মধ্যেই 'কে-ফোর্স' পুনর্গঠনের কাজ শেষ করা হবে।

ঠ) 'কে-ফোর্স' পুনর্গঠনকালে পাকিস্তানি সেনারা যাতে তাদের হৃত মনোবল পুনরুদ্ধার না করতে পারে এবং প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম না হয়, সে জন্য সেক্টর কোম্পানিগুলো এবং কমান্ডো প্লাটুনগুলো গেরিলাদের সহায়তায় চতুর্থ বেঙ্গলের অপারেশন এলাকায় নিয়োজিত থেকে শূন্যতা পূরণ করবে এবং তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখবে।

ড) অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য যুদ্ধসরঞ্জাম যা কিছু আছে তা পুনরায় বিভিন্ন দলের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা হবে।

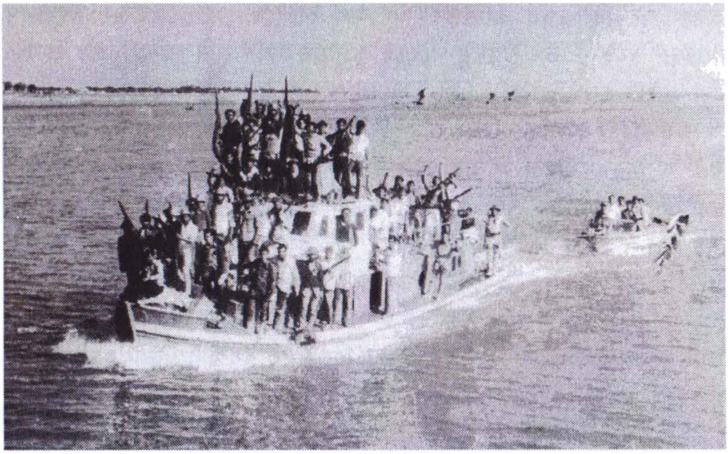
ঢ) গোলন্দাজ বাহিনীর প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্ট 'কে-ফোর্স'-এর অধীনে নিযুক্ত করা হয়।

ণ) 'কে-ফোর্স' এবং ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কত্ব যৌথভাবে আমার অধীনে থাকবে। আমার অবর্তমানে এই দুটি বাহিনী বিভক্ত হবে। কে-ফোর্সের অধিনায়কত্ব করবেন মেজর সালেক এবং ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পালন করবেন মেজর হায়দার।

কনফারেন্সের বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ নম্বর সেক্টরের পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা হয়। নিয়মিত বাহিনীর 'কে-ফোর্স' ব্রিগেড গঠন করার কাজে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। যেহেতু যুদ্ধসামগ্রীর যথেষ্ট অভাব ছিল; বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও পোশাকের; তবুও

সংগঠনের কাজ মোটামুটি এগিয়ে চলে। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে নবম বেঙ্গল রেজিমেন্ট কসবাতে, চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট শালদা নদীতে এবং দশম বেঙ্গল রেজিমেন্ট বেলুনিয়াতে সংগঠিত হয়ে পুনরায় যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যায়। যুদ্ধে পুনর্নিয়োগের আগে এসব ইউনিটকে তিন সপ্তাহের জন্য ব্যাপকভাবে সমন্বিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝিতে নবম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে পরীক্ষামূলকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনর্নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিই। এই সময়ে আমাদের সেক্টর ট্রুপস কসবা, মন্দভাগ প্রভৃতি এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের ওপর মারাত্মক আঘাত হেনে চলছিল। ফলে পাকিস্তানি সেনারা এই এলাকায় ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের সম্পূর্ণভাবে এই এলাকা থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নিই। কসবার পূর্বাংশ ইতিমধ্যেই আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে পিছু হটে পূর্বেই পশ্চিমাংশে পুরান বাজারের কাছে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। নবম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে পাকিস্তানি সেনাদের এই ঘাঁটি আক্রমণের নির্দেশ দিই। নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন তার ব্যাটালিয়নকে লাতুমুড়ার পেছনে সমবেত করে এবং ২০ অক্টোবর পর্যন্ত শত্রু-অবস্থানের সব সংবাদ সংগ্রহ করে। শত্রু-অবস্থানের তথ্য জানার পর বোঝা যায়, পাকিস্তানি সেনারা তাদের অবস্থানটি পূর্ব ও দক্ষিণমুখী করে বেশি শক্তিশালী করে তুলেছে। আমি মেজর আইন উদ্দিনকে নবম বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানি দিয়ে উত্তর দিক থেকে পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর আক্রমণ করার নির্দেশ দিই। শত্রুসেনাদের মনোযোগ অন্যদিকে পরিবর্তন করার জন্য একটি কোম্পানি দিয়ে কসবার দিক থেকে অবস্থানের ওপর চাপ সৃষ্টি করার নির্দেশ দিই। আরেকটি কোম্পানি রিজার্ভে থাকার আদেশ করি। প্রথম ফিল্ড ব্যাটারিকে [মুজিব ব্যাটারি]এই আক্রমণে সহায়তার জন্য মেজর আইন উদ্দিনের অধীনে দিই।

২২ অক্টোবর ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। প্রায় ১০ মিনিট তীব্র কামানের গোলার আক্রমণের পর উত্তর দিক থেকে দুটি কোম্পানি লেফটেন্যান্ট আজিজ [শহীদ লেফটেন্যান্ট খন্দকার আজিজুল ইসলাম বীর বিক্রম] ও সুবেদার শামসুল হকের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য পাকিস্তানি সেনারা প্রস্তুত ছিল না। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তাদের অবস্থানগুলো ভেঙে পড়ে। তারা দিশেহারা হয়ে



মেঘনা নদী পার হচ্ছেন ২ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ছবি : রবীন সেনগুপ্ত

পেছনের দিকে পালিয়ে যায়। তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানটি দখল করে নেয়। যুদ্ধে ২৬ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ১৮ জন আহত হয়। ১১টি এলএমজি, একটি সিগন্যাল পিস্তল, ৪০টি এইচই৩৬ গ্রেনেড, তিনটি ৯৪ এনার্গা গ্রেনেড, ৪৪টি প্লাস্টিক মাইন, একটি ম্যাপ, দুটি র‍্যাংকের ব্যাজ আমাদের হস্তগত হয়। এ যুদ্ধে আমাদের লেফটেন্যান্ট আজিজ ও তিনজন সেনা শহীদ হয় এবং ১৫ জন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের একটি ছোট দল পেছনে হটে গিয়ে ছোট একটি নালার পশ্চিম তীরে পুনরায় দ্রুত অবস্থান গড়ে তোলার চেষ্টা করে। পরদিন ভোররাত চারটার দিকে সুবেদার শামসুল হকের কোম্পানি পাকিস্তানি সেনাদের এই অবস্থানের ওপর আবার আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে প্রায় ২০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ২২ জন আহত হয়। বিপর্যস্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনারা সম্পূর্ণরূপে পেছনে হটে যায়। এই আক্রমণের ফলে সম্পূর্ণ কসবা আমাদের দখলে আসে। পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে গিয়ে মইনপুর, কায়েমপুর [কাইমপুর], কামালপুর প্রভৃতি জায়গায় তাদের নতুন অবস্থান তৈরি করে।

কসবা শত্রুমুক্ত করার পর নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কৃশানপুর, বগাবাড়ী ইয়াকুবপুর এলাকাজুড়ে তাদের নতুন প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করে। এই অবস্থানগুলো থেকে টহলদল ও শক্তিশালী রেইডিং দল পাকিস্তানি

অবস্থানগুলোর ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানের সংঘর্ষে ২২ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ৩০ জন আহত হয়।

চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কোনাবনে তাদের বেইসে পুনর্গঠিত হওয়ার পর অক্টোবর মাসে আবার যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যায়। আমি এই ব্যাটালিয়নকে শালদা নদী থেকে পাকিস্তানি সেনাদের বিতাড়িত করার নির্দেশ দিই। শালদা এলাকাটি ট্যাকটিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে খারাপ বলে তাদের ওপর আমাদের পুরো ব্যাটালিয়ন নিয়ে আক্রমণ করার নির্দেশ দিই। কোম্পানি ও প্লাটুনে ভাগ হয়ে প্রথম তৎপরতা চালিয়ে এলাকার ওপর পুরা আধিপত্য অর্জন করার নির্দেশ দিই। এ নির্দেশের পর ক্যাপ্টেন গাফফার তার মন্দভাগ-অবস্থান থেকে শালদা নদীর পশ্চিমে ও উত্তরে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎপরতা বাড়ায়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি প্লাটুন কায়েমপুরের [কাইমপুর] কাছে অ্যামবুশ পাতে। পাকিস্তানিদের প্রায় ৪০ জন সেনা এই অ্যামবুশে আক্রান্ত হয়। ফলে ১৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং অনেক আহত হয়। এর তিন-চার দিন পর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের আরেকটি রেইডিং দল পাকিস্তানি সেনাদের চত্তরা [ছতুরা] অবস্থানের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে রকেট লঞ্চার দিয়ে একটি বাংকার উড়িয়ে দেয় এবং ১৫ জন পাকিস্তানি সেনাকে হতাহত করে। এর কিছুদিন পর নায়েব সুবেদার সিকদার আফজাল হোসেনের [শেখ আফজাল হোসেন বীর বিক্রম। পরে অনারারি ক্যাপ্টেন] নেতৃত্বে চতুর্থ বেঙ্গলের একটি কোম্পানি পাকিস্তানি সেনাদের পেছনে অনুপ্রবেশ করে চাপিতলায় অ্যামবুশ পাতে। পরদিন ভোররাত চারটার সময় পাকিস্তানি সেনাদের দুটি কোম্পানি তাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলো শক্তিশালী করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। পাকিস্তানি সেনাদের এই দল ভোর পাঁচটায় আমাদের অ্যামবুশে এসে যায়। প্রায় চার ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে প্রায় ৫০ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। এই আক্রমণের পরপরই পাকিস্তানি সেনারা আমাদের অবস্থানের ওপর জঙ্গি বিমান দিয়ে নয়টা ৪৫ মিনিট থেকে ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রচণ্ড আক্রমণ করে। আমাদের পক্ষে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানি সেনাদের কামালপুর, মইনপুর, লক্ষ্মীপুরের অবস্থানগুলোর ওপর তাদের চাপ আরও জোরদার করে তোলে। ১১ নভেম্বর আমাদের একটি শক্তিশালী রেইডিং দল পাকিস্তানি সেনাদের কামালপুরের অবস্থানের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। সাড়ে নয়টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এই আক্রমণে

পাকিস্তানি সেনাদের ১৬ জন নিহত ও ২২ জন আহত হয়। এর পরদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের আরেকটি কোম্পানি লক্ষ্মীপুর ও শালদা নদী ফেরি এলাকা আক্রমণ করে দখল করে নেয়। যুদ্ধে প্রায় ১০০ পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। আমাদের একজন সেনা শহীদ ও সাতজন আহত হয়। শত্রুদের কাছ থেকে ১৫টি রাইফেল, তিনটি এলএমজি, ১২টি এলএমজি বাক্স, দুটি পিস্তল, একটি ৪০ এমএম রকেট লঞ্চার, ৭২টি ৬০ এমএম বোমা, তিনটি টেলিফোন সেট, একটি জেনারেটর, পাঁচটি ওয়্যারলেস সেট ব্যাটারি, একটি মেশিনগানের ব্যারেল এবং চারটি ম্যাপসহ অনেক যুদ্ধসরঞ্জাম দখল করে নেয়। শালদা নদী ফেরি ও লক্ষ্মীপুর এলাকা আমাদের দখলে আসার পর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে শালদা নদী কমপ্লেক্স দখল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

শালদা নদী এলাকায় শত্রুদের ঘাঁটিটি খুবই শক্তিশালী ছিল। এই ঘাঁটির উত্তর দিয়ে শালদা নদী প্রবাহিত হওয়ায় শত্রুদের উত্তর দিক সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ছিল। পূর্ব দিকে রেলস্টেশন ও উঁচু রেললাইন সম্মুখবর্তী এলাকায় শত্রুদের নিরাপত্তায় প্রাধান্য বিস্তার করে। পশ্চিমের গুদামঘরের উঁচু ভূমি তাদের শক্তিশালী ঘাঁটির নিরাপত্তায় বেশ সহায়ক ছিল। এই অবস্থানকে নিয়মিত প্রথায় আক্রমণ করে সফল হওয়া দুষ্কর ছিল। শত্রুঘাঁটির এসব বৈশিষ্ট্য তাদের পক্ষে সহায়ক হওয়ায় আমরা এই ঘাঁটিকে নিয়মিত প্রথায় আক্রমণ না করে অনিয়মিত পদ্ধতিতে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিই। শত্রুদের ঘাঁটি পর্যবেক্ষণের পর আমরা আরও জানতে পারি যে, শালদা নদীর তীর বরাবর আমাদের ঠিক সামনে তারা চারটি বড় পরিখা খনন করেছে। শালদা নদীর গুদামঘরের পাশ দিয়েও তারা একই রকম পরিখা খনন করেছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘাঁটিটি তিন দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যাপ্টেন গাফফার ও নায়েব সুবেদার সিরাজের নেতৃত্বে একটি প্লাটুন শালদা নদী রেলস্টেশনের সঙ্গে পাহাড়ি এলাকায় অবস্থান নেয়। সুবেদার মঙ্গল মিয়ার নেতৃত্বে আরেকটি প্লাটুন শালদা নদী ও গুদামঘরের পশ্চিমে নদী অতিক্রম করে অবস্থান নেয়। সুবেদার বেলায়েতের [শহীদ বেলায়েত হোসেন বীর উত্তম] নেতৃত্বে আরেকটি প্লাটুন শালদা নদীতে শত্রুঘাঁটির বিপরীত দিকে অবস্থান নেয়। পাকিস্তানি সেনারা যাতে আক্রমণের সময় আমাদের পেছন থেকে আঘাত না হানতে পারে, সে জন্য সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে একটি কোম্পানি মঙ্গল মিয়ার [মঙ্গল মিয়া বীর প্রতীক] অবস্থানের পেছনে নিরাপত্তামূলক অবস্থান গ্রহণ করে। এ ছাড়া পাকিস্তানি

সেনাদের মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করার জন্য চারটি ছোট রেইডিং দলকে বড় ধুশিয়া, চান্দলা, গোবিন্দপুর, কায়েমপুর প্রভৃতি শত্রুঘাঁটির দিকে পাঠানো হয়। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী এসব রেইডিং দল ১৫ নভেম্বর রাতে পাকিস্তানি সেনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য শত্রুঘাঁটির ওপর হালকা আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে গোলা বর্ষণ করে। এই গোলাবর্ষণ সারা রাত চলে এবং ভোরের দিকে বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের আক্রমণ শেষ হয়ে গেছে ভেবে পাকিস্তানি সেনারা পরদিন সকালে কিছুটা অসতর্ক হয়ে পড়ে এবং বিশ্রামের সুযোগ নেয়। এ সময় তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহগুলো রাজাকার এবং ইপকাফের [ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স] পাহারায় ছিল। শত্রুরা সাধারণত রাতের বেলায় আমাদের সম্ভাব্য আক্রমণের জন্য যতটা সতর্ক থাকত, দিনের বেলায় ততটা থাকত না।

এমতাবস্থায় আমরা তাদের এই অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সকাল আটটার দিকে তাদের ওপর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচণ্ড আক্রমণ চালাই।

সুবেদার মঙ্গল মিয়ার দলটি পশ্চিম দিক থেকে শালদা নদী গুদামঘরের পরিখায় অবস্থানরত শত্রুদের ওপর এবং নায়েব সুবেদার সিরাজ পূর্ব দিকের পাহাড়ি এলাকার অবস্থান থেকে শালদা নদী রেলস্টেশনের পরিখায় অবস্থানরত শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে নায়েব সুবেদার মুহম্মদ্ হোসেন সুবেদার বেলায়েতের অবস্থান থেকে আরআর-এর সাহায্যে নদীর অপর তীরে শত্রুদের চারটি পরিখা ধ্বংস করে দেয়। এতে আমাদের যথেষ্ট সুবিধা হয় এবং পাকিস্তানি সেনারা সম্মুখবর্তী পরিখা ছেড়ে পিছু হটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার বেলায়েত তার সেনাদের নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সাঁতরে অপর তীরে শত্রুদের সম্মুখবর্তী পরিত্যক্ত পরিখাগুলো দখল করে নেয় এবং কিছু সেনাকে সেসব পরিখায় রেখে সামনের দিকে আরও অগ্রসর হয়। নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে সুবেদার বেলায়েত বীর বিক্রমে সম্মুখভাগের শত্রুপরিখার ওপর গ্রেনেড চার্জ করে আরও কয়েকটি শত্রু-বাংকার ধ্বংস করে। ফলে কয়েকজন শত্রুসেনা নিহত হয়। সুবেদার বেলায়েত ও তার দলের প্রচণ্ড আক্রমণে শালদা নদীর তীরবর্তী এলাকা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত হয়ে যায়। ফলে শালদা নদী রেলস্টেশনে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে শালদা নদী গুদামঘরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।

পাকিস্তানি সেনারা আমাদের ওপর কামান কিংবা মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করার সুযোগ পাচ্ছিল না। কেননা, আমাদের সেনারা তাদের দুই দলের

মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে যাওয়ায় তাদের গোলাবর্ষণে নিজেদেরই ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। গুদামঘরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা বুঝতে পারে যে তারা দুই দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণের শিকার হয়ে মূল ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাদের পক্ষে এই আক্রমণের মুখে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়। এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের একটি ওয়্যারলেস মেসেজ আমাদের কাছে ধরা পড়ে। এতে তারা কর্তৃপক্ষকে জানায়, মুক্তিবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন তাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাচ্ছে। তাদের পক্ষে এই ঘাঁটিতে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এ মেসেজ পাওয়ার পর পাকিস্তানি সেনাদের দুর্বলতা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি। তাদের মনোবল যে একেবারেই ভেঙে পড়েছে তা বেশ বোঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার মঙ্গল মিয়াকে তার আক্রমণ আরও জোরদার করার নির্দেশ দিই। এই প্রচণ্ড আক্রমণে টিকতে না পেরে গুদামঘরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা নয়নপুর রেলস্টেশনের দিকে পালাতে থাকে। সুবেদার মঙ্গল মিয়ার দলটি গুদামঘর এলাকা দখল করে নেয়।

আরও কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর সুবেদার বেলায়েত এবং নায়েব সুবেদার সিরাজের প্রচণ্ড আক্রমণে শালদা নদী রেলস্টেশনে অবস্থানকারী পাকিস্তানি সেনারা রেললাইন ধরে নয়নপুরের দিকে পালাতে থাকে। আমাদের সেনারা পলায়নপর পাকিস্তানি সেনাদের ওপর গুলি চালায়। এতে অনেক হতাহত হয়। দুপুর নাগাদ সমস্ত শালদা নদী এলাকা শত্রুমুক্ত হয় এবং আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীণে আসে। পাকিস্তানি সেনারা যাতে এলাকাটি আবার দখল করে নিতে না পারে, সে জন্য আমাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে তোলা হয়। পাকিস্তানি সেনারা নয়নপুর রেলস্টেশনের ঘাঁটি থেকে বেশ কয়েকবার এই অবস্থানের ওপর মর্টার ও কামানের আক্রমণ চালায় এবং অবস্থানটি পুনর্দখলের জন্য শালদা নদী গুদামঘরের দক্ষিণে কিছুসংখ্যক সেনা শত্রু সমাবেশ করে। এ খবর পেয়ে সুবেদার বেলায়েত একটি দল নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য গুদামঘর এলাকায় আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত হয় এবং তারা পালিয়ে যায়। কিন্তু একজন পাকিস্তানি সেনা আড়াল থেকে সুবেদার বেলায়েতকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। সুবেদার বেলায়েতের মাথায় গুলি বিদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিকিৎসার জন্য ২ নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনী হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হাসপাতালে পৌঁছার আগেই পথে সে শাহাদাত বরণ করে। তার মতো বীর সেনা শহীদ হওয়ায় আমরা সবাই মর্মাহত হয়ে পড়ি।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তথা বাংলাদেশ একজন মহান বীরকে হারাল। সুবেদার বেলায়েতের কীর্তি ও বিক্রমের কথা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শালদা নদী এলাকা দখল করা একটি দুঃসাহসী পরিকল্পনা ছিল। এই পরিকল্পনা অত্যন্ত অপ্রচলিত কৌশলের একটি বিরাট সাফল্য। এর ফলে কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন গাফফার ও শহীদ বেলায়েতকে কৃতিত্বপূর্ণ লড়াইয়ের জন্য বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন। এই যুদ্ধে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। এগুলোর মধ্যে ২১টি রাইফেল, পাঁচটা এলএমজি, তিনটি এমজি আইএ-৩ মেশিনগান, ৩১টি হালকা মেশিনগান ম্যাগাজিন, চারটি রকেট লঞ্চার (৮০টি গোলাসহ), একটি এসএমজি, একটি ওয়্যারলেস সেট, ২০ হাজার ২৫০টি গুলি, ২০০টি ২ ইঞ্চি মর্টার বোমা, তিনটি টেলিফোন সেট, একটি জেনারেটর, দুটি এমজি ব্যারেল, অনেক রেশন ও কাপড়চোপড়, ম্যাপ ও বিভিন্ন ধরনের নথিপত্র আমাদের দখলে আসে। এসব দলিলপত্র থেকে জানা যায়, ৩০ জন পাঞ্জাব



ছবি : খালেদ'স ওয়ার তথ্যচিত্র থেকে

অভিযানের জন্য নদীপথে এগিয়ে যাচ্ছেন মেজর খালেদ

রেজিমেন্টের 'ব্রাভো' কোম্পানি ও 'ডেলটা' কোম্পানি পাকিস্তানিদের প্রতিরক্ষাব্যূহে নিয়োজিত ছিল। এ সংঘর্ষে ৮০-৯০ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয় এবং ১২ জন পাকিস্তানি সেনা আমাদের হাতে ধরা পড়ে। ভোর পাঁচটা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ১৬ ঘণ্টা যুদ্ধে আমাদের দুজন শহীদ ও আটজন আহত হয়।

শালদা নদী কমপ্লেক্স আমাদের হস্তগত হওয়ার পর পাকিস্তানি সেনারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই এলাকা পুনর্দখলের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা চান্দলার কাছে অন্যান্য এলাকা থেকে বিপুলসংখ্যক সেনা এনে সমাবেশ ঘটায়। ১৬ নভেম্বর রাত দুইটা ১৫ মিনিটে পাকিস্তানি সেনারা প্রায় দুই ব্যাটালিয়ন সেনাশক্তি নিয়ে আমাদের শালদা নদী, মন্দভাগ, কামালপুর, প্রভৃতি অবস্থানের ওপর গোলন্দাজ বাহিনী ও মর্টারের সহায়তায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ তিন-চার ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে। চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের এই প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করে। সকাল পর্যন্ত যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের বিপুলসংখ্যক সেনা হতাহত হয়। উপায়ান্তর না দেখে তারা আক্রমণ বন্ধ করে পিছু হটে যায়। এর এক দিন পর আমাদের একটি ছোট দল মঙ্গলপুরে কাছে পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এতে ১৭ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও অনেকে আহত হয়। আরেকটি রেইডিং দল কাইমপুরে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের দুটি বাংকার আরআর দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। এতে ১৪ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ২০ ও ২১ নভেম্বর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'আলফা' ও 'ব্রাভো' কোম্পানি মঙ্গলপুর ও কাইমপুরের ওপর তাদের চাপ বাড়িয়ে তোলে। ২১ তারিখ সকাল নয়টার সময় এই দুই কোম্পানি পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ১৬ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং নয়জন আহত হয়। ১০৬ আরআর-এর সাহায্যে পাকিস্তানি সেনাদের বেশ কটি বাংকার উড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাদের সেনারা অনেক অস্ত্রশস্ত্রও দখল করে নেয়। ২৩ নভেম্বর পাকিস্তানি সেনারা আমাদের মন্দভাগ-অবস্থান পুনর্দখলের জন্য আবার তাদের সেনা একত্র করতে থাকে। দুপুর দুইটার সময় আমাদের একটি কোম্পানি পাকিস্তানি সেনাদের সমাবেশের ওপর আক্রমণ চালায়। ফলে পাকিস্তানি সেনাদের অনেক হতাহত হয়। পরে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। মন্দভাগ পুনর্দখল করতে অসমর্থ হয়ে পাকিস্তানি সেনারা শালদা নদীর কাছে মনোরা রেলসেতুর নিকটবর্তী আমাদের অবস্থানগুলোর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। মেশিনগান, ১০৬ মি.মি. আরআর ও গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানি

সেনারা আমাদের অবস্থানের একটি বাংকার ধ্বংস করতে সমর্থ হয়। আমাদের সেনারা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয় এবং তাদের বহু সেনাকে হতাহত করে। আমাদের একজন সেনা শহীদ এবং চারজন আহত হয়। একটি মেশিনগান গোলন্দাজ বাহিনীর গুলিতে নষ্ট হয়ে যায়। ২৩ নভেম্বর থেকে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বেশ কটি খণ্ডযুদ্ধে আমাদের সেনারা শত্রুদের বিতাড়িত করে দিতে সমর্থ হয়। এই এলাকায় শত্রুরা পর্যুদস্ত হয়ে বুড়ীচং ও কুমিল্লার দিকে সরে যায়।

এর কয়েক দিন পর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলকে শালদা নদী থেকে ফেনীর দিকে আক্রমণ চালানোর জন্য 'কে' ফোর্সের অধীনে বেলুনিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কামালের [কামাল উদ্দিন আহমেদ] অধীনে কয়েকটি সেক্টর কোম্পানি শালদা নদীতে রেখে ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল বেলুনিয়াতে 'কে' ফোর্সে যোগদান করে। দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট রাজনগরে তাদের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের পর তাদের দুই সপ্তাহের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাপক প্রশিক্ষণের পর বেলুনিয়ায় আবার তাদের পুরোনো প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলোতে পাঠানো হয় এবং এই সেক্টরে তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সময় দশম ইস্ট বেঙ্গলকে মেজর জাফর ইমাম নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পুনরায় রণক্ষেত্রে পৌঁছানোর পর দশম ইস্ট বেঙ্গল তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। ১৫ অক্টোবর দশম ইস্ট বেঙ্গল অনন্তপুর প্রতিরক্ষাব্যূহের সামনে পরশুরাম, চিথলিয়া প্রভৃতি জায়গায় পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটিগুলোর ওপর ছোট ছোট আক্রমণ চালায়। এসব আক্রমণে ২৪ জন পাকিস্তানি সেনাকে নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের তিনটি বাংকারও তারা ধ্বংস করে। ১৮ অক্টোবর সকাল ছয়টার সময় পাকিস্তানি সেনাদের একটি প্লাটুন আমাদের ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে বেলুনিয়া নদীর পূর্ব তীরে আমাদের সেনাদের অ্যামবুশে পড়ে। ফলে ১২ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং ১৪ জন আহত হয়। ফুলগাজীর কাছে দশম বেঙ্গলের পাইওনিয়ার প্লাটুন ওই দিনই রাস্তায় মাইন পুঁতে সকাল ১০টার সময় পাকিস্তানি সেনাদের একটি ট্রাক ধ্বংস করে দেয়। সাতজন পাকিস্তানি সেনা এতে নিহত এবং তিনজন আহত হয়। ২০ অক্টোবর আমাদের মর্টার ডিটাচমেন্ট সন্ধ্যা ছয়টায় পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে অনুপ্রবেশ করে চিথলিয়া ঘাঁটিটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এতে ১২ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও সাতজন আহত হয়। ২৫ অক্টোবর আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের চিথলিয়া ঘাঁটির ওপর আবার আক্রমণ চালায়। ফলে দুটি

গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায় এবং সাতজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ২৬ অক্টোবর ভোর পাঁচটার সময় ফুলগাজীর কাছে আমাদের একটি প্লাটুন পাকিস্তানি সেনাদের টহলদলকে অ্যামবুশ করে। এতে নয় পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ছয় আহত হয়। এ যুদ্ধে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা কুটি মিয়া শহীদ হয়। ওই দিনই পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল আমাদের ঘাঁটির সামনে এসে মাইন পোঁতার চেষ্টা করে। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের দলটির সঙ্গে আমাদের একটি দলের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ১২ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং ১০ জন আহত হয়। অবশিষ্ট পাকিস্তানিরা আহত এবং নিহত সেনাদের ফেলে এবং অস্ত্রশস্ত্র রেখেই পালিয়ে যায়।

দশম ইস্ট বেঙ্গলের তৎপরতার কারণে এই এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের বিপুল সংখ্যায় সমাবেশ ঘটানো হয়। তারা দশম ইস্ট বেঙ্গলকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। ২৭ অক্টোবর চিথলিয়ার কাছে এক ব্যাটালিয়নের বেশি শক্তির সমাবেশ ঘটায়। সন্ধ্যা ছয়টার সময় গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাদের দুটি কোম্পানি অগ্রসর হয়ে আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি নিলক্ষ্মীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের সেনারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে বাধা দেয়। কিন্তু প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসে। পাকিস্তানি সেনারা নিলক্ষ্মী অগ্রবর্তী ঘাঁটিটি দখল করে নেয়। পরদিন সকালে দশম ইস্ট বেঙ্গলের তিন কোম্পানি আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় নিলক্ষ্মীর ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। সকাল ১০টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলে। প্রচণ্ড চাপে পাকিস্তানি সেনারা টিকতে না পেরে নিলক্ষ্মী ঘাঁটি ত্যাগ করে পিছু হটে যায়। আমাদের সেনারা নিলক্ষ্মী পুনর্দখলের পর প্রতিরক্ষাব্যূহ মালিবিল ও গাবতলী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে। পরদিন সন্ধ্যা ছয়টায় আমাদের একটি প্লাটুন দুবলা চাঙ্গের কাছে একটি অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল বেলুনিয়া যাওয়ার পথে সেই অ্যামবুশে পড়ে। আমাদের প্লাটুনটি পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ চালিয়ে ১৩ জনকে হত্যা করে এবং দুজন পাকিস্তানি সেনাকে জীবিত বন্দী করে। এ ছাড়া অনেক অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়। নিলক্ষ্মীতে পাকিস্তানি সেনারা পর্যুদস্ত হওয়ার পর পুনরাক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। ২৯ অক্টোবর ভোররাত চারটার সময় পাকিস্তানি সেনারা শালদার নয়নপুর এবং ফুলগাজী থেকে আমাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির ওপর কামানের সাহায্যে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। আমাদের কামানগুলোও পাকিস্তানি সেনাদের গোলার প্রত্যুত্তর দেয়। সকালে পাকিস্তানি সেনারা তিন দিক থেকে

আমাদের ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের পাল্টা আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সাড়ে ১২টার সময় পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড বাধার সামনে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি সেনারা পেছন দিকে পালিয়ে যায়। সংঘর্ষে ৪০ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের দুজন সেনা শহীদ হয়।

এই সময়ে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটি চিথলিয়া, পরশুরাম ও বেলুনিয়া থানার কাছে ছিল। এসব ঘাঁটিতে রেলওয়ে ট্রলির সাহায্যে পাকিস্তানি সেনারা ফেনী থেকে রসদ জোগাত। ৫ নভেম্বর রাতে আমাদের একটি রেইডিং দল চিথলিয়ার দক্ষিণে রেললাইনের ওপর অ্যামবুশ পাতে। ৬ নভেম্বর সকাল সাতটায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি ট্রলি আমাদের রেইডিং দলের অ্যামবুশের আওতায় এসে যায়। ট্রলিটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং এতে পাকিস্তানি সেনাদের একজন অফিসারসহ চারজন সেনা নিহত হয়। আমাদের রেইডিং দল একটি হালকা মেশিনগান, একটি রাইফেল, একটি স্টেনগান, একটি ব্লান্ডিসাইট, ২ হাজার গুলি ও ১০টি ব্লানডিসাইট গোলা হস্তগত করে। দশম ইস্ট বেঙ্গল পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণকে ব্যর্থ করার পর বেলুনিয়া থেকে পাকিস্তানি সেনাদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করার জন্য পাল্টা-আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে পরশুরাম ও চিথলিয়ার মাঝে পাকিস্তানি সেনাদের সরবরাহ লাইনের সড়কটি বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তুতি নেয়। ৬ নভেম্বর দশম বেঙ্গলের একটি কোম্পানি গোলন্দাজ বাহিনী ও মর্টারের সহায়তায় চিথলিয়ার উত্তরাংশে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। প্রায় চার ঘণ্টা যুদ্ধের পর দশম বেঙ্গলের কোম্পানিটি চিথলিয়ার উত্তরাংশ দখল করে নিয়ে সালিয়া এবং ধানীকুণ্ডার মাঝখানে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে পরশুরাম ও ফেনীর মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিতে সমর্থ হয়। এর ফলে বেলুনিয়ার উত্তরাংশের পাকিস্তানি সেনারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। একজন অফিসারসহ ১২ জন পাকিস্তানি সেনা যুদ্ধে নিহত এবং পাঁচজন বন্দী হয়। অফিসারের পকেট থেকে পাওয়া এমও ফর্ম থেকে জানা যায়, সে ১৫তম বালুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন ও বেলুনিয়ায় সে সময় ১৫তম বালুচ রেজিমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এ সংঘর্ষে আমাদের মর্টার প্লাটুন কমান্ডার হাবিলদার [নায়েব সুবেদার] ইয়ার আহমদ [শহীদ ইয়ার আহমদ বীর বিক্রম] শহীদ হয় এবং আরও পাঁচজন আহত হয়।



শত্রুমুক্ত ফুলগাজী ইউনিয়ন ছবি : রবীন সেনগুপ্ত

পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। পাকিস্তানি সেনারা চিথলিয়ার দক্ষিণে পশ্চাদপসরণ করে। বিপুল অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের চিথলিয়ার অবস্থান পুনর্দখলের জন্য পাকিস্তানি সেনারা পরদিন ভোর পাঁচটায় দুই কোম্পানি শক্তি নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের কোম্পানি গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় অসীম সাহসের সঙ্গে এই আক্রমণের মোকাবিলা করে। আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সেনাদের গুলির সামনে ও গোলন্দাজ বাহিনীর গোলার মুখে পাকিস্তানি সেনাদের এই আক্রমণটি ব্যর্থ হয়ে যায়। ৩৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং অনেক আহত হয়। কয়েকটি হালকা মেশিনগানসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যায়।

দশম ইস্ট বেঙ্গল উত্তর চিথলিয়া দখলের পর তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ৯ নভেম্বর রাত সাড়ে ১১টার সময় আমাদের একটি টহলদল পাঁচ পাকিস্তানি সেনাকে বন্দী করে এবং একটি মেশিনগান ও চারটি চায়না রাইফেল দখল করে নেয়। দশম বেঙ্গলের দুটি কোম্পানি ৯ নভেম্বর রাত সাড়ে ১১টার সময় পরশুরাম এবং বেলুনিয়া শত্রুঘাঁটির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আক্রমণে অনেক পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় এবং বহু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। চার ঘণ্টা যুদ্ধের পর এ দুটি ঘাঁটি আমাদের

সেনারা দখল করে নেয়। পাকিস্তানি সেনারা পরদিন আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের ওপর জঙ্গি বিমানের আক্রমণ চালায়। আমাদের সেনারা ভারী মেশিনগানের সাহায্যে বিমান আক্রমণের পাল্টা জবাব দেয়। শত্রুদের একটি জঙ্গি বিমান আমাদের মেশিনগানের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে শালিয়ার কাছে ভূপাতিত হয়। বিমান আক্রমণে আমাদের দুজন সেনা শহীদ ও পাঁচজন আহত হয়। এর পরদিন দশম ইস্ট বেঙ্গলের আরও দুটি কোম্পানি সকাল ১০টায় দক্ষিণ চিথলিয়ার ওপর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ চালায়। তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর গেরিলা ও মর্টারের গুলিতে শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং চিথলিয়া রেলস্টেশন ধ্বংস হয়ে যায়। এখানে পাকিস্তানি সেনাদের অনেক হতাহত হয়। আমাদের পক্ষে পাঁচজন শহীদ এবং ১৩ জন আহত হয়। শেষ পর্যন্ত চিথলিয়া আমাদের দখলে আসে। আমাদের সেনারা শত শত অস্ত্রশস্ত্র, ওয়্যারলেস সেট, পোশাক, রেশন প্রভৃতি দখল করে নেয়। চার দিনের যুদ্ধে ৫৭ জন পাকিস্তানি সেনা ও ১৫ জন ইপিসিএএফ [ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স] আমাদের হাতে বন্দী হয় এবং আরও অনেক হতাহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা চিথলিয়া থেকে পালিয়ে মুন্সিরহাটের দক্ষিণে এবং পাঠাননগরের কাছে তাদের রক্ষাব্যূহ আবার স্থাপন করে। তাদের মূল ঘাঁটি ফেনীতে পিছিয়ে নেয়।

এ সময় 'কে' ফোর্স হেডকোয়ার্টারস থেকে পুনরাক্রমণের নির্দেশ আসে। এ নির্দেশ অনুযায়ী 'কে' ফোর্স হেডকোয়ার্টারস কোনাবন অবস্থান থেকে দক্ষিণ বেলুনিয়াতে স্থানান্তরিত হয় এবং বেলুনিয়া সেক্টরে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলকেও এ যুদ্ধে নিয়োজিত করা হয়। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী 'কে' ফোর্সকে অতিসত্বর ফেনী মুক্ত করার আদেশ দেওয়া হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল ফেনীর দিকে অগ্রসর হয়। চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল উত্তর দিক থেকে ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে ফেনীর দিকে অগ্রসর হয়। দশম বেঙ্গল লক্ষ্মীপুর হয়ে ছাগলনাইয়ার দিকে অগ্রসর হয়। 'কে' ফোর্সের এই দুই ব্যাটালিয়নের প্রচণ্ড চাপে পাকিস্তানি সেনারা টিকতে না পেরে তাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি পাঠাননগর ও দক্ষিণ মুন্সিরহাট ছেড়ে পেছন দিকে পালিয়ে যায়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে 'কে' ফোর্স ছাগলনাইয়া ও ফেনীর উপকণ্ঠে পাকিস্তানি সেনাদের উত্তর-পশ্চিম দিকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ফেলে এবং পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানগুলোর ওপর গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই চাপে পাকিস্তানি সেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আমাদের আক্রমণের চাপ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। উপায়ান্তর না দেখে ৬ ডিসেম্বর

পাকিস্তানি সেনারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলে শুভপুর সেতু উড়িয়ে দেয়। যার ফলে পাকিস্তানি সেনাদের পিছু ধাওয়া করা 'কে' ফোর্সের পক্ষে অসুবিধা হয়ে পড়ে এবং তাদের অগ্রাভিযান বাধাপ্রাপ্ত হয়। শুভপুর সেতু মেরামতের জন্য দুই দিন সময় লেগে যায়। মিত্রবাহিনীর প্রকৌশলীরা একটি সেতু পুনর্নির্মাণ করে এবং এরপর সেতু ও নৌকার সাহায্যে চট্টগ্রামের দিকে 'কে' ফোর্সের অগ্রাভিযান আবার শুরু হয়। এ সময় আমি আহত হওয়ায় 'কে' ফোর্সের নেতৃত্ব মেজর সালেকের ওপর ন্যস্ত ছিল।

'কে' ফোর্স ফেনী থেকে করেরহাট পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাদের ছোটখাটো রক্ষাব্যূহ দখল করে তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখে এবং করেরহাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত করে। করেরহাট থেকে চট্টগ্রামে অগ্রসর হওয়ার জন্য নতুন এক পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল ও মুজিব ব্যাটারিকে নিয়ে হিয়াক-ফটিকছড়ি-নাজিরহাট হয়ে চট্টগ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শত্রুবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাবে এবং দশম ইস্ট বেঙ্গল ফেনী-চট্টগ্রাম প্রধান সড়কে সীতাকুণ্ড হয়ে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হবে। এ দ্বিমুখী অগ্রাভিযান চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে পৌঁছে চট্টগ্রাম শহরের ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালাবে। পরিকল্পনামতো চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল মুজিব ব্যাটারিসহ হিয়াকুর দিকে ৭ ডিসেম্বর রাত ১২টায় অগ্রসর হয়। পরদিন সকাল ছয়টায় হিয়াকু বাজারের কাছে পৌঁছার পর পাকিস্তানি সেনাদের একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পাকিস্তানি সেনাদের এই ঘাঁটিতে ৪০-৫০ জন সেনা ছিল। তারা আমাদের বাধা দেয়। কিন্তু আমাদের সেনা ও গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি সেনারা ফটিকছড়ির দিকে পালিয়ে যায়। ফলে হিয়াকু বাজার আমরা অতি সহজেই শত্রুমুক্ত করে নিজেদের দখলে আনি। হিয়াকু থেকে চট্টগ্রামের দিকে একটি কাঁচা রাস্তা গেছে। রাস্তাটি খুবই খারাপ। সেই রাস্তায় হেঁটে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রসর হতে হয়। অগ্রসরের পথে নারায়ণহাটের কাছে পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি অবস্থানের সঙ্গে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের সংঘর্ষ হয়। পাকিস্তানি সেনাদের এই অবস্থানও আমাদের আক্রমণের চাপে টিকতে না পেরে ফটিকছড়ির দিকে পিছু হটে যায়। যাওয়ার সময় একটি কাঠের সেতু ধ্বংস করে দেয়। চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল ওই দিন রাতে নারায়ণহাটে বিশ্রাম নেয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত সেতুটি মেরামত করার পর আমাদের অগ্রযাত্রা আবার শুরু হয়। পথে কাজীরহাটে পাকিস্তানি সেনারা আমাদের অগ্রাভিযানে বাধা দেওয়ার জন্য পথে অনেক মাইন পুঁতে রাখে। এ মাইনগুলো সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রসর হতে হয়।

১০ ডিসেম্বর ফটিকছড়ির উপকণ্ঠে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের অগ্রাভিযানকে পাকিস্তানের ২৪তম ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্ট বাধা দেয়। ফটিকছড়িতে পাকিস্তানিদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। সে জন্য চতুর্থ বেঙ্গলের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন গাফফার পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করে। এরপর চতুর্থ বেঙ্গল দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একটি দল ফটিকছড়ির সন্নিকটে পাহাড়ের দিকে রাস্তায় এবং প্রধান দলটি কাজীরহাট-ফটিকছড়ি রাস্তার দিকে অগ্রসর হয়। ১১ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় এই দুটি দল সম্মিলিতভাবে দুই দিক থেকে পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে মুজিব ব্যাটারি গোলন্দাজ বাহিনীও ফটিকছড়ির ওপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে টিকতে না পেরে রাত ১২টার পর পাকিস্তানি সেনারা সব অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, বিছানাপত্র ফেলে পেছন দিকে পালিয়ে যায়, ফলে ফটিকছড়ি শত্রুমুক্ত হয়। এ যুদ্ধে আমাদের দুজন শহীদ হয়, অপরদিকে শত্রুপক্ষের কমপক্ষে ৩০-৪০ জন হতাহত হয়। এ সময় খবর আসে যে পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল তাদের রামগড় অবস্থান ছেড়ে মানিকছড়ির পথ ধরে ফটিকছড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল থেকে দুটি প্লাটুন ও মর্টার প্লাটুন এই দলকে বাধা দেওয়ার জন্য মানিকছড়ির রাস্তায় পাঠানো হয়। আমাদের প্লাটুনগুলো পাকিস্তানি সেনাদের মানিকছড়ির রাস্তায় সাফল্যের সঙ্গে অ্যামবুশ করতে সমর্থ হয়। পাকিস্তানি সেনারা অতর্কিত আক্রান্ত হয়ে নাজিরহাটের দিকে পালিয়ে যায়। ১২ ডিসেম্বর ভোরে ফটিকছড়ি থেকে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। দু-তিন ঘণ্টা পর ৯টা-১০টার সময় নাজিরহাট নদীর পাড় থেকে পাকিস্তানি সেনারা আমাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে আমাদের অগ্রযাত্রায় বাধা দেয়। ক্যাপ্টেন গাফফার নদীর কাছে একটি দোতলা বাড়ি থেকে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের তথ্য সংগ্রহ করে। খবরাখবর নিয়ে বোঝা যায়, পাকিস্তানি সেনাদের ২৪তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স তাদের প্রায় তিনটি কোম্পানি ও বেশ কিছুসংখ্যক ইপিসিএএফসহ [ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আমর্ড ফোর্স] নাজিরহাট নদীর তীর বরাবর একটি শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে আছে।

১৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাদের সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তারপরই পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর গোলা বর্ষণ করা হয়। কিন্তু শত্রুদের অবস্থান এত শক্তিশালী ছিল যে চার ঘণ্টা যুদ্ধ চালানোর পরও পাকিস্তানি সেনারা আমাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। সুতরাং এইভাবে আক্রমণ চালিয়ে কোনো লাভ নেই মনে করে অন্য পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয় এবং এ কারণে আমাদের সেনাদের কিছুটা পিছিয়ে নেওয়া হয়। এ সময় একজন পাকিস্তানি সেনা আমাদের হাতে জীবিত ধরা পড়ে। ধৃত সেই সেনার কাছ থেকে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ সম্পর্কে আরও সঠিক খবর জানা যায়। তার কাছে জানা যায়, ২৪তম ফ্রন্টিয়ারের মেজর আশেক এ প্রতিরক্ষাব্যূহের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই প্রতিরক্ষাব্যূহের শক্তি এক ব্যাটালিয়নের মতো। নদী বরাবর ব্যাটালিয়নটি অসংখ্য বাংকার তৈরি করে তাদের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করেছে। কিন্তু এদের নজর ফটিকছড়ির দিকে বেশি থাকায় পশ্চিম ভাগ বেশি শক্তিশালী নয়। অতি অল্পসংখ্যক সেনা দিয়ে পশ্চিমের চা-বাগানের দিকে রক্ষাব্যূহ রচনা করা হয়েছে, এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে পশ্চিমের চা-বাগানের দিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী লেফটেন্যান্ট শওকতের [শওকত আলী বীর প্রতীক, পরে ক্যাপ্টেন] নেতৃত্বে গণবাহিনীর একটি কোম্পানি চার ঘণ্টা আগে নাজিরহাট এবং চট্টগ্রামের রেলপথের মাঝে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের পেছন দিকে অনুপ্রবেশ করে অবস্থান নেয়। এরপর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল ১৪ ডিসেম্বর রাতে পশ্চিম দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে চা-বাগানের ভেতর দিয়ে ভোর পাঁচটায় নাজিরহাটে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে তারা এত হতভম্ব হয়ে পড়েছিল যে আমাদের আক্রমণে বাধা পর্যন্ত দিতে পারেনি এবং শত্রুরা ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পায়, আমরা তাদেরকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছি। উপায়ান্তর না দেখে সবকিছু ফেলে তারা চট্টগ্রামের দিকে পালাতে থাকে। পালানোর পথে আমাদের মর্টারের এবং মেশিনগানের গুলিতে অনেক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। প্রায় ৪০ জন হতাহত পাকিস্তানি সেনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া যায়। আটজন পাকিস্তানি সেনা বন্দী হয়, ৪৯ জন ইপিসিএএফ অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। বিপুল গোলাবারুদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র আমাদের হস্তগত হয়। রেশন বোঝাই কয়েকটি ট্রাকও আমাদের দখলে আসে। পালানোর সময় পূর্ব থেকে লেফটেন্যান্ট শওকতের গণবাহিনীর কোম্পানিও পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং অনেককে হতাহত করে। পাকিস্তানি সেনারা রাস্তা ছেড়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে চট্টগ্রামে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। ১৪ ডিসেম্বর নাজিরহাট সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত হয়। আমাদের একজন শহীদ ও একজন সেনা আহত হয়।

পাকিস্তানি সেনারা নাজিরহাট সড়কসেতু আগে থেকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল। সে জন্য নাজিরহাট থেকে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রযাত্রা এক দিন দেরি

হয়ে যায়। নাজিরহাটের স্থানীয় জনগণের সাহায্যে সেই সেতুটির আংশিক পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয় এবং ১৫ ডিসেম্বর নাজিরহাট থেকে চট্টগ্রামের দিকে আমাদের অগ্রাভিযান পুনরায় শুরু হয়। সকালে হাটহাজারী পৌঁছার পর দশম ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। দশম ইস্ট বেঙ্গল মেজর জাফর ইমামের নেতৃত্বে সীতাকুণ্ড হয়ে চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে আসছিল। হাটজাহারীতে যোগাযোগের পর 'কে' ফোর্সের দশম ইস্ট বেঙ্গল ও চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শত্রুমুক্ত করে। ১৬ ডিসেম্বর সকালে এই সম্মিলিত বাহিনী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অগ্রসর হয়ে চট্টগ্রাম শহর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। এই সময় বাংলাদেশ ফোর্সেস হেডকোয়ার্টারস আক্রমণ স্থগিত রাখার নির্দেশ পাঠায়। আরও খবর আসে যে, পাকিস্তানি সেনারা ওই দিন আত্মসমর্পণ করবে। ১৬ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় পাকিস্তানি সেনাদের এক ডিভিশন সেনা 'কে' ফোর্সের কাছে অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তানি সেনাদের ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, নৌঘাঁটি ট্রানজিট ক্যাম্প প্রভৃতি জায়গায় বন্দী করে রাখা হয়। সমস্ত চট্টগ্রাম 'কে' ফোর্সের নিয়ন্ত্রণে আসে। স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ বিজয়মাল্যে ভূষিত করে আমাদের বিজয়ী বীর সেনাদের নিয়ে বিজয় উল্লাসে শহর প্রদক্ষিণ করে।

এ দিকে ১১ ও ১২ নভেম্বর নবম ইস্ট বেঙ্গলের 'আলফা' ও 'ব্রাভো' কোম্পানি কৃষ্ণপুর ও বগাবাড়ী অবস্থান থেকে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের কুমিল্লার দিকে আরও পিছু হটিয়ে দেয়। দুই দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের ১৪ জন নিহত ও সাতজন আহত হয়। আমাদের পক্ষে দুজন শহীদ ও একজন আহত হয়। এই সময় চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল শালদা নদীর দিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। এই দুই ব্যাটালিয়নের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা পরাস্ত হয়ে শালদা নদী, কসবা, মন্দভাগ প্রভৃতি এলাকা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কুমিল্লায় আশ্রয় নেয়। ১ ডিসেম্বর কুমিল্লার উত্তর এলাকা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত হওয়ার পর চারটি সেক্টর কোম্পানিকে এই এলাকায় মোতায়েন রেখে নবম ইস্ট বেঙ্গলকে কুমিল্লার দক্ষিণ-পূর্বে মিয়াবাজার এলাকায় সমাবেশ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ২ ডিসেম্বর নবম ইস্ট বেঙ্গল ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনের নেতৃত্বে মিয়াবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। মিয়াবাজারে ক্যাপ্টেন [লেফটেন্যান্ট] মাহবুবের [মেহবুব] ছয়টি সেক্টর কোম্পানিও তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। ৩ ডিসেম্বর সকালে এই সম্মিলিত বাহিনী

মিত্রবাহিনীর কামানের সহায়তায় মিয়াবাজারে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা এই আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে কুমিল্লার দিকে পিছু হটে যায়। মিয়াবাজার শত্রুমুক্ত করার পর নবম বেঙ্গলের একটি দলকে লাকসামের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন কুমিল্লা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হতে থাকে। যাত্রাপথে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ধ্বংস করে অগ্রাভিযানের গতি অব্যাহত রেখে ৪ ডিসেম্বরের ভোরে ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনের দল কুমিল্লা বিমানবন্দর এলাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে সমর্থ হয়।

কুমিল্লা বিমানবন্দরের কাছে পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। নবম ইস্ট বেঙ্গল মিত্রবাহিনীর গোলান্দাজ বাহিনী সহায়তায় এই ঘাঁটিটির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা এই আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে কুমিল্লা শহরের দিকে পালিয়ে যায়। দুপুরের মধ্যে কুমিল্লা বিমানবন্দর এলাকা শত্রুমুক্ত হয় এবং নবম ইস্ট বেঙ্গলের দুটি কোম্পানি কুমিল্লার দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক (রাজগঞ্জ বাজার) থেকে কুমিল্লা শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাদের আরও বিতাড়িত করে ময়নামতির পথে রেলক্রসিং এলাকা পর্যন্ত শত্রুমুক্ত করে। নবম ইস্ট বেঙ্গলের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে কুমিল্লা শহরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা ময়নামতি সেনানিবাসের দিকে পালিয়ে যায়। এই সময়ে হাজার হাজার জনতা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের পেছনে অগ্রসর হয়। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে এই জেলা শহরটিই সর্বপ্রথম মুক্তিবাহিনী কর্তৃক শত্রুমুক্ত হয়। ১০ ডিসেম্বর নবম ইস্ট বেঙ্গল কুমিল্লা শহরের রেলক্রসিং থেকে ময়নামতি ছাউনির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই অগ্রাভিযানের সময় মিত্রবাহিনীর তিনটি ট্যাংক নবম ইস্ট বেঙ্গলকে সহায়তা করার জন্য ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনের কমান্ডের অধীনে দেওয়া হয়। রেলক্রসিং থেকে দেড় মাইল পশ্চিমে অগ্রসর হওয়ার পর নবম ইস্ট বেঙ্গলের অগ্রবর্তী দলগুলো টেক্সটাইল মিল এলাকার সামনে পাকিস্তানি সেনাদের গোলাগুলির সম্মুখীন হয়। নবম ইস্ট বেঙ্গলের আরেকটি কোম্পানি কোটবাড়ীর পথে ময়নামতির দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছিল। দলটি মিল এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের গোলাগুলির সম্মুখীন হলেও অগ্রবর্তী দলগুলো পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানগুলো দখল করার চেষ্টা করে। কিন্তু এক ঘণ্টা রেকি করার পর বোঝা যায়, পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানগুলো খুবই শক্তিশালী। অবস্থানগুলোতে মেশিনগান ও ১০৬ আরআর বাংকারের ভেতর



ছবি : সংগৃহীত

২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স কমান্ডার
লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ

রেখে কুমিল্লা-ময়নামতির রাস্তাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছে। এ সংবাদ আমাদের অগ্রবর্তী দলগুলো ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনকে অবগত করে। ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানগুলোর ওপর চাপ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়ে নিজে আরও সম্মুখবর্তী অবস্থানে এসে পাকিস্তানি সেনাদের সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করে। সংবাদ সংগ্রহের পর সম্পূর্ণ ব্যাটালিয়ন দিয়ে মিত্রবাহিনীর ট্যাংকের সহায়তার আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন ভোরে মিত্রবাহিনীর ট্যাংকগুলোকে সড়কের বাঁ দিক দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয় এবং নবম ইস্ট বেঙ্গলকে উত্তর দিক থেকে আক্রমণের পরামর্শ দেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী মিত্রবাহিনীর ট্যাংকগুলো রাস্তার দক্ষিণ দিক দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পাকিস্তানি সেনারা ট্যাংকগুলোর ওপর ১০৬ মি.মি. আরআর-এর সাহায্যে প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করে। মিত্রবাহিনীর একটি ট্যাংক পাকিস্তানি বাহিনীর গোলায় বিনষ্ট হয়। শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে অগ্রসর হওয়া উচিত

নয় ভেবে আইন উদ্দিন ট্যাংকগুলোকে নিজ নিজ অবস্থানে লুক্কায়িত অবস্থান থেকে পাকিস্তানি সেনাদের বাংকারগুলোর ওপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে, নবম ইস্ট বেঙ্গল তাদের আক্রমণ আরও জোরদার করে। এই সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সেনারা চরম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

১৫ ডিসেম্বর সকালে পাকিস্তানি সেনাদের সর্ববামে সাদা পতাকা উড়তে দেখা যায় এবং কিছুক্ষণ পর সেই জায়গা থেকে গোলাগুলিও বন্ধ হয়। ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন সাদা পতাকা দেখে আক্রমণ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয় এবং শত্রুসেনাদের উদ্দেশে আত্মসমর্পণের আদেশ দেয়। প্রায় আধঘণ্টা পর গোলাগুলি স্তিমিত হয়ে এলে উত্তর দিকের পুকুরপাড়ের উঁচু বাঁধের ওপর ২৫-৩০ জন পাকিস্তানি সেনাকে অস্ত্রসহ সাদা পতাকা হাতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে দেখা যায়। ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন তৎক্ষণাৎ সেসব পাকিস্তানি সেনাকে আরও সামনে আসতে নির্দেশ দেয়। পাকিস্তানি সেনারা নির্দেশমতো ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনের কাছে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে। এ সময় হাজার হাজার স্থানীয় জনসাধারণ পাকিস্তানি সেনাদের ঘেরাও করে বেঁধে ফেলে। বাকি পাকিস্তানি সেনারা, যারা তখনো বাঁধ থেকে সামনের দিকে আসছিল তারা ভয়ে সামনের দিকে না এসে পেছনের দিকে পালাতে থাকে। ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন পুনরায় আত্মসমর্পণের আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানি সেনারা নিজেদের বাংকারে আশ্রয় নেয়। আত্মসমর্পণের আদেশ না মানায় ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন নবম বেঙ্গলকে পুনরায় আক্রমণের নির্দেশ দেয়। প্রায় ৪০ ঘণ্টা আক্রমণের পর শত্রু-অবস্থানটি নবম ইস্ট বেঙ্গলের হস্তগত হয়। প্রায় ১৫০ জন পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করে। অবশিষ্ট সেনারা ময়মনামতি ছাউনিতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর ৩৯তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এই অবস্থান প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। অবস্থানটি শত্রুমুক্ত করার পর নবম ইস্ট বেঙ্গল ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হয়—ময়নামতি সেনানিবাসের উপকণ্ঠ পর্যন্ত শত্রুমুক্ত করে। নবম ইস্ট বেঙ্গল পাকিস্তানি সেনাদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহের সম্মুখীন হয়। পাকিস্তানি সেনারা ময়নামতি সেনানিবাসের উঁচু ভূমির সহায়তায় এই ঘাঁটিকে একটি দুর্গে পরিণত করেছিল। চারদিকে পরিখা খনন এবং বাংকার তৈরি করে প্রতিরক্ষাকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছিল।

নবম ইস্ট বেঙ্গল উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ময়নামতি এলাকা সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলে। কুমিল্লার হাজার হাজার গেরিলা নবম ইস্ট বেঙ্গলের

সঙ্গে যোগ দিয়ে পশ্চিম দিকে অবস্থান নিয়ে ময়নামতিকে ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ১৫ ডিসেম্বর বিকেলে অবরোধ সম্পন্ন হয়। এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের আদেশ দেওয়া হয়। পাকিস্তানি সেনারা সেই আদেশ প্রত্যাখ্যান করে তাদের প্রতিরক্ষার কাজে অটল থাকে। ময়নামতি ছাউনিতে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য নবম ইস্ট বেঙ্গল গেরিলা ও মিত্রবাহিনী প্রস্তুতি নেয়। ১৬ ডিসেম্বর ময়নামতি গ্যারিসন কমান্ডার আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করে সংবাদ পাঠায়। সেই দিনই বিকেল চারটায় ময়নামতি গ্যারিসনে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা অন্যান্য জায়গার মতো আনুষ্ঠানিকভাবে নবম ইস্ট বেঙ্গল এবং মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের পর সব পাকিস্তানি সেনাকে বিভিন্ন জায়গাতে নবম ইস্ট বেঙ্গলের তত্ত্বাবধানে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র বেঙ্গল লাইনে একত্র করা হয়। নবম ইস্ট বেঙ্গল আবার জয়ী হয়ে তাদের পুরোনো বেঙ্গল লাইনে ফিরে এসে বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ে। প্রসঙ্গত, নয় মাস আগে এখান থেকে যে চতুর্থ বেঙ্গলের সেনারা স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য দেশমাতৃকার প্রতি প্রাণের টানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলেরই অধিকাংশ সেনা ও নতুন রিক্রুট করা সেনাদের নিয়ে যুদ্ধকালের বিপর্যস্ত সময়ে নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ে উঠেছিল।

পরিশিষ্ট ১

২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স

২ নম্বর সেক্টর

ফরিদপুরের পূর্বাঞ্চল. ঢাকা শহরসহ ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ, কুমিল্লা জেলা (আখাউড়া-আশুগঞ্জ রেললাইনের উত্তরাংশ বাদে) এবং নোয়াখালী জেলা (মুহুরী নদীর পূর্বাঞ্চল বাদে) নিয়ে ২ নম্বর সেক্টর গঠিত। সেক্টরের সদর দপ্তর প্রথমে তেলিয়াপাড়া এবং পরে আগরতলার ২০ মাইল দক্ষিণে মেলাঘরে স্থাপন করা হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর (পরবর্তী সময়ে লে. কর্নেল) খালেদ মোশাররফ এবং অক্টোবর মাসে লে. কর্নেল খালেদ আহত হলে মেজর এ টি এম হায়দার। এই সেক্টরের অধীনে ৩৫ হাজারের মতো গেরিলা যুদ্ধ করেছেন।

এই সেক্টরের ছয়টি সাবসেক্টর ছিল। নিচে সাবসেক্টরের নাম, এলাকা ও কমান্ডারদের নাম দেওয়া হলো :

গঙ্গাসাগর	কসবা, আখাউড়া, মুরাদনগর, নবীনগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিয়ে গঠিত। কমান্ডার—ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন।
মন্দভাগ	মন্দভাগ রেলস্টেশন থেকে কুটি পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত। কমান্ডার—ক্যাপ্টেন আবদুল গাফফার হাওলাদার।
সালদানদী	সালদানদী, নয়নপুর ও বুড়িচং নিয়ে গঠিত। কমান্ডার—ক্যাপ্টেন (পরবর্তী সময়ে মেজর) আবদুস সালেক চৌধুরী।
মতিনগর	গোমতীর উত্তর বাঁধ থেকে কোম্পানীগঞ্জ পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত। কমান্ডার—লেফটেন্যান্ট দিদারুল আলম।
নির্ভয়পুর	কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর ও লাকসাম নিয়ে গঠিত। কমান্ডার—ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন, পরে লেফটেন্যান্ট মাহবুব।
রাজনগর	বিলোনিয়া, লাকসামের দক্ষিণ এলাকা এবং নোয়াখালী নিয়ে গঠিত। কমান্ডার—ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, পরে ক্যাপ্টেন শহীদ ও লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান।

কে ফোর্স

নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ব্রিগেড হিসেবে ১৪ অক্টোবর কে ফোর্স গঠিত হয়। ফোর্স সদর দপ্তর ছিল আগরতলায়। এই ফোর্সের কমান্ডার ছিলেন মেজর (পরবর্তী সময়ে লে. কর্নেল) খালেদ মোশাররফ, পরে মেজর আবদুস সালেক চৌধুরী। স্টাফ অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল মতিন ও লেফটেন্যান্ট আনোয়ারুল আলম। এর অধীন ইউনিটগুলো ছিল :

১. চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। অধিনায়ক : ক্যাপ্টেন আবদুল গাফফার হাওলাদার
২. নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। অধিনায়ক : ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ আইন উদ্দিন
৩. দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। অধিনায়ক : ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম
৪. প্রথম গোলন্দাজ ব্যাটারি (মুজিব ব্যাটারি)। অধিনায়ক : ক্যাপ্টেন আবদুল আজিজ পাশা

পরিশিষ্ট ২

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ

খালেদ মোশাররফ ১৯৩৭ সালের ১ নভেম্বর জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার মোশাররফগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মোশাররফ হোসেন ছিলেন পাট ব্যবসায়ী, তাঁর মায়ের নাম জমিলা আখতার। খালেদ মোশাররফ ইসলামপুর হাইস্কুল ও ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৯৫৩ সালে কক্সবাজার হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৫৫ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আইএ পাস করে পাকিস্তানের (তখন পশ্চিম পাকিস্তান) কাকুল মিলিটারি একাডেমিতে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে কমিশন লাভের পর তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে চাকরি করেন।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে খালেদ মোশাররফ চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্ট ছিলেন। যুদ্ধের পরপরই তিনি কাকুল মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষক পদে যোগ দেন। তিনি ১৯৬৮ সালে কোয়েটার কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ থেকে পিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। এ সময়ে তাঁর পদবি ছিল মেজর। অতঃপর তিনি ঢাকায় ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর নিযুক্ত হন। খালেদ মোশাররফ পশ্চিম জার্মান ও ইংল্যান্ড থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি খালেদ মোশাররফ বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ শেষে ফেরত আসেন এবং ২২ মার্চ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক হিসেবে যোগ দেন। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ঢাকা ও চট্টগ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণ ও গণহত্যার সংবাদ পেয়ে ২৬ মার্চ রাতে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাঁর বাহিনীকে সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

যুদ্ধের শুরু থেকে খালেদ মোশাররফ ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন। অক্টোবর মাসে 'কে' ফোর্স গঠিত হলে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তিনি এটিরও দায়িত্ব নেন। ২৩ অক্টোবর মাথায় আঘাত পেয়ে গুরুতরভাবে আহত হন এবং লক্ষ্ণৌ

সামরিক হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর আরোগ্য লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বীরোচিত অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তিনি 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত হন।

স্বাধীনতার পর খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে স্টাফ অফিসার নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ নিযুক্ত হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার পর সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে খালেদ মোশাররফ ৩ নভেম্বর একটি রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। এরপর তিনি সেনাপ্রধান নিযুক্ত ও মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। তবে তখন এ ব্যাপারে সরকারি কোনো প্রজ্ঞাপন জারি হয়নি। তবে ৭ নভেম্বর অপর একটি পাল্টা অভ্যুত্থানে তিনি কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ টি এম হায়দাসহ নিহত হন।

তিনি ছিলেন তিন কন্যাসন্তানের জনক। স্ত্রীর নাম সালমা খালেদ।

পরিশিষ্ট ৩

দলিলপত্র

মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে মেজর খালেদকে পাঠানো গোয়েন্দা প্রতিবেদন

TOP SECRET Copy No. 2 of Two Copies

No. 0002/G
HQ Bangladesh Forces
Field
C/O Govt of Peoples' Republic
of Bangladesh
MUJIBNAGAR 31 July 71

Maj KHALID MOSHARRAF, E Bengal,
Comd No. 2 Sector

Subject: Extract - Intelligence from Inside

1. A very careful examination of intelligence coming from different sources show:-

a. Top quislings remain to be dealt with.

b. There is need for more planned and really effective ops (ie producing the desired result rather than a bang or noise).

2. In addition the following extracts relevant to your Sector are reproduced:-

"Mr ZAHIRUDDIN is doing his best to combine with the enemy and form a quisling Govt for which he has also persuaded Mr FAZLUL HAQ MNA to join him. ZAHIRUDDIN is actively working and trying to get gain support of BENGALI MNAs/MPAs. KHAWAJA KHOIRUDDIN and GHULAM AZAD stay in the Cantt when not in WEST PAKISTAN.

The NARAYANGANJ Dockyard is producing Gun Boats for Pakistan Army at the rate of 3 Gun Boats daily. There was an attack by MUKTI BAHINI early this month, but with insignificant result causing noise only.

DACCA Airport has been fortified with A A weapons and bunkers have been constructed in GULSHAN Town also. Power Supply Station at PUBAIL which was slightly damaged by MUKTI BAHINI has been repaired. The Teachers Training College at New Market is the biggest Army camp in DACCA City. Small outposts are scattered over the City. Plain clothes (long shirter) WEST PAKISTANI soldiers, RAZAKARS etc constitute a significant percentage of City pedestrain. They do intelligence work and trace out members of MUKTI BAHINI and Awami League workers and others from city and harass pedestrains and Bus passenger etc. In DACCA Cantt captured women have been kept in 2/3 houses for immoral purpose. Young boys in the concentration camp have been reduced to passive agents of homo-sexual army personnel. Bengalis in the City of DACCA desire large scale and well planned MUKTI BAHINI offensive to kill WEST PAKISTANI marauders and destroy army installations.

Resistance group with very young non Bengali boys are being given short training in fire arms by the enemy in DACCA University Sports Ground, Mill Barrack and Peelkhana.

Contd 2/-

TOP SECRET

TOP SECRET

২ :

TOHA has gained prominence in some parts of NOAKHALI District. His force has established complete control over rural administration in 9 villages under CHAGALNAYA Thana. His supporters killed a few Jotdars (Awami League) who had helped MUKTI BAHINI.

A lot of fire arms left behind by the E BENGAL REGT at JOYDEBPUR were reportedly collected by local people who passed them on to some extremist elements who pursuaded them to do so."

3. Please show the NOAKHALI portion of the report to Mr NURUL HAQUE MNA and convey the DACCA portion to those concerned and take the contents of the intelligence into account for future ops.

C-in-C Commander-in-Chief

TOP SECRET

২ নম্বর সেক্টর থেকে ডেলটা সেক্টর (ভারতীয়) এবং মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে প্রেরিত সংকেতবার্তা

MESSAGE FORM

D T G

০৪ ১১ ৩৮ ৪

FROM : HQ NO 2 SECTOR

TO CONTROL ROOM (D SECTOR) SECRET

INFO : HQ BANGLA DESH FORCES G-0010

---

situation report (.) ONE (.) BELUNIA SUB SECTOR (.) ALFA (.) 14 repeated 14 rajakers killed and many injured on 6 aug 71 in area SONAGAZI police station square 5619 map sheet 79 N/5 (.) BRAVO (.) mine laid by own troops between FULGAZI and MUNSHIRHAT (FENI - BELUNIA road) as a result 1 repeated 1 civil bus completely blown up CMM 1 repeated 1 chairman of enemy santi committee CMM 3 repeated 3 rajakers and 7 repeated 7 enemy workers killed (.) CHARLIE (.) 1repeated 1 jeep blown up and 4 repeated 4 enemy soldiers killed (1 expected to be an officer) by mine laying between railway station MUNSHIRHAT and BANDUA Square 6044 map sheet 79 M/8 (.) DELTA (.) 8 repeated 8 rajakers arrested with mines by own patrol party in area FULGAZI square 6055 map sheet 79 M/8 (.) ECHO (.) in an ambush in area SUBSHBAZAR 3 repeated 3 rajakers and 1 repeated 1 Punjabi soldiers killed and 2 repeated 2 Chinese rifles captured (.) TWO (.) MOTINAGAR SUB SECTOR (.) ALFA (.) about 20 repeated 20 pak soldiers and 7 repeated 7 rajakers were killed due to mortar action on 4 Aug 71 in area RAJAPUR square 2807 map sheet 79 M/2 (.) BRAVO (.) pak army ran away from village ANNANTOPUR square 2730 map sheet 79 M/2 on 4 aug 71 due to mortar action (.) CHARLIE (.) 3 repeated 3 enemy personnel killed near broken railway bridge in area HORI ... AL square 2812 map sheet 79 M/2 when Mukti Bahini opened fire on them (.) DELTA (.) 2 repeated 2 pak soldie... killed in village SREEMONTOPUR square 3203 map sheet 79 M/2 when attacked by own patrol party(.) ECHO (.) in an ambush in area BRAHMANPARA square 2311 map sheet 79 M/2 15 repeated 15 enemy soldiers and 10 repeated 10 rajakers killed on ... 71 (.) this ambush conducted by students JAHANGI... R (.) FOXTROT (.) 15 repeated 15 rajakers killed ... area MURICHANG police station on 6 aug 71 with the help of the local public

---

MAJOR

কর্নেল ওসমানীকে প্রেরিত মেজর খালেদের পত্র

CONFIDENTIAL

Major Khaled Musharrof, psc.
HQ No. 2 Sector
Bangladesh Forces
No. BD/0022/G
August 1971

Colonel M A G Osmany, awc., psc.
Commander-in-Chief
Bangladesh Forces

ear Chief

Since our last meeting, the over all situation in my Sector and around has had few significant developments which understand should be brought to your kind notice. I may take theopportunity to put on record the effect of the brave activities by the boys of Bangladesh Liberation Forces in my Sector.

a. The communication line, both rail road running from Comilla to Chittagong (upto Feni) been totally disrupted, the communication between and Chittagong is being harassed and disrupted as we find necessary and according to our convenience.

b. Activities has been stretched much inside Bangladesh all along the Sector, It is reported the Pak regime has started a general evacuation from Comilla to Chandina.

Bases much inside the distri zones the Sector has been set up and new bases are in the process of being exploited and formed continuously.

d. Power carrying pylons and transformers in different Sub stations in Dacca have been destroyed such an extent as to reduce the power supply by 75% the need for power in Dacca is very less because the closure of Mills and little population that are there the effect is not yet fully apparent and felt.

Enemy morale is deteriorating very fast.

Re-organization of the 'Mukti Bahini' has been carried out to meet the present and future demand of our war efforts, specialists are being trained by our own effort in the Sector in co-ordination with the supporting army.

g. Boys have been trained to take over the charge of the 3.7 inch mountain guns and 10 August has been fixed as the inauguration date. I have named it as 'Mujib Battery', being the first Artillery Battery in the Bangladesh Army. I have provided already two Officers and the battery will be fully operational on the 10th August 71 manned by our crews and Officers.

Cont - P/2

CONFIDENTIAL

It may be seen that no stone is left unturned so to bring my Sector 100 percent efficien so that the war effort according to the plan can be carried out keeping the high tradition set up by their past performances.

I may take this opportunity to point out that as the activities in the Sector to the south of mine (Chittagong) is plagued by inactivity and bad handling of the war effort in the past, the burden on my Sector has been too much. Unless this Sector is activated the situation may go to the advantage of the enemy and we may find it hard to keep the balance.

It has been reported that in that Sector (Chittagong) besides general in efficiency in the past, corruption by the troops and illtreatment towards local tribal population had also been rampant. All these has brought an effect on the general morale of the 'Mukti Bahini' and the local population. In this general mess, the extremists have also dug in their position. Unless it is checked right now the situation may prove very difficult in future. Internal dissentions has also crept in because of the bad handling in the past.

Captain Rafique who is a very sincere and brave Officer is finding it hard to tackle. Some time in the past you wanted to know wheather it would be possible on my part to take over Chittagong as well. As I had been busy in getting my Sector on the grip, I reluctantly declined in that circumstances. Now I may very humbly put forward to your gracious self that Chittagong may also be brought within my zone for operatio [illegible] to sort the things out. It will also enable chalk out a comprehensive plan for effective interdiction of enemy from Chittagong to Comilla.

Due to the famine condition and inflation of money prevailing in Bangladesh, guerilla warfare operation inside Bangladesh is very expensive. Unless operation money is given regularly and as per your policy, it will be quite difficult to conduct the aforesai operations effectively. I may here mention that the supporting agency over here, has not got any specific instruction.

The supply of arms still remains inadequate. The scale of arms to be provided to guerillas as laid down by you is not adhered to by the supporting agency. As a result, guerillas are still being armed with only two sten per 10. I am afraid to say that it is frightfully inadequate for the boys to start the effective operation inside. It is suggested that the supporting [illegible] ies must be persuaded to implement your policy of scale [illegible] laid down for the guerilla.

Cont - P/3

I was also shown a organization prepared by the supporting agency where only 37 LMGs are authorised to battalion, whereas the organisation prepared by you authorises 72 LMGs. I have already pointed out to them, but it seems that matter has been decided by the higher authorities of supporting units as such you may please take up at your end.

The families of 'Mukti Bahini' and the 'F[illegible] Fighters' those who have attained Shahadat or have been incapacitated due to enemy action are facing untold miseries as the Government of the Peoples' Republic of Bangladesh has not yet granted any gratuity etc to them. To boost up the morale of the liberation army and at the same time to save the unfortunate families from total ruinations, I think some monetary assistance must be given to the bereaved families immediately. It is also suggested that some fund may please be placed at the disposal of Sector Commander, that adhoc relief can be given till the case is decided on merit.

The Police personnels who crossed over to India are not properly utilized and the SP appointed by the Peoples' Republic of Bangladesh seems to be quite inactive and indifferent about the fruitful use of the Police. May I have the honour to suggest that these Police forces, with proper co-ordination/consultation with the Government of India may be posted in different entry points in the border belt to check the suspected persons comin in/going out of India in collaboration with the Sector Commander [illegible] and Indian Police.

I have received a posting order iss[illegible] Banglad[illegible] Forces vide 1121/A of 31 July 71 [illegible] 4 Off[illegible] from my Sector. You are well aware that following [illegible] are posted out/being posted out of my Sector recently

a.	Major Shafaat Jamil	3 E Bengal
b.	Major Mohd Amin	8 E Bengal
c.	Capt Amin Ahmed Chowdhury	Mymensingh Sector
d.	Capt Mahboobur Rahman Chy	1 E
e.	Capt Shahid Ullah Bhuiyan	H, Bangladesh
f.	Capt Akbar Hussain	3 E Bengal
g.	Capt Mujibur Rahman	Being posted to Brigade HQ which is ordered vide BDF No. 1121/A of 31 July 71.

h. Capt Abdus Salek Chowdhury, as per your instruction is being ~~sent to [illegible]~~ posted out as Sector Com

Cont P/4

Moreover, I have raised the first Artillery Battery (The Mujib Battery) out of my own resources and provided both men and two Officers out of this Sector. As a result, I am left with bare minm Officers without which there will be total dis-organization in the Sector specially when I am operating in four vital districts and main Line of Communications. You would be kind to appreciate that if any more Officers are posted out of my humble compliments, I would be constrained to say that this Sector would bound to be in effective which is of no ones desire. It may be also recalled that you have promised during my last visit that no more Officer will be posted out from my Sector.

In your last DO, you mentioned that [illegible] ating in Dacca are not really effective. Now after hearing [illegible] BBC and other foreign radios about our activities in and around Dacca, you must be convinced that we are not only producing bang but we are really effective. Any way, open fighting in the heart of Dacca by our boys deserves appreciation from your side which definitely will boost up the morale.

Our boys have been also closing in with enemy and fighting hand to hand battles in different encounter and producing wonderful result which also calls for your appreciation. Recently some of the actions were under taken to clear enemy positions and to test the battles worthiness of regular boys who have proved real "Tigers" by fighting over the dead bodies of the enemy and flushing out the barbarous enemy from the bunkers.

Different agencies/organisations are sending boys inside Bangladesh without any co-ordination/consultation which have already created lot of confusion and misunderstanding and has given chance to the enemy to run wedge between us. It is requested that launching of troops inside Bangladesh must be done after co-ordination with the Sector Commanders to avert any mishap.

I am confident that you would give your [illegible] l attention to the problems that I have posed in my DO at your convenience to enhance the war efforts and redress my difficulties

Eagerly looking forward to see you amongst us soon. May God walk with you. "JOY BANGLA".

With kindest regards

SECRET

OPS IMMEDIATE

HQ No. 2 Sector
Bangla Desh Forces
BD/0002/G
September 71
৩

To: Control Room

Info: Echelon HQ.
Bangla Desh Forces

Subject: Special Situation Report

Guerilla Operation in Baddyer Bazar, Dacca

On night of 13 August 71 two army vehicles were destroyed by mines explosion laid by own guerillas near Sonargaon gate between Baiddyer Bazar and C & B road. In this action 11 Pak soldiers and 3 Razakers were killed.

Own guerillas eliminated one prominent active Pak collaborator named Zainal Kazi of Jampur Union Council. The action took place at 1900 hours on 09 August 71.

One Mannan Mollah, an active collaborator and faithful friend of Pak ~~army~~ army from Baiddyer Bazar union has been killed by our guerillas.

Following arms have been recovered from some anti Bangla Desh climents of the locality :-

(1) One Pistol and one short gun from Mannan Talukder on 11 August 71.

(2) One short gun from Habibur Rahman of Perab, PO. Baliapara on 11 August 71.

(3) One double barrel gun from Eunus Bhuiyan of Alamdi Baradi thana on 14 August 71.

(4) One short gun from Hafez Sarker of Kamargaon on 15 August 71.

(5) One short gun from Nur Hussain of Manomondi on 14 August 71.

Guerilla Operation in Gazaria PS, Dacca

a. On Night of 31 August 71, our guerillas destroyed one 60 feet long culvert bridge near Batter Char. As a result road communication was cut off. Durin this action the guerillas opened fire on the ~~guar~~ guards and killed 7 Razakers and one Punjabi soldiers. The freedom fighters captured one 303 rifle from the enemy.

b. On 01 September 71 at night the freedom fighters destroyed two 60 feet long bridges on Dacca - Daudkandi road. One is near Barunia and the other is near Bhaber Char.

On 02 September 71 ~~in~~ at 0900 hours in the morning the guerillas attacked one enemy post of Gazaria PS. The guerillas killed 3 EPCAF (Eas Pakistan Civil Armed Forces) men, two Pak collaborators and captured one EPCAP man. They have also captured 5 (Five) 303 rifles with 150 round ammunition. Later 11 Razakers ~~x~~ have surrendered to our guerillas with 10 rifles and 200 rounds ammunition.

SECRET

Cont - P/2

d. Our guerillas raided one ferry near Batter Char Bridge that on 02 September 71 at night. The ferry was completely destroyed and 4 battery sets were recovered from the ferry boat.

Guerilla Operation in Dacca proper and Surrounding

On 23 July 71 at 1030 hours one improvised grenade was thrown at the inside of the campus of Intermediate Girls' College while Intermediate Examination was being commenced. One Razakor was killed and two College bearer ~~xxx~~ were injured due to this action.

On 30 July 71 at about 0800 hours while one double decker of town service bus was approaching towards Sher-e-Bangla's grave yard. One wheel of the bus was completely destroyed due to M-14 mine blast laid by the guerillas.

Some where at the end of July, two Artillery Captain and one Major were killed in a planned house when they came for rapping the women.

d. On 25 August 71, our guerillas ~~killed~~ attacked on the West Pakistani Polices at Road No. 18, Dhanmondi from a running car and killed 9 of them on the spot.

On 25 August 71, 5 guerillas went for action in a Car on road near Dhanmondi. They were closed by an army Jeep. The guerillas fired on the Jeep and killed the driver and the Jeep ~~xxxx~~ went out of control which dashed on the side wall and smashed. 2 Occupation army personnel were killed and the rest of the Jeep were injured.

f. On 28 August 71 our guerilla unit in village Daina PS. Tejgaon, Dacca suddenly attacked 3 Pak collaborators who were helping the occupation army supplying Girls and Boys and killed both the three. The collaborators are Kadir Mia, Karim Mia and Gechu Mia of Daina.

g. On 29 August 71 the guerillas partially damaged the Saidabad bridge, Dacca by putting explosives which caused linderance for traffic movement. On same night the guerillas attacked one of the Pak army unit post and fought for one hour there. Later the guerillas had to withdraw due to shortage of 7.62 ammunition. 9 Pak army soldiers were killed due to this action.

h. On 24 August 71 at 2300 hours our guerillas killed one notorious docait Abul Hashem by name who was indulged in looting, rapping and supplying girls to occupation troops. This notorious docait was from village Pachimgaon, PS. Rupganj, Dacca.

j. On 16 August 71, one Jute which was carrying 200 maunds of Jute to LATIF BAWANI Jute Mill was completely destroyed by burning.

Cont - P/3

On 30 August 71 at about 2230 hours when an that Pakistani soldier was raping a 16 years old girl The soldier was killed by charging bayonet while he was in process.

1. On 30 August 71 in the midnight, 4 guerillas attacked a Razakar post. The Razakars of the post fled with fear leaving the only 303 rifle which was collected by our guerillas.

On 18 August 71, the guerillas burned a boat with 500 maunds Jute by using phosporus 80 bomb near Baraid.

On 15 August 71 one Advocate Faizar Rahman of village Mochar, PS. Fatulla, who was an active Pak collaborator has been killed by our guerillas.

The freedom fighters (guerillas) drowned a Jute flat "KANCHAN" of 5000 Bales capacity at GMC Ghat, near Godnail, Narayangonj on the river Sitalakhya.

One of our guerilla who was a worker of R.C.M. Jute Mills, Dacca has thrown a Phosporus 80 grenade in the lose stock of R.C.M. Godown. The quantity of jute was about one lakh maunds reported by the labourers. The jute was set fire. 7 fire brigade vehicles tried about 3/4 hours to control the fire but failed. The Jute was completely burnt into ashes.

On 02 September 71 at 1600 hours the guerillas ambushed one patrol party at Saidpur G.M.C. Ferry. One officer and 3 sepoys were killed during this action. The body of the officer was carried by the officer. One G-3 rifle was captured from the enemy during this action.

<u>Guerilla Operation in Araihazar PS.</u>

On 30 August 71 one guerilla unit raided Araihazar Police Station square RL 73 and killed the Officer-in-Charge of the PS. The guerillas captured one pistol from the PS.

On 02 September 71 one of our guerilla unit destroyed a boat which was carrying cotton thread for Pak collaborators. The loss caused during the action was about Rs. 2,00,000.00 (Rupees two lacs).

5. <u>Guerilla Operation in Shibpur PS</u>

a. One spy, 9 miscreants and 13 Razakars have been killed at Shibpur.

b. On 10 August 71, Shibpur thana was raided and the thana office was burnt into ashes. Revenue collection office was also attacked on the same day and records and documents were burnt totally. Following arms and ammunitions from Shibpur thana were recovered:-

(1) 3 Rifles 303

(2) 5 Shot guns

(3) Bullets 303 - 40

Cont - P/4

an important bridge on Norsingdi - Shibpur road at Putia was broken. Pak Bahini attacked Putia where Mukti Bahini Belongs to Shibpur made an ambush. Fight continued for 4 hours and Pak Bahini retreated like a defeated dogs leaving behind 33 dead bodies including one Captain Saleem from Punjab Regiment. Star badges of Captain Saleem has been captured. Two 303 rifles and 77 ammunitions were captured.

6. Guerilla operation in Narsingdi, Dacca

5 Dalals and 25 dacoits and two spys and four cheaters were eliminated by our guerillas.

Phosporus bombs were thrown into jute godowns and two godowns were burnt into ashes.

Grenades were thrown in various mills disturbing free running of mills.

d. Mortar bombing was carried out at Pak Jute Mills at Ghorashal Square RL65 where Pak troops made a small camps inside the mill area.

One 11 August 71 Pak troops attacked own guerilla unit Headquarters at Narsingdi. Two training wing situated in two sides of the Headquarters opened fire on the enemy. The enemy jumped into water and escaped some how.

f. On 13 August 71 at 1430 hours 5 guerillas raided Pak troops camp at Jinardi square RL 74 in between Ghorashal square R-74 map sheet 79 I railway stations. Heavy fighting continued for about 2 hours and a half. 10 out of the 17 enemy soldiers were arrested while the rest 7 ran away towards to Ghorashal. Jinardi railway station was blocked, telephoning system broken by firing on the sets, paper, tickets and documents were burnt totally into ashes. Following arms, ammunitions, uniforms and food stuff were captured from the camp after arresting the enemy :-

(1)	LMG	-	1 (One)
(2)	Rifles	-	11
(3)	LMG Magzine Box	-	1
(4)	Ammunition 303	-	4 Boxes (Sealed)
(5)	Loose ammunitions	-	500 rounds approximately
(6)	HE-36 grenade	-	11
(7)	Ammunition sten	-	100 rounds
(8)	Steel helmets	-	11
(9)	Belt Waist	-	14
(10)	Long boots	-	26 Pairs
(11)	Side bags (Khaki)	-	14
(12)	Ammunition poses	-	14
(13)	Rice	-	17 Bags
(14)	Atta	-	3 Bags
(15)	Dalda ghee	-	2 tins
(16)	Sugar	-	2 bags
(17)	Peice masalla	-	1 tin
(18)	Milk tinned	-	11 Patties
(19)	Bedding (Blankets, Chaddar, Pillow etc)	-	26
(20)	Khaki Phants/Shirts	-	27 Pairs
(21)	Nets Mosquitoes	-	14
(22)	Plain clothes		Plenty

Cont - P/5

[illegible] personnel [illegible] E.P.R. then [illegible] the shoulder badges of E.P.C.A.F. The personnel have not been killed and they are now working with own guerilla unit. Later they were [illegible] in another fight [illegible] they worked faithfully [illegible] Punjabi Regiment soldier who was there. One [illegible] wounded during the fight was seen on the next day lying dead very close to the previous camp at Jinardi.

On [illegible] August 71 our guerilla unit at Narsingdi attacked the Pak troops in a village adjacent to Jinardi station while they were [illegible] in looting the public houses by [illegible] fire. Fight went on for about 3 hours while Pak troops withdrew from the village leaving two dead bodies and having several injuries. The defeated army retreated towards Narsingdi while own guerillas ran after them making a sense like rats and cats.

h. On 15 August 71 [illegible] Pak troops was attacked at Panchdona while they were [illegible] a very important bridge on Narsingdi and Tarabo road. Fight went on for an hour then Pak troops [illegible] hands a symbol of surrendering like children making a sound "Bacho, Bacho". During this time 4 trucks full of Pak troops with heavy weapons came down [illegible] started shelling and own guerillas had to retreat. 5 dead bodies were seen lifted in the trucks.

j. [illegible] August 71 [illegible] unit Headquarters at Narsingdi was attacked by Pak troops (50 in numbers). Enemy troops opened fire from a distance of about one mile from the Headquarters village. A training camp opened fire at enemy as a response. Enemy continued fire while the training camp stopped after a while. Reminder of the team kept silence. After a silence for about half an hour, Pak troops withdrew and did not [illegible] to advance and cross the water bay.

k. On night of 20/21 August 71 at 0100 hours Narsingdi guerilla unit explosive party carried out operation on Titas gas line near Narsingdi. Operation was very successful. Flames of fire was seen from a distance of 10 miles and the sound was heared from a distance of 5 miles. Pak troops camps at Narsingdi and Ghorashal and Panchdona were in terror. They left all arms, jumped into water as according to them Indian Air Force had started bombing. The result of this operation was felt while all the mills situated on the north of Ghorashal failed electric supply and remained closed for several days. Gas supply was stopped at [illegible]/the next day. Later the gas line was rectified by [illegible] the pipes.

l. On the night of 22 August 71 Explosive party of Narsingdi Guerilla unit carried out a mine operation on railway line on a moving train between Jinardi and Narsingdi. The train having only two boggies could not be affected by the mine blast though the railway tracks were up rooted soon after the train had passed.

Cont - P/6

Guerilla Operation in [illegible] PS area, Dacca

a. Our [illegible] guerilla [illegible] carried out [illegible] operations in that they killed [illegible], 5 miscreants and one spy.

b. An operation was carried out on 12 August by explosive on Electric supplying [illegible] poles. Three pillars were completely blown up giving a total stoppage to the supply.

Guerilla Operation in Comilla Area

On 27 July 71 our guerillas destroyed two electric pylons near village [illegible] square RM 01 of Muradnagar Police Station.

Telephone lines [illegible] were displaced by [illegible] telephone poles [illegible] guerillas [illegible] Kamollar square [illegible] 02 under Muradnagar PS.

One Shahid Mian, [illegible] Muslim leaguer and a collaborator who was helping [illegible] occupation army was eliminated by our guerillas on [illegible] 71 at [illegible] village square RM 01.

One Tham Mian, [illegible] of village Kandor has been killed by guerillas on 30 August 71. He was collecting money materials from the public in [illegible] gun points and exploiting the Mukti Bahini.

Road communication from Brahmanpara square RM 21 - [illegible] was cut off [illegible] guerillas by placing explosives.

f. Mokbul Mian, organiser [illegible] Razakars and a prominent member of Muslim League of village Wahidpur square 1112 map sheet 79 I/5 under Debidwar PS has been eliminated by Guerillas.

Two Muslim leaguers [illegible] faithful friends of Pak enemy named Jonab Ali and [illegible] Ali afrom village Balakia of Burichong PS have been killed by our guerillas.

On 08 August 71 our guerillas killed one Tena Mian, a leader of Razakar in the village Nabipur under PS Debidwar.

9. Rajnagar Sub Sector

Own troops killed 10 Pak troops by laying an ambush at Durgapur village square 4473 in between Dacca-Chittagong road and Chowddagram PS on 13 Sep 71.

b. Own mortar platoon fired on Durgapur bridge by the side of Dacca - Chittagong road. Approximately 50 enemy soldiers were killed and 10 injured . One 3" mortar of the enemy was completely destroyed by our 3" mortar fire on [illegible] enemy defence position.

On 12 September 71 an ambush was laid at Durgapur square 5664 map sheet 79 M/5 in Chowddagram PS by own troops. 7 enemy soldiers were killed and 2 injured during this action. Enemy reacted with 81 MM Mortar fire on own troops. Own troops suffered no casualty.

Cont P/7

Kridhoypur Sub sector

On 27 August 71, 45 Mukti Fouj and 6 Freedom Fighters raided the Razaker post at Lalukhal RJ 96 under Hajiganj PS. They have killed 71 Razakers and injured ... them.

Own patrol party at Kalinara under Hajiganj PS killed one Razaker and 10 Dalals and looters on 28 August 71.

One member of peace Committee and 3 looters and Dalals were killed by our Mukti Bahini at Hashnabad under Lakham PS on 26 August 71.

Own troops about ... strength raided the enemy position at ... under Lakham Police station on 29 August 71. 36 Pak troops and 37 Razakers were killed during this action. Own troops suffered no casualty.

11. Motinagar Sub Sector

a. section Mukti Fouj attacked the enemy position at J... square 34... at 0900 hours on 12 August 71. 2 enemy soldiers were killed during this operation.

b. ... 1000 hours again the Mukti Fouj attacked the enemy position at Kotechwar square 347985 and killed ... enemy soldiers.

Own troops ambushed the enemy at Lohaipur square 329048 on 12 August 71 at 0900 hours. 2 Pak troops were reported killed during this ambush. Own troops have got no casualty.

Commander
(Muhammad Abdul Matin)

SECRET

OPS IMMEDIATE
HQ 2 Sector
Bangladesh Forces
BD/0002/G
11 Oct 71

Control Room

Info: Echelon HQ,
Bangladesh Forces

Subj: Situation Report

1. Guerilla Operation in Brahmanbaria PS

a. On 23 Aug 71, at about 2130 hours at village Biddakut under Brahmanbaria PS, a face to face fight was fought between our guerilla group of Biddakut and Pak soldiers over there. Due to heavy attack by own guerillas the Pak soldiers had tosuffer casualty of 75 Pak soldiers and 53 Rajakers dead and many injured. Among themxxx one Captain and one wireless operator were killed. Four of their large boats were capsized. The enemies fled away leaving behind two boats from where the guerillas recovered 3 rifles 303.

b. On 29 Aug 71, the same group lobbed two grenades in the Headmaster's house of Annoda High School. In the same night at Brahmanbaria jail road, own guerillas opened fire on Rajakers and killed 5 of them. Again the same group eliminated two members of peace committed one convenor Habibur Rahman and another Serajul Islam Haji.

c. On 11 Jul 71, mines were placed in area Goshairhat and Manikhali railway station on the rail line. Due to the explosion of mines, one engine alongwith one carriage was derailed. The Second Officer of Kuliarchar PS alongwith 7 constables were killed.

d. On 20 Jul 71, own guerillas raided the Revenue Office of Saiskuti Union Council under PS Kuliarchar and all the office documents were burnt into ashes.

e. On 29 Sep 71, about 150 Pak soldiers went to Faridpur Union underPS. Kuliarchar. On receipt of this information own guerillas rushed to the place and attacked them violently, due to which 1 Pak soldier and 3 Rajakers killed and 7 Pak soldiers and 17 Rajakers injured severely. No casualty in our side.

2. Konabon Sub Sector

Own troops about a platoon strength raided the enemy bunkers at Paniarup square 2525 map sheet 79 M/2 at 1000 hours on 10 Oct 71. As a result 8 enemy soldiers were killed on the spot and 6 injured seriously. One of our Sepoy Montazuddin who has been injured by enemy small arms fire has been sent to Zeroin Hospital for treatment.

Comd
(Anwar-Ul-Alam)

SECRET

ঢাকায় গেরিলা অভিযান সম্পর্কে বিশেষ প্রতিবেদন

SECRET

HQ No.2 Sector
Bangladesh Forces
BDF/400/2/G
05 Nov'71

Control Room
(D Sector)

Info: Sch HQ BDF

HQ 'K'Forces

Subj: Special Situation Report

1. Commando Operations in Dacca District

a. On 18 Sep 71 2 collaborators namely Kafil Uddin and Ayet Ali of Batpara who were actively conniving with the so called Pak army and performing duties of spy have been killed by our own Guerrillas.

b. On 19 Sep 71 one Rifle .303 has been recovered from a dacoit in Araihazar PS.

c. On 28 Sep 71 two Rajakers surrendered themselves to our Guerrillas, with their arms.

d. Civil employees of differrent Tehsil offices of PS Narshindi, Araihazar , Baiddor Bazar and Shibpur have been instructed not to attend their offices. Some of the tehsil offices are now inactive.

e. On 28 Sep 71 one Pak soldiers from Gorasal area was arrested by one ofour Guerrilla. Another Pak soldier who was also sitting by his companion ran off to the Pak camp and gave information of his companion's arrest. 10 soldiers advanced towards our Guerrillas and retreated like Gentlemen while fire was opend at them. From the statement of the arrested man it has come to light that Punjabies are in panic. They have been instructed by their higher authorities that they are to leave this country but before that they should follow destructive policy. Later death penalty was given to the man.

f. On 23 Sep 71, 4 Rajakers were arrested from Araihazar soon after they came out of Pak camp at Araihazar and later killed.

g. On 24 Sep 71 3 Rajakors while engaged in marketing were shot dead.

h. On 7 Sep71 Mr Alauddin Ex Chairman of Tumulia under PS Rupgonj was arrested and killed. He admitted in his statement that he alone got 17 men enrolled in Rajakers and arrested 4 boys belonging to Mukti Bahini.

j. On 10 Sep 71 Telephone Exchange was burnt by use of explosive entire base of the exchange was successfully damaged at Madhabdi.

On 11 Sep 71 One Bengali spy named Abdur Rashid at Bhatpara who was a paid servant of Panjabies was arrested and killed. This operation was carried after 3rd warning given to him.

l. Entire tower at Anandi near Baburhat was grounded by use of Explosives. Operation was fully successful.

m. Culvert at Baghata has been partly damaged by use of Anti tank mine.

n. One spy named Abdul Latif was arrested and later killed.

o. One Mr. Siddiqur Rahman Bhuiyan of village Shekerchar, PS Narsingdi, the convenor of peace committee was killed by our Guerrilla, on 12 Sep 71.

p. On 13 Sep 71, house of one Razakar was burnt into ashes for an exemplary punishment for misconduct against the Bangladesh Government.

q. On 13 Sep 71 a successful mine operation was carried out near Pubail Railway station. 35 so called Pak soldiers were found dead. The engine with 3 compartments was badly damaged. The entire batch was found injured and the patients were evacuated to hospital.

On 13 Sep 71 a dacoit named Askar Ali of Bandakhola who had a close coordination with the so called Pak Bahini was killed by one of the guerrilla.

On 26 Sep 71, a phosphorous bomb was thrown in a Jute godown of United Jute Mills. Fire was not very much effective. Fire was under control after continuance for 4 hours. Later two more bombs were thrown but without any result. It has later been examined and ascertained that some chemical material has been sprayed on the Jute Mills due to which fire does catch neither by use of phosphoerous bomb nor by normal fire.

t. 36 hand grenades were thrown inside United Jute Mills and it is at full stop at present.

u. On 27 Sep 71 one Razakar was arrested and killed.

v. On 28 Sep 71 one spy who comes from Patna was arrested from Gherashal PS Kaligonj and later killed by us.

w. On 28 Sep 71 one cheater named Mr. Tajuddin who was collecting money in the name of Mukti Bahini was arrested and publicly killed as an exemplary punishment.

x. On 29 Sep 71, a very successful mine operation was carried out between Pubail and Arikhola Railway stations. A troops carrying train was over thrown by mine explosion. 12 to 15 so called Pak soldiers were found dead and rest were injured.

y. On 31 Sep 71, 36 hand greanade was thrown in a banker of Razakars at Araihazar as a result of which one was killed.

On 01 Oct 71, one Raza Bazar was arrested and later killed.

aa. On 02 Oct 71, two electric pool [illegible] Gorasal and Narsingdi damaged by expl[illegible]

ab. On 05 Oct 71 a bridge between Jadhabdi and Panchdona PS Narsinghdi on Taraabo and Narsinghdi road has been damaged. Bus service has been fully suspended.

ac. On 06 Sep 71 our guerrilla attacked on so called Pak army at Panchdona at 0200 hours in the morning. Fight continued for 4 hours and a half while support of mortar guns and 20 LMGs were given to attacked soldiers from Narsingdi. Re-enforcement of so called Pak soldiers

SECRET

dd. was withdrawn at about 1030. An 'U' shape attack was launched on Pak fouz at 1200 hrs the same day. Fight went on till 1800 hrs although Panjabees had again a strong support of Mortor and LMG at 1630 hrs Our Guerrillas got closed to the bunkers and had ~~x~~ thrown 36 HE grenade and ~~impxxixxtx~~ improvised Grenades and thus bankers were broken. This was the biggest fight given against Panjabees. A hue and cry was heard in the Bunkers from a distance of 50 feet. following was the casualties :-

(1)	Own force	Attained Shahadat	=	2
		Serious Injury	=	1
		Minor Injury	=	8
(2)	Enemy troops	Killed	=	30 to 40.
		Serioys injury		20
		Minor injury		10

Following arms and ammo were expended

(1)	303 Ball	24900 rds
(2)	SLR 7.62	20000
(3)	9 MM Sten	18000
(4)	7.62 Chinese	9000
(5)	3" Mor	100
(6)	2" Mor	150
(7)	HE 36 Grenade	150
(8)	Phos 70	50
(9)	Explosive	370
(10)	A/Tk Mine	10
(11)	A/P	12

2. Training - ~~Rxkxixxaax~~ Own Guerrilla

a. Some of the training camp in various villages in interior of [illegible]arsingdi ha[illegible] been closed and new camps have been opemed within south Naraingdi. In all 32 training camps are on [illegible] swing. Total two thousands men have been trained in [illegible]

3. Morale [illegible]

a. Many men belonging to vario[illegible] groups who really got training in India for Libera[illegible] ight have joined my force leaving their groups. 20 men of this nature so far been joined me. New trained boys are very much eager to go for fight. Locally trained Guerrillas areas not ready to sit idle and they are kept busy in operations. After a [illegible] day [illegible]ght these Gurrillas were sent in three groups to Ghor[illegible]al, Jhinardi and Norshingdi, for ~~xxxjxxxxxxxxxxxx~~ Pak troops killing operations. The Guerrilla are found very

SECRET

- 4 -

any other command and therefore, they have not been excluded from this HQs team and rest are still under the command of sub unit commander Imam Uddin. They are functioning Guerrilla sub unit Narsingdi as previously.

Comd
(A T M Hyder)

SECRET

SECRET

OPS IMMEDIATE

HQ K Force
Bangladesh Forces
BD/0002/G/
5 Nov 71

To: D Sector

Info: Echelon HQ,
Bangladesh Forces

Subj: Situation Report

1. 4 E Bengal (Konabon)

a. Own troops about a platoon strength laid an ambush at Kaimpur GR-270215 at 0600 hours on 01 Nov 71. At 0830 hours they brought fire on the enemy troops when they were moving by own ambush site. Enemy became surprised due to own sudden firing. They became afraid and some of them started running. But they had to give 9 dead and many injured. The enemy then took position and opened fire. Exchange of fire continued for about 10 minutes. Own troops withdrew from the position at 0900 hours safely. Own casualty was Nil.

b. At 0730 hours on 02 Nov 71 own one platoon raided on the enemy bunker at Chaura GR-270231. They opened fire on the enemy bunker. 1 militia was reported to be killed due to this action. Own casualty was Nil.

At 0930 hours on 02 Nov 71 own troops ambushed the enemy when about a platoon of enemy consisting of Pak troops, militia and razakars were coming towards their position by the ambush site. Enemy was scattered due to fire from own side and suffered heavy casualty. 2 Pak soldiers, 1 militia, 5 razakars were killed and 5 razakars were injured in this action. The dead bodies were lying on the spot. Own casualty was Nil.

d. Ammunitions expended in the above actions :-

(1) 7.62 SLR - 5000 rounds

(2) 9 mm ball 4000 ,,

2. 10 E Bengal (Rajnagar)

Ammunition expended on 03 Nov 71:-

a.	.303 Ball -	10,000	rounds
b.	7.62 SLR -	9,000	,,
c.	2" mortar bomb -	50	,,
d.	81 mm mortar bomb	40	,,
	3" mortar bomb -	20	

PSO
(Anwar-Ul-Alam)

SECRET

শালদা নদী দখলের পর প্রধান সেনাপতির অভিনন্দনবার্তা

IN LIEU OF MSG FORM

OPS IMMEDIATE   DTG: 151400

FROM: EASTCOM GS(X)   SECRET

TO: DELTA SECTOR   A-1015

INFO: ALPHA BRAVO CHARLIE ECHO ECHO ONE FOXTROT JULLIET SECTORS OPS BRANCH (BY HAND)

From C-in-C Bangladesh Forces for Capt GAFFAR Comd 4 E BENGAL to be repeated to Comd 'K' 'S' 'Z' Forces all Bns E BENGAL cum Bangladesh Sector Comds COS Bangladesh (.) quote (.) One (.) heartiest congratulations on excellent performance Tiger your bn in capturing area SALDANADI NORTH and retaining liberated position repulsing enemy counter attack inflicting heavy cas on 30 PUNJAB at the cost of only 1(1) killed and 7(7) wounded to yourself (.) well done keep it up(.) convey above to all ranks and fwd recommendations for gallantry awards by special courier (.) two (.) this is NOT your only gallant and skilful leadership attaining brilliant success against odds(.) in recognition your consistantly distinguished leadership in battle beating enemy every time despite determined enemy bids with air support Govt of the Peoples Republic of Bangladesh approves immediate Gallantry Award High Order to you(.) three (.) Comd 'K' Force only(.) congratulations (.) fwd citation on printed forms as per our 1015A of 30(30) July 71 for this immediate award/also for others deserving recognition(.) four (.) for all Bangladesh Comds and Bns E BENGAL (.) looking fwd to similar good news of your victory over enemy (.) gallantry award recommendations awaited from all except Z force cum 3 and 4 sectors (.) expedite despatch xx by special courier (.) unquote(.) Jackpot sectors only(.) confirm delivery to all addressees

---

1015A of 15 Nov 71   Commander -in- Chief

কে ফোর্সের হাতে ধরা পড়া যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে প্রতিবেদন

SECRET

HQ 'Z' Force
BD/0114/34/Estb
27 Nov 71

To: HQ 'D' Sector

Info: Rea HQ, BDF

Internal
Dister : GS Branch

Subject: Captured/Surrendered Personnel

Your ltr No 2102/D/GS(INT) of 17 Nov 71 refers.

Required info is submitted as under :-

S.No.	No	Name and Father's Name	Age	Permanent address in Bangladesh	Present address	Remarks
1.	EJO-41682	N/Sub Noushad Ali Sardar s/o Late Md Hazrat Ali Sardar	38 Yrs	Vill: Hashompur P.O. Joampur P.S. Mohadevpur Sub Div: Naogoan Dist: RAJSHAHI	HQ 'Z' Force	They have been interrogated by Indian authority on 21 Nov 71 but final clearance in their respect are still awaited.
2.	6569436	Nk Ain Uddin s/o Mohd Tayeb Uddin Khan	32 Yrs	Vill: Nayekpur P.O. Rajtola P.S. Modan Sub Div: Natrokona Dist: MYMENSINGH		
3.	3939156	Sep Md Wali Ullah s/o Mohd Kadar Ali	23 Yrs	Vill: Kailine P.O. -do- P.S. Chandina Sub Div: Sadar Dist: COMILLA		

Major
Principal Staff Officer
(Abdus Malek Chowdhury)

TOP SECRET

IMMEDIATE

No. 0001 G
HQ Bangladesh Forces
Field

C/O Govt of the Peoples'
Republic of Bangladesh
Mujibnagar
28 Nov 71

To: Comd 'K' Force
Bangladesh Forces

Copy to: Chief of Staff,
Bangladesh Forces

Supporting Forces Comd HQ through LO

" Delta One Sector

Subject:- " Regrouping of 'K' Forces "

Reference :- HQ 'K' Force No. BD/001/xx/G
of 21 Nov 71.

1. There appears to be some confusion which should be removed by the following clarification on points sought.

Position of 'K' Force and its orbat

a. 'K' Force is a Bangladesh Formation and its orbat includes -

HQ 'K' Force
No. 1 (Mujib) Battery
Sig Coy
4 E BENGAL
9 E BENGAL
10 E BENGAL

b. Reference to para 5 m of my Operational Directive No. 1/71, in post, will show that a Bangladesh formation has to be kept together in the bdy of an Indian Formation under whose command it may be placed (entire 'K' Force under 23 Mtn Div).

c. Bns/Units of Supporting forces may be grouped with 'K' Force to strengthen it to effectively meet tasks allotted it.

Contd ... 2/-

TOP SECRET

3. Position of 2 Sector

Under Op Directive No. 1/71, No. 2 Sector will under command of IV Corps for operations and logistics (as its boundary, which can NOT be changed without serious dislocation of operational arrangements inside, extends beyond any one of the currently split supporting sectors Delta and Delta One).

Staff Posted to HQ 'K' Force

HQ and DAA and QMG, on temporary attachment from HQ, are posted to HQ 'K' Force under my No. 1121 A of 05 Nov 71 and NOT to Sector HQ and as such function as BM and D/Q of 'K' Force and NOT of any supporting forces formation or sector.

Acting arrangements for command of 'K' Force in the absence of Lt Col [illegible]

Please refer [illegible] Bangladesh [illegible] of 23 Nov 71.

Ref para 1 of [illegible] of 21 Nov 71

'K' Force [illegible] supporting forces from - it is a Bangladesh Formation - and 9 [illegible] is definetely a unit of 'K' Force as would be clear from the preceding paras. Major A. [illegible] CHOWDHURY will continue to be with HQ 'K' Force (more so because other 'K' Force staff are new to Bangladesh Forces).

7. Ack.

[illegible]-in-C

TOP SECRET

ঢাকা জেলায় কমান্ডো অভিযানের বিবরণ

SECRET

OPS IMMEDIATE
HQ No.2 Sector
Bangladesh Forces
BDF/400/2/ /G

To: Control Room
(D Sedtor)

Info: Ech HQ BDF

Subj: Commando operations in Dacca District

1. On 09 Nov 71 at 0900 hrs FF Md Jamto Miah who is also a labour of M Akkas Ltd (Jute Mill) in Narayangonj went into the mill with two 77 white phosphorous pencil (in cases), tied to his thiegh. He threw these pencils (undetected) on a stack of 4000 pucca bales of Jute and left the mill. Soon afterwards a fire broke out in the Mill. As a result 4000 pucca bales of jute and 4 godown of loose jute were destroyed.

2. On 10 Nov 71 at 1030 hrs FF A Hashem received an information that 5 Rajakers, who were looting and torturing the local people were resting in a house in Sehchar, about ½ a mile from Fatullah railway station. He immediately collected a group of 6 FF (Mohd Ali, Nurul Hoque, Faiz Ahmed, Masroor Ali, A Hashem and Amir Ali) and went to that house. They found all of them in a room, disarmed them tied their hands, behind folded them and took them in a lonely place about 700 yards towards Fatullah station, bayonetted them to death. M No causalty of FF. No ammo used.

3. On 11 Nov 71 at 0730 hrs, 5 FF on a tip from local people went to Dhakeswari mill (31 miles north from Narayangonj) and captured one Rajaker Md Chand Mia of village Godnail and shoot him to death. Chamdmia was a notorious Rajaker, a great collaborator of Pak Fouj, in torturing and looting the people. He was a living terror to the inhabitants there. His death has brought peace in the locality. [illegible] FF concerned are A Bari Bhuiyan, Z. Bhuiyan, Tota Miah, Soudagar Ali and Zoinal Abedin. 3 bullets of SMG were used in theis attempt. Tota Miah was wounded slightly by the third spot as he was too smart to move forward before clearance was given.

4. On 14 Nov 71 at 2300 hrs 5 FFs went stealthily into the a floating Doug (PRS) on Sitalaxma about 2 miles North East of Narayangonj. They found 9 Darwans, disarmed them by a surprise attack and tied them. 4 FF then went into the pump Machanic room, placed the explosives at different points of the machine and also on pump heads. Then they all left the premices leaving behind the darwans tied. They were about 150 yds when the explosion took place. The damage caused by this explosion estimated at 150 lakhs of rupees (as published in the news papers), by Pak sources.

5. On 19 Nov 71 at 1300 hrs FF Abdul Quadir and Aziz Dewan went into Azimuddin Dalal's New Jute Mill office, 1½ mile south of Narayangonj on Sitalaxma. [illegible] There was a break of time, as such they could place Potassium Megnate and Glicerine (fire setter) on top of a stack of Jute bales. They left the mill unnoticed. Soon the fire broke out burning of 500 pucca bales of Jute and 50 mds of raw jute.

6. On 19 Nov 71 at 2100 hrs FF A Rob, Aziz Dewan and Aftab Uddin Dewan went to Pilkuni, ½ a mile East from Fatullah station raided a house (on a tip) and arrested 4 Rajakers on their way back to FFs office at Fatullah they came across another Rajaker, who was also arrested and taken to FF hideout at Fatullah. On receipt of this report [illegible] 3 Rajakers of Pangoan (2 miles from Fatullah) in PS Keranigonj attacked our FF at about 2230 hrs. FFs overcome them in short fight. Then all the eight arrested Rajakers were moved to a place (near a ditch) about 600 yards from Fatullah station. All of them were then bayonetted to death thrown into the ditch. Arm captured are inside Bangladesh. There was no casualty on our side. A small quantities of ammo were expended.

UNCLASS.

-2-

7. On 19 Nov 71 at 0900 hrs 8 FF in Command of Md Sirajul Islam laid an ambush near bridge beside Burma Eastern 'Petrol pump', 3½ miles away from Narayangonj and Narayangonj Adamjee rd. A truck containing some Bengali culprits with Pak force came and stopped at the bridge. As the enemy brought down the pers (Bengali) and were all set to kill them. FFs opended fire at Pak forces. Firing continued for some time from both the sides, resulting 3 enemy pers were killed and many wounded. One FF was attained ''SHAHADAT'' named Fazal Hoque who was buried later on by with due honour and villagers help. enemy fordes used Sten Gun and 303 rifle and were assisted by LMG firing from the xx top of Burma Eastern. FF used Sten, SLR and LMG. Ammunitions consumed on our side was reasonable.

8. 25 Nov 71 at 0800 hrs, FFs (13 nos) raided Star Parile Board Mills, situated East of Adamjee, just on the otherside of the river Sitalaxma, Overcome the darkness and tied them. They xxxxxx sprayed petrol (carried with FF) and set the mill on fire. FF captured 10 Guns with 150 cartridges and brought 2 Type Writer machines and 2 telephone receiver with them. Goods and Arms captured are inside Bangladesh. FF did not use any ammo.

9. 27 Nov 71 at xx 2030 hrs 7 of our FF mined (time) a Military car near Dhakeshwari bus stand, 3 miles from Narayangonj on way to Adamjee. The car was slightly damaged. The enemy forces continued moving away slowly on the damaged car. FFs waiting in ambush opend fire. Enemy forces replied the fire. FF swiftly took control of the situation. But enemy force was reinforced heavily d FF had to run why as their Ammunitions exhausted. There was no casualty on our side. 5 enemy soldiers were Killed and 3 severally wounded.

10. Thursday Nov 30 1971 at 0930 hrs xxx FF \ Kadir with 3 others went to Cooperative Jute office, 1½ miles nort of Narayango j on the river Sitalaxma, entered into the mill, identifyin themselves by Mill labours, placed Potusiam Magnate and Glyserine pencil and left the place undetected. A fire broke ut burning about 15000 maunds of Jute. There were also heavy loss of office records.

Lt Col
Comd
(A T Hyder)

SECRET

OPS IMMEDIATE
HQ No.2 Sector
Bangladesh Forces
BDF/400/2/ 50 /G
07 Dec'71

To: Control Room
(D Sector)

Info: Ech HQ BDF

Subj: Commando Operations in Noakhali District

1. On 28 Oct 71 Havildar Momtaj Miah with few others attacked a group of Rajakers, guarding Afania bridge near Bazra in between Chaumohoni and Sonaimuri in Noakhali district and wounded 5 Rajakers. Our casuelty was Nil.

2. On 28 Oct 71 Hav Jakir Hussain with four others ambushed an enemy group advancing from Meher to Nagarhat, at Nagar Bazar near Hajigonj, Comilla. 3 Pak soldiers were killed and 6 were wounded.

3. On 30 Oct 71 Hav Ruhul Amin raided a group of Rajakers proceeding to their duties. 3 Rajakers were wounded. Three civilians got injured by the Rajaker's fire.

4. On 01 Nov 71 Sub Lutfor Rahman laid an ambush at route leading to Chandragonj, Bozra, Kalikapur, Gajaria and Nadana against advancing enemy forces. There were sharp exchage of fire at Gazaria, Somapur and Anushapara. 17 enemy soldiers were killed and many of them were wounded. Enemy forces used havily weapons like 3" Mors, 83 MM BL, 35 RL. There was no casualty on our side. Hav Kazi Sahabuddin showed extraordinary boldness in one of these encounters. Our troops used light weapons and cousumption of ammunition were reasonable.

5. On 07 Nov 71our FF set a mine at Bogadia and a defence party waiting in ambush. A State Bus carrying Pak Forces and Rajakers run over the mine at 0930 hrs and was severally damaged. Waiting FFs attacked the enemy forces. The exchange of fire started. Enemy Forces, awaiting to meet FF attack, brought another organised Coy from Laksam. The fight continued from 0930 hrs to 1500 hrs. The enemy forces used long range weapons, still they were forced to go back. One enemy officer, two soldiers and nineteen Rajakers were wounded. There was no casualty on our side. A large quantity of ammo were expended during this operation.

6. On 07 Nov'71, FF mined a Public truck, only about a quarter miles from Chandragonj. The truck was carrying wheat for enemy forces from Chaumohoni. Back portion of the truck was destroyed.

7. On 12 Nov 71 Hav Zakir Hussain with another 6 FF a group of Pak force and Rajakers at Kazirkhail about a mile from Ramgonj. The enemy were on their way to burn the houses at Kazir khail. One Rajaker was killed. Enemy forces buried the dead Rajaker at Kazirkhali at the place of occurrence.

8. On 15 Nov 71 in the very early morning at Kalikapur, near Bogadia our FF and Sub Lutfur Rahman ambushed a group of enemy soldiers, who were on their way to Kalikapur Bazar with equipments to burn the Bazar and the houses of Awami League workers. Hav Abdul Awal, Hav Noor Mohammad and Nk Seraj Mian fought a courageous fight and killed 17 enemy soldiers and wounded 25. We had very few minor injuries. Our consumption of ammunitions is reasonable. There was no heavy weapons with us.

9. On 16 Nov 71 at late night Hav Momtaz and his sec raided the house of Rustam contractor, village Chanpalli, near Chandragonj and cought & killed.

To Sheet..../2-

SECRET

10. On 17 Nov 71 in the way at Hazirpara, Lakshmipur ~~KRx~~ Hav Lutfur Rahman with a few other FFs mined a baby taxi carrying two Rajakers. The baby taxi was destroyed and the two Rajakers died on the spot. Our FF left the spot before th arrival and firing of Pak Fouj.

11. On 18 Nov 71 late evening at Kadimpur near Chandragonj, 4 FFs of Hav Lutfur Rahman's sec mined a Baby Taxi carrying three Rajakers and two civilians. The Baby Taxi topsy torthed and damaged beyond repair. 2 Rajakers and a civilian died on the spot and the remaining two were injured.

12. On 20 Nov 71 at 1500 hrs, ~~RRx~~ N/Sub Ishaque with his sec ~~xx~~ ambushed, a group of Rajakers, who were on their way support the enemy Force, at Badar (near Ramgonj), FF made a three front attack, killed one Rajaker and three wounded. FF burid on the spot, the body of the dead Rajakers. Our FF h to use minimum of ammo enemy ~~xxx~~ force left the spot in desperation.

13. On 25 Nov 71 late night Hav Abdul Matin in co operation with the Commander of Rajakers ambushed a group of enemy soldiers and Rajakers at Mirgonj and Kapilatoti, (near Ramgonj). In the ambush 27 Rajakers, 30 Pak police and 17 of E Bengal ~~Rxgx~~ Regima surrendred themselves along with their arms. 30 Pak Police and 17 E Bengal Regimant have been distributed among our platoon in Noakhali, Advice on 27 Rajakers who are inside Bangladesh, are their way to our FF and Hav Lutfur Rahman.

Major
Comd
(A T M Hyder)

F/-

SECRET

HQ No. 2 Sector
Bangladesh Forces
BBF/400/2/ / /G

Control Room
(D Sector)

To. Soh HQ

Subj: **Sisuation Report**

Commando Activities in Comilla District

a. On 25 Nov 71 at 1130 hrs MF Commander xxx and his section raided Mur dna Thana an to Rajakers with 500 roun ammunition rifles. At 1230 hrs the nly the MF set house of notorious and member, a helper Rajakor Hafiz Khmed s/o Dhaki Amin & of Muradnagar was arrested. Bangladesh Flag was hoisted over the xxxxxxxx Muradnagar PS at 1325 hrs on 26 Nov 71. In this ops own casualty was Nil. Rajakers and arms/ammo captured are inside Bangladesh.

Four Rajakers have been arrested between 22 Nov 71 to 27 Nov 71 in Muradnagar PS. The place and date of xxxx rrest are shown against each name:-

(1)

(2) age Harikanda-arrested at his house on 23 Nov 71.

(3) Bachu Miah s/o Mofizuddin village Karia arrested on 25 Nov 71.

(4) zid Sofi - Arres apur ML worker. way hom 27 Nov

xxx. xxxxxxxxxxxxxxx

12 Rajakers/and Police pers.x.c. as stated against their names. surrendered to our MF at Mur from 14 Oct 71 to 27 Nov 71. All are ho Muradnagar expect otherwise stated:-

(1) Amir Hussain - Rajaker
(2) A Qashem - "
(3) Habibur Rahman - "
(4) Abdur Rezzaque - "
(5) Abdur Rouf Miah Mujahid
(6) Md Chand Miah Rajakor surrendered w arms.
(7) Police arms.
(8) Abdur Rashid
(9) Harunur Rashid
(10) A Qashem
(11) Abul Kalam Rajak

The Rajakers and Police pers arrested/surrende inside Bangladesh.

On 25 Nov 71 xxxxxxxxxxxxxx 16 nos of charged Grenades upon a Launch at Ahmadpur, 2 iles north of Daudkandi. The launch caught fire resulting death of 15 enemy soldiers, 10 Rajakers jumped into water. They were captured and arrested. They are now under custody of MF inside Bangladesh. Consumption of very large in this ops. There was no casualty n ou id except our xxxx Hav Giasuddin was wounded.

Comd
(A T M Hyd)

SECRET

বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে

অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ, সাহস ও বীরত্ব, কঠোর একমাত্র অবলম্বন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী জানে যে মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে জনগণেরই যুদ্ধ। জনগণের প্রতিটি অংশ, প্রত্যেক ব্যক্তি এতে জড়িত। মুক্তিবাহিনীর চরিত্র অনুযায়ী প্রত্যেক বাঙালী অংশ নিবেন—কেউ প্রত্যক্ষ, কেউ পরোক্ষ। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নাই। তবে কেউই অক্ষম নয়, প্রত্যেকের নিজস্ব ভূমিকা আছে এই যুদ্ধে, এবং সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে। কেউ যেন যুদ্ধের অংশভাগ থেকে বাদ না থাকে। কেউ যেন না ভাবে যে হাতিয়ার ছাড়া বা সামরিক ট্রেনিং ছাড়া এই যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়।

আমরা জানি, সব বাঙালীই এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। এই যুদ্ধে অনেকভাবেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই নির্দেশাবলী দিলাম তবে ব্যক্তিগতভাবে সেই সব বাঙালীর নিজ এলাকার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ভাবে সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন স্বাধীনতার এই যুদ্ধে।

মুক্তিযোদ্ধা ও আপনি ঃ

- ★ যে যেখানে আছেন সেই এলাকার গেরিলা ইউনিট বা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
- ★ মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা, খাওয়া, লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিন।
- ★ বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে দিন।
- ★ মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন খবর (কোথায় আছে, কাদের সাথে কি সম্পর্ক, কখন আসে ইত্যাদি) যেন শত্রুদের হাতে না যায়।
- ★ শত্রুদের খবর এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিন।
- ★ সম্ভব হলে, শত্রুদের ক্যাম্প নির্দেশ দিন, কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবরাখবর এনে দিন।
- ★ দালাল এবং বিশ্বাসঘাতকদের খতম করুন।
- ★ যোগাযোগের ব্যবস্থাদি ধ্বংস করতে গোপনে কাজ চালান।
- ★ শত্রুর সাথে কারবার করবেন না।
- ★ সকল ক্ষেত্রে শত্রুদের সাথে অসহযোগিতা করুন।

এই সংগ্রামের তিনটি দিক আছে ঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বিপ্লবী। এই তিন ফ্রন্টেই আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

আমরা যদি ওদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ বন্ধ করে দেই, এবং ওদের বাজার নষ্ট করে দেই, তবে হানাদারদের প্রয়োজনীয়তা ওদের জন্য শেষ হয়ে যাবে, আর বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে। তাই—

- ★ ওদের জিনিসপত্র কিনবেন না
- ★ ওদের কোন জিনিস ব্যবহার করবেন না
- ★ কর খাজনা দেবেন না

ওদের অর্থনীতি যেন কোন মতেই বৃদ্ধি না হয়। আমাদের পাট, চা ইত্যাদি বা অন্যান্য উৎপাদিত জিনিস যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে সেগুলি যেন শত্রুদের হাতে না যায়। ওরা বৈদেশিক মুদ্রা পেলে অটল হয়ে যুদ্ধ চালাতে পারবে এবং আরও অস্ত্রশস্ত্র কিনে আমাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। তাই—

- ★ কলকারখানা বন্ধ করে দিন, অচল করে দিন।
- ★ পাট এবং চায়ের মিল-গোডাউনে আগুন দিন।
- ★ উৎপাদিত জিনিস রপ্তানী করা অসম্ভব করে দিন।
- ★ যে সব বড় বড় শিল্পগুলি হতে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব সেইগুলি নষ্ট করে দিন। (কিন্তু যেসব ছোট-খাট কুটিরশিল্প বা যেগুলি আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন করে সেগুলির ক্ষতি করবেন না।)
- ★ যাদের ঘরে প্রয়োজনের অধিক জিনিসপত্র, খাদ্যশস্য ইত্যাদি আছে সেগুলি, যাদের কিছুই নেই তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিন। হানাদার পাক-সেনাদের অত্যাচারে অনেকেই আজ সব কিছু হারিয়েছে। আপনাদের চারিদিকে যারা দুর্গত অবস্থায় আছে তাদের ব্যবস্থা করে দেবেন, যারা অসুস্থ তাদের সেবা করুন, যারা আশ্রয়হীন তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন। এইসব ব্যক্তি বিশেষের বিপদে সাহায্য মুক্তিযুদ্ধে বিরাট অবদান হিসাবে ধরা হবে।
- ★ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লুকিয়ে রেখে, জমিয়ে রেখে, দাম বাড়িয়ে, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করবেন না।

মিলিটারী ঃ

শত্রুদের যাতায়াত ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করে দিন। যানবাহন কেটে দিন।

- ★ যারা গাড়ী চালান (বিশেষ করে যেগুলি শত্রুসেনারা তাদের কাজে ব্যবহার করতে পারে) সেগুলি সহজেই নষ্ট করে দিতে পারেন। (পেট্রোলে চিনি ঢেলে দিন, চাকা ছিদ্র করে দিন, ইঞ্জিন বিকল করে দিন।)
- ★ যারা স্টিমার বা লঞ্চ চালান তারা এইসব ডুবিয়ে দিতে পারেন।
- ★ পুলগুলি কেটে ফেলুন।
- ★ নৌকাগুলো ডুবিয়ে এবং লুকিয়ে রেখে দিন যেন শত্রুরা না পেতে পারে।
- ★ যারা বিদ্যুৎ, ব্যাংক, টেলিফোন, টেলিগ্রাফে কাজ করেন, তারা সহজেই প্রয়োজনীয় জিনিস নষ্ট করে দিয়ে সবকিছু অকেজো করে দিতে পারেন।

এইভাবে ওদের চলাচল ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে, এক অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলে, ওরা কোণঠাসা হয়ে যাবে; বিশেষ করে অঞ্চলগুলি আমাদের আয়ত্বে চলে আসবে, ওদের শক্তি বৃদ্ধির পথ, খাদ্যসামগ্রীর পথ, অস্ত্র ও সৈন্যের চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। শত্রুদের যাতায়াত ব্যাহত হলে ওরা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে অত্যাচার করতে পারবে না। ওরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এইসব সুযোগের মধ্যে ওদের খতম করতে পারলে, বিতাড়িত করতে পারলে, ওদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে, এবং আমরা আরও সুসংগঠিত হয়ে ওদের আরও ক্ষতি করতে পারব।

অতএব, টাকা পয়সা নিজের স্বার্থ, অন্যায় লোভ বিসর্জন দিয়ে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করুন। নিজেদের উপর, মুক্তিযোদ্ধাদের উপর বিশ্বাস রাখুন। যার যা আছে, লাঠি, বল্লম, সুড়কি, দা, বন্দুক, তাই নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ুন এই যুদ্ধে। অনেক অনেক দুঃখ এই পথ ধরেছি, আরও অনেক সইতে হবে। আরও কঠোর পরিশ্রম আমাদের করতে হবে। কিন্তু লোভ নয়, ভয় নয়, দুর্বলতা নয়, বিভ্রান্তি নয়, হতাশা নয়—এগিয়ে আসুন, শত্রুদের উপর আঘাত করুন, বাংলাদেশ স্বাধীন করুন।

—লেঃ কর্ণেল খালেদ মোশাররফ

মানচিত্র

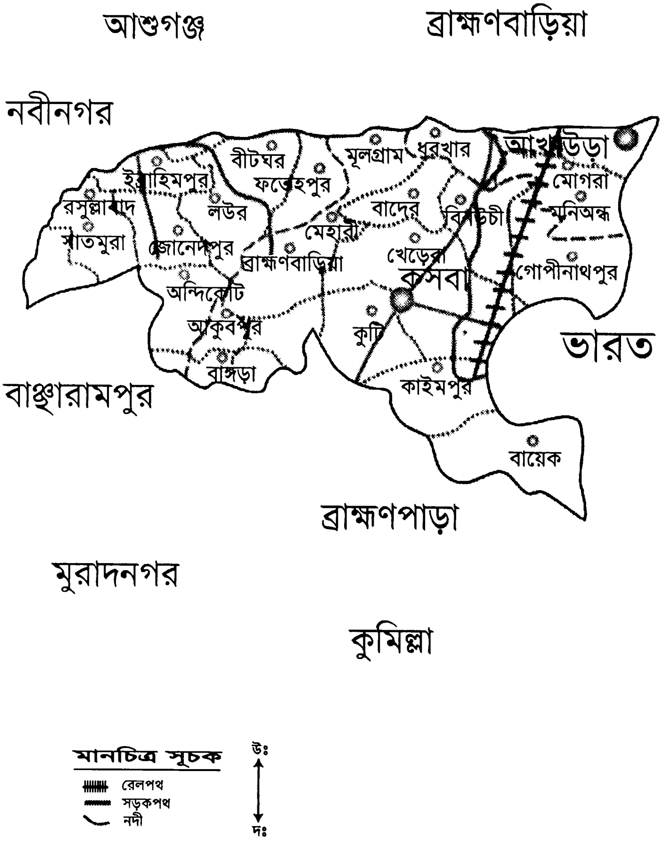
২ নম্বর সেক্টর



গঙ্গাসাগর
সাবসেক্টর



মন্দভাগ
সাবসেক্টর



সালদা নদী
সাবসেক্টর



মতিনগর
সাবসেক্টর



নির্ভয়পুর
সাবসেক্টর



রাজনগর
সাবসেক্টর



২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

স্বাধীনতাযুদ্ধে মোট ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বসূচক খেতাব পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে নিচের মুক্তিযোদ্ধারা ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের সদস্য ছিলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ

১. সিপাহি মোস্তফা কামাল

বীর উত্তম

১. লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ
২. মেজর এ টি এম হায়দার
৩. ক্যাপ্টেন আবদুস সালেক চৌধুরী
৪. ক্যাপ্টেন এম এ গাফফার হাওলাদার
৫. ক্যাপ্টেন মেহবুবুর রহমান
৬. নায়েব সুবেদার শহীদ বেলায়েত হোসেন
৭. সিপাহি শহীদ সাফিল মিয়া

বীর বিক্রম

১. ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম
২. ক্যাপ্টেন ইমাম-উজ-জামান
৩. লেফটেন্যান্ট শহীদ খন্দকার আজিজুল ইসলাম
৪. সুবেদার আবদুল ওহাব
৫. নায়েব সুবেদার শহীদ ইয়ার আহমেদ
৬. নায়েব সুবেদার শহীদ নূর আহমেদ গাজী
৭. নায়েক আবদুর রব চৌধুরী
৮. সিপাহি আবদুল আজিজ
৯. সিপাহি আবদুল হক
১০. সিপাহি রজমান আলী
১১. মুজাহিদ আবদুল খালেক
১২. মুজাহিদ সিরাজুল হক
১৩. আনসার এলাহী বক্স পাটোয়ারী
১৪. গণবাহিনী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া)
১৫. গণবাহিনী আবুল কাশেম ভূঁইয়া
১৬. গণবাহিনী আবদুল সালাম
১৭. সেনা ক্যাডেট কামরুল হক (স্বপন)
১৮. সেনা ক্যাডেট কাজী কামাল উদ্দিন
১৯. গণবাহিনী শাফী ইমাম রুমী
২০. গণবাহিনী আবদুল হালিম চৌধুরী (জুয়েল)
২১. গণবাহিনী বদিউল আলম (বদি)
২২. গণবাহিনী মোহাম্মদ আবু বকর

বীর প্রতীক

১. মেজর এম আইন উদ্দিন
২. মেজর আকবর হোসেন
৩. ক্যাপ্টেন শহীদুল ইসলাম
৪. ক্যাপ্টেন ডা. আকতার আহমেদ
৫. ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম
৬. লেফটেন্যান্ট এম হারুন-অর-রশিদ
৭. লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবির চৌধুরী

৮. লেফটেন্যান্ট মমতাজ হাসান
৯. লেফটেন্যান্ট জামিল উদ্দিন আহসান
১০. লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর ওসমান
১১. সুবেদার আবুল হাসেম
১২. নায়েব সুবেদার মনির আহমেদ খান
১৩. হাবিলদার গিয়াস উদ্দিন আহাম্মদ
১৪. সিপাহি আবদুল কাদের
১৫. সিপাহি আবদুল বাসেত
১৬. সিপাহি কাজী মোরশেদুল আলম
১৭. সিপাহি আবদুল কুদ্দুস
১৮. সিপাহি আবু মুসলিম
১৯. সিপাহি রফিকুল ইসলাম
২০. সিপাহি মোহাম্মদ ইসহাক
২১. সিপাহি বাদশা মিঞা
২২. মুজাহিদ মোশাররফ হোসেন বাঙাল
২৩. মুজাহিদ জুলফু মিয়া
২৪. মুজাহিদ আবদুল কুদ্দুস গাজী
২৫. মুজাহিদ সিরাজুল ইসলাম
২৬. মুজাহিদ বাচ্চু মিয়া
২৭. সিপাহি আবু সালেক
২৮. এফএফ গিয়াস উদ্দিন
২৯. এফএফ গাজী গোলাম দস্তগীর
৩০. এফএফ মুনসুরুল আলম দুলাল
৩১. এফএফ বজলুল মাহমুদ
৩২. এফএফ জয়নুল আবেদিন খান
৩৩. এফএফ আলী আহম্মেদ জিয়াউদ্দিন
৩৪. এফএফ শহীদ জাকির হোসেন
৩৫. এফএফ শেখ আবদুল মান্নান
৩৬. এফএফ হাবিবুল আলম
৩৭. এফএফ এ এম মোহাম্মদ ইসহাক
৩৮. এফএফ ডব্লিউ এ এস ওয়াডারল্যান্ড
৩৯. এফএফ মোহাম্মদ এ আজিজ
৪০. এফএফ শহীদ খায়রুল জাহান
৪১. এফএফ শহীদ মোহাম্মদ সেলিম
৪২. এফএফ শহীদ আব্দুল্লাহিল বাকী
৪৩. এফএফ মোজ্জাম্মেল হক
৪৪. এফএফ মো. নোয়াব মিয়া
৪৫. এফএফ শহীদ রেজাউল করিম মানিক
৪৬. এফএফ সামসুল হক ফিটার
৪৭. এফএফ আনোয়ার হোসেন
৪৮. এফএফ শহীদ আলমগীর করিম
৪৯. এফএফ শহীদ আবদুল মমিন
৫০. এফএফ শহীদ আবুল হোসেন
৫১. এফএফ শহীদ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ
৫২. এফএফ শহীদ নূরুল হক
৫৩. এফএফ রফিকুল ইসলাম
৫৪. এফএফ মমিনুল হক ভূঁইয়া
৫৫. এফএফ মোহাম্মদ ইব্রাহীম খান
৫৬. এফএফ সিরাজউদ্দিন আহমেদ
৫৭. এফএফ মো. তৈয়ব আলী
৫৮. এফএফ আবদুস সামাদ
৫৯. এফএফ বাহারউদ্দিন রেজা
৬০. এফএফ জামাল কবির

সূত্র : *বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৬) ও বাংলাদেশ গেজেট মার্চ ১১, ২০০৪।

বর্তমান গ্রন্থে মেজর খালেদ মোশাররফ তাঁর অধীন ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবর্ণনা দিয়েছেন। এ গ্রন্থ থেকে পাঠক তাঁর সেক্টর এবং ফোর্স এলাকায় ঘটে যাওয়া প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা জানতে পারবেন। আমার জানামতে এত সুন্দরভাবে আর কোনো সেক্টর কমান্ডার যুদ্ধবর্ণনা লিপিবদ্ধ করেননি। যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল, মানচিত্র এবং ছবি ব্যবহারের ফলে গ্রন্থটির মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার, বীর উত্তম